আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই

রসূলুল্লাহ্‌র (সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিপ্লবী জীবন

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই

রসূলুল্লাহ্‌র

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বিপ্লবী জীবন

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

প্রকাশক

নাকিব পাবলিকেশন্স

২০৮, পশ্চিম নাখাল পড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

পরিবেশনায়

খায়রুন প্রকাশনী

বিক্রয় কেন্দ্র ঃ বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
দোকান নং- ২০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫৯৮২, ৮৩৫৪১৯৬, ০১৭১৩-০৩৪২৩০,০১৭১৫-১৯১৪৭৭

www.icsbook.info

রসূলুল্লাহ্‌র (স) বিপ্লবী জীবন
মূল ঃ আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

প্রকাশকাল ঃ
২০ প্রকাশ ঃ মার্চ ঃ ২০০৯ ইং
চৈত্রঃ ১৪১৫
রবিউল আউয়াল ঃ ১৪২৯

গ্রন্থস্বত্ব ঃ
নাকিব পাবলিকেশন্স

প্রকাশক ঃ
বেগম ফিরোজা দিল-আফরোজ
নাকিব পাবলিকেশন্স

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
আবদুল্লাহ জুবাইর

শব্দ বিন্যাস ঃ
মোস্তাফা কম্পিউটার্স
১০/ই-এ/১ মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মুদ্রণ ঃ
আফতাব আর্ট প্রেস, ২/১তনুগঞ্জ লেন, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪৫৭৯

ISBN— 984-8455-32-2

মূল্য ঃ ৯০.০০ টাকা

www.icsbook.info

পূর্ব-কথা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পবিত্র জীবনচরিত পর্যালোচনা করলে এর দু'টি বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে বেশি প্রতিভাত হয়ে উঠে। প্রথমত, তাঁর জীবনধারার অন্তর্নিহিত বৈপ্লবিক আদর্শ—যার ছোঁয়ায় মানব জাতির সমাজ ও সভ্যতায় এসেছে বৈপ্লবিক রূপান্তর। দ্বিতীয়ত, সে আদর্শের সুষ্ঠু রূপায়নের জন্যে তাঁর নির্দেশিত বৈপ্লবিক কর্মনীতি—যার সফল অনুসৃতির মাধ্যমে একটি অসভ্য ও উচ্ছৃঙ্খল জনগোষ্ঠী পেয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিরোপা।

দুঃখের বিষয় যে, আজকের মুসলিম মানস থেকে বিশ্বনবীর পবিত্র জীবনচরিতের এই মৌল বৈশিষ্ট্য দু'টি প্রায় লোপ পেতে বসেছে। আজকের মুসলমানরা বিশ্বনবীর জীবন আদর্শকে দেখছে খণ্ডিত রূপে, নেহাত একজন সাধারণ ধর্মপ্রচারকের জীবন হিসেবে। এর ফলে তাঁর জীবনচরিতের সমগ্র রূপটি তাদের চোখে ধরা পড়ছে না; তাঁর জীবন আদর্শের বৈপ্লবিক তাৎপর্যও তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। বস্তুত, আজকের মুসলিম মানসের এই ব্যর্থতা ও দীনতার ফলেই আমরা বিশ্বনবীর পবিত্র জীবনচরিত থেকে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানোর তাগিদ অনুভব করছি না।

'রসূলুল্লাহ্‌র বিপ্লবী জীবন' আমাদের এই কুণ্ঠাহীন উপলব্ধিরই স্বাভাবিক ফসল। বিশ্বনবীর বিশাল ও ব্যাপক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়াদি এ পুস্তকের উপজীব্য নয়। এর বিষয়বস্তু প্রধানত তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ ও কর্মনীতি। এই বিশেষ দু'টি দিকের উপরই এতে আলোকপাত করা হয়েছে সবিস্তারে। এতে জীবনচরিতের অন্যান্য উপাদান এসেছে শুধু প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে।

পুস্তকটির মূল কাঠামো তৈরী করেছেন ভারতের বিশিষ্ট লেখক জনাব আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই। তার সাথে আমরা সংযোজন করেছি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে স্বভাবতই পুস্তকটির কলেবর হয়েছে মূলের তুলনায় অনেক সম্প্রসারিত। এর বর্তমান সংস্করণেও সন্নিবিষ্ট হয়েছে অনেক মূল্যবান তথ্য। পুস্তকটির বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে এর বাংলা নামকরণ করেছেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন মরহুম কবি ফররুখ আহমদ। এর প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করে দিয়েও তিনি আমায় চির ঋণপাশে আবদ্ধ করে গেছেন।

বর্তমান সংস্করণে পুস্তকটির অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণ পরিপাট্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কম্পিউটার কম্পোজের ফলে এ মুদ্রণই শুধু ঝকঝকে হয়নি, আগের তুলনায় এর কলেবরও বৃদ্ধি পেয়েছে ১৬ পৃষ্ঠার মত। এছাড়াও পরিশিষ্ট পর্যায়ে 'ইসলাম প্রচারে মহিলা সাবাহীদের ভূমিকা' শিরোনামে একটি নুতন অধ্যায়ও সংযোজিত হয়েছে এ সংস্করণে। এর ফলে পুস্তকটির সৌকর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পুস্তকটির এ সংস্করণও পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে বিপুলভাবে।

ঢাকা ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৩

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

www.icsbook.info

সূচী পত্র

ইসলামী আন্দোলন ও তার অনন্য বৈশিষ্ট্য ৭
ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব ৭
ইসলামী আন্দোলনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ৮
ইসলামী আন্দোলনের প্রাক্কালে দুনিয়ার অবস্থা ১০
রোম সাম্রাজ ১০
ভারতবর্ষ ১১
ইহুদী ১২
আরব দেশের অবস্থা ১৩
ইসলামী আন্দোলনের জন্য আরব দেশের বিশেষত ১৪
আরবদের সংশোধনের পথে বাধা ১৫
জন্ম ও বাল্যকাল ১৮
বংশ-পরিচিতি ১৮
জন্ম তারিখ ১৯
শৈশবে লালন-পালন ১৯
নবুয়্যাতের আগে ২২
ফুজ্জারের যুদ্ধ ২২
হল্‌ফুল ফুযুল ২২
কা'বা -গৃহের সংস্কার ২৩
ব্যাবসায় ২৩
বিবাহ ২৪
অসাধারণ ঘটনাবলী ২৫
নবুয়্যাতের সূচনা ২৭
হেরা গুহায় ২৭
সর্ব প্রথম ওহী ২৭
আন্দোলনের সূচনা ৩০
সংগ্রামের দুই পর্যায় ৩০
মক্কী জীবন ৩১
মক্কী জীবনের চার স্তর ৩১
প্রথম স্তর ঃ গোপন দাওয়াত ৩২
কুরআনের প্রভাব ৩২
আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন ৩৩
চুপিসারে নামায ৩৩
এ যুগের মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য ৩৪
দ্বিতীয় স্তর ঃ প্রকাশ্য দাওয়াত ৩৪
আন্দোলনের বিরোধিতা ৩৬
বিরোধিতা অপপ্রচার ৩৭
বিরোধিতার কারণ ৩৬
পরিস্থিতির মুকাবিলা ৩৮
আন্দোলনের প্রতি লোকদের মনোযোগ ৩৮
বিরুদ্ধবাদীদের প্রলোভন ৪০
তৃতীয় স্তর ঃ ঈমানের পরীক্ষা ৪১
আবিসিনিয়ায় হিজরত ৪৫
নাজ্জাশীর দরবারে মুসলমান ৪৬
নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ ৪৭
হযরত হামজার ইসলাম গ্রহণ ৪৮
সামাজিক বয়কট ও গিরি গুহায় বন্দী ৫০
আন্দোলনের বিস্তৃতি ৫১
চতুর্থ স্তর ঃ জুলুম ও নির্যাতনের পরাকাষ্ঠা ৫৩
মক্কার বাইরে তাবলীগ ৫৩
জ্বিনদের প্রসঙ্গ ৫৪
মদীনায় ইসলামের আগমন ৫৬
বিরোধিতার তীব্রতা ৫৭
আকাবার প্রথম শপথ ৫৮
আকাবার দ্বিতীয় শপথ ৫৯
মু'জিজা ও মি'রাজ ৬১
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণ ৬২
মি'রাজ ৬৩
মি'রাজের গুরুত্ব এবং ভবিষ্যতের জন্য ইংগিত ৬৬
নেতৃত্ব থেকে ইহুদীদের অপসারণ ৬৬

www.icsbook.info

মক্কার কাফিরদের প্রতি সতর্কবাণী ৬৭
ইসলামী সমাজের বুনিয়াদ ৬৮
হিজরতের জন্য ইংগিত ৬৯
তাহাজ্জদ নামাযের গুরুত্ব ৭০
এ যুগের আন্দোলনের বৈশিষ্ট ৭১
১.আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতা ৭১
২. কুরআন শ্রেষ্ঠ মু'জিজা ৭২
৩. চূড়ান্ত কথা ৭৩
৪. হিজরতের প্রস্তুতি ৭৪
হিজরত ৭৬
মদীনায় সাধারণ মুসলমানদের হিজরত ৭৭
হযরতকে হত্যা করার সলা-পরামর্শ ৭৭
মক্কা থেকে রওয়ানা ৭৮
মদীনায় শুভাগমন ৮০
মদীনায় অবস্থান ৮১
মসজিদে নববীর নির্মাণ ৮২
ভাই-ভাই সম্বন্ধ ৮২
নবপর্যায়ে ইসলামী আন্দোলন ৮৪
ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি ৮৬
মুনাফিক ৮৮
কিবলা পরিবর্তন ৮৮
ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরক্ষা ৯০
কুরাইশদের বিপদ ৯০
কুরাইশদের চক্রান্ত ৯১
কুরাইশদের ওপর চাপ প্রদান ৯২
হাযরামীর হত্যা ৯২
বদর যুদ্ধ ৯৩
কুরাইশদের হামলা ৯৩
মুসলমানদের প্রস্তুতি ৯৪
মদীনা থেকে মুসলমানদের যাত্রা ৯৬
কুরাইশদের পরাজয় ৯৮
বদর যুদ্ধের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া ৯৮
বদর যুদ্ধের পর্যালোচনা এবং মুসলমানদের
প্রশিক্ষণ ৯৯
ওহোদ যুদ্ধ /১০৪
পটভূমি ১০৪
কুরাইশদের অগ্রগতি ১০৫
মুনাফিকদের ধোকাবাজি ১০৫
যুব সমাজের উদ্দীপনা ১০৬
সৈন্যদের প্রশিক্ষণ ১০৬
কুরাইশদের সাজ-সজ্জা ১০৭
যুদ্ধের সূচনা ১০৭
পশ্চাদ্দিক থেকে কুরাইশদের হামলা ১০৭
আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং বিজয় ১০৮
বিপর্যয়ের কারণ এবং মুসলমানদের
প্রশিক্ষণ ১০৯
খোদা-নির্ভরতা ১০৯
ধন-সম্পদের মোহ ১১০
সাফল্যের চাবিকাঠি ১১১
ইসলামী আন্দোলনের প্রাণবস্তু ১১২
দুর্বলতার উৎস-১-১১২
ওহোদের বিপর্যয়ের পর ১১৪
বিভিন্ন গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা ১১৪
ইহুদী আড্ডলেম ও পীরদের
বিরোধিতা ১১৫
নবী কায়োনকার যুদ্ধ ১১৬
কা'ব বিন আশরাফের হত্যা ১১৭
বনু নযীরের নির্বাসন ১১৭
খন্দকের যুদ্ধ ১১৯
খন্দকের প্রস্তুতি ১১৯
কাফিরদের হামলা ১২০
আল্লাহ্‌র সাহায্য ১২১
আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের উপর ভরসা ১২২
ঈমানের দাবি যাচাই ১২৩
দুর্বলতার উৎস ১২৩
রাসূলে অনুকরণ যোগ্য আদর্শ ১২৪
বনু কুরায়জার ধ্বংস ১২৪
হুদায়বিয়ার সন্ধি জ ১২৬
কা'বা জিয়ারতের জন্যে সফর ১২৬
কুরাইশদের সঙ্গে আলোচনা ১২৬

www.icsbook.info

রিযওয়ানের শপথ ১২৭
সন্ধির শর্তাবলী ১২৭
হযরত আবূ জান্দালের ঘটনা ১২৮
হুদাইবিয়ার সন্ধি প্রস্তাব ১২৯
সম্রাটদের নাম পত্রাবলী ১৩১
রোম সম্রাটের নামে ১৩১
আবূ সুফিয়ানের সাথে কতাবার্তা ১৩২
পারস্য সম্রাটের নামে ১৩৪
আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী ও মিসরের
আজীজের নামে ১৩৫
ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ১৩৬
আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ১৩৬
খায়বর আক্রমণ ১৩৭
মুসলিম সমাজের প্রশিক্ষণ ১৩৮
উমরা উদ্‌যাপন ১৪১
মক্কা বিজয় ১৪১
হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ ১৪১
মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি ১৪২
আবু সুফিয়ানের গ্রেফতারী ১৪২
মক্কায় প্রবেশ ১৪৩
মক্কায় সাধারণ ক্ষমা ১৪৩
কা'বা গৃহে প্রবেশ ১৪৪
বিজয়ের পর ভাষণ ১৪৪
শত্রুদের হৃদয় জয়। ১৪৫
হুনাইনের যুদ্ধ ১৪৭
মক্কা বিজয়ের প্রভাব ১৪৭
হুনাইনের যুদ্ধ ১৪৭
দুশমনদের পশ্চাদপসরণ ও
কল্যাণ কামনা ১৪৯
তাবুকের যুদ্ধ ১৫০
রোম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ ১৫০
ইসলামের পক্ষ থেকে হামলার প্রস্তুতি ১৫১
মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত ১৫১
মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন ১৫২
তাবুকে উদ্দেশ্যে রওয়ানা ১৫৩
তাবুকে অবস্থান ১৫৪
মুনাফিকদের চালবাজী ১৫৪
মুনাফিকদের সাথে আচরণ ১৫৫
আবূ আমেরের ষড়যন্ত্র ১৫৫
চক্রান্তের মসজিদ ১৫৬
মুমিনদের প্রশিক্ষণ ও তার পূর্ণতা ১৫৭
হযরত কা'বের কাহিনী ১৫৭
ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য ১৬০
জনসাধারণের দ্বীনী প্রশিক্ষণ ১৬৪
দারুল ইসলামের স্পষ্টনীতি ঘোষণা ১৬৫
বিদায় হজ্ব এবং ওফাত ১৬৭
হজ্বের জন্যে রওয়ানা ১৬৭
হজ্বের ভাষণ ১৬৯
অসুস্থতা ১৬৯
শেষ ভাষণ এবং নির্দেশাবলী ১৬৯
পরিশিষ্ট ১৭২
ইসলাম প্রচারে মহিলা সাহাবীদের
ভূমিকা ১৭২

www.icsbook.info

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১

ইসলামী আন্দোলন ও তার অনন্য বৈশিষ্ট্য

ইসলাম তথা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পয়গাম দুনিয়ার এক বিরাট সংস্কারমূলক আন্দোলন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে খোদা-প্রেরিত নবীগণ এই একই আন্দোলনের পয়গাম নিয়ে এসেছেন। এ কেবল একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলনই নয়, বরং এটি মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত এক অভূতপূর্ব সংস্কার আন্দোলন। এটি একাধারে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি ব্যাপক ও সর্বাত্মক আন্দোলন। মানব জীবনের কোন দিকই এ আন্দোলনের গন্ডী-বহির্ভূত নয়।

ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব

দুনিয়ায় সংস্কারমূলক বা বিপ্লবাত্মক আন্দোলন বহুবারই দানা বেঁধে উঠেছে; কিন্তু ইসলামী আন্দোলন তার নিজস্ব ব্যাপকতা এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের দরুণ অন্যান্য সকল আন্দোলনের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এ আন্দোলনের সাথে কিছুটা প্রাথমিক পরিচয় ঘটলেই লোকদের মনে প্রশ্ন জাগে ঃ কিভাবে এ আন্দোলন উত্থিত হয়েছিলো? এর প্রবর্তক কিভাবে একে পেশ করেছিলেন এবং তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো? কিন্তু এ প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব পাওয়া গেলে শুধু ঐতিহাসিক কৌতূহলই নিবৃত্ত হয়না, বরং এর ফলে আমাদের মানসপটে এমন একটি ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সংস্কারমূলক আন্দোলনের ছবি ভেসে ওঠে, যা আজকের দিনেও মানব জীবনের প্রতিটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করতে সক্ষম। এখানেই ইসলামী আন্দোলনের আসল গুরুত্ব নিহিত।

এ আন্দোলন যেমন মানুষকে তার প্রকৃত লাভ-ক্ষতির সঠিক তাৎপর্য বাতলে দেয়, তেমনি তার মৃত্যু-পরবর্তী অনন্ত জীবনের নিগূঢ় তত্ত্বও সবার সামনে উন্মোচন করে দেয়। পরন্তু এই পার্থিব জীবনের জন্যে এ আন্দোলন এমন একটি নির্ভুল ও সুসমঞ্জস কর্মনীতি পেশ করে, যা সেই অনন্ত জীবনকে সফল করে তুলবার সাথে সাথে এই পার্থিব জীবনকেও চমৎকারভাবে সুবিন্যস্ত করে দেয়। ফলে প্রতিটি জটিল ও দুঃসমাধেয় সমস্যা থেকেই মানুষ চিরতরে মুক্তি লাভ করতে পারে। বস্তুত ইসলামী আন্দোলনের এসব বৈশিষ্ট্য একে ঘনিষ্ঠ আলোকে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করবার এবং এর সম্পর্কে উত্থাপিত দাবিগুলোর সত্যতা নিরূপণের জন্যে প্রতিটি কৌতূহলী মনকে অনুপ্রাণিত করে।

ইসলামী আন্দোলনকে জানবার ও বুঝবার জন্যে এ পর্যন্ত অনেক বই-পুস্তকই লেখা হয়েছে এবং আগামীতেও লেখা হতে থাকবে। এসব বই-পুস্তকের সাহায্যে ইসলামী

www.icsbook.info

আন্দোলন সম্পর্কে বেশ পরিষ্কার একটা ধারণাও করা চলে, সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রদীপ থেকে যেমন আলোকরশ্মি এবং ফুল থেকে খোশবুকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, তেমনি কোনো মহৎ আন্দোলনকেও তার আসল উপস্থাপক থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। এজন্যেই যখন ইসলামী আন্দোলনের কথা ওঠে, তখন মানুষ স্বভাবতই এর আহ্বায়ক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনচরিত এবং এর প্রধান উৎস আল-কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানবার জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে। এ ঔৎসুক্য খুবই স্বাভাবিক।

ইসলামী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

একথা সর্বজনবিদিত যে, মানুষের নৈতিক জীবনের সংশোধন, তার ক্ষতিকর বৃত্তিগুলোর অপনোদন এবং জীবনকে সঠিকভাবে কামিয়াব করে তুলবার উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি উপস্থাপনই হচ্ছে মানবতার প্রতি সবচেয়ে পবিত্র কর্তব্য এবং এটাই হচ্ছে তার সবচেয়ে সেরা খেদমত। এই উদ্দেশ্যে দুনিয়ার অসংখ্য মানুষ নিজ নিজ পথে কাজ করে গেছেন। কিন্তু এ ধরনের সংস্কারমূলক কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁরা মানব জীবনের কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রকেই শুধু বেছে নিয়েছেন এবং তার আওতাধীনে থেকেই যতদূর সম্ভব কাজ করে গেছেন। কেউ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিককে নিজের কর্মকেন্দ্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন, কেউ তাহজীব-তমদ্দুনের উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা করেছেন, আবার কেউ আপন কর্মকাণ্ডকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সংশোধনের মধ্যে। কিন্তু মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের সুষম পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছেন এমন পূর্ণাঙ্গ সংস্কারবাদী একমাত্র খোদা-প্রেরিত নবীগণকেই বলা যেতে পারে।

মানব জাতির প্রতি বিশ্বস্রষ্টার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ এই যে, তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দাওয়াত ও জীবন-চরিতকে তিনি অতুলনীয়ভাবে সুরক্ষিত রেখেছেন। বস্তুত এই মহামানবের জীবনী এমন নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, দুনিয়ার অন্য কোনো মহাপুরুষের জীবনী কিংবা কোনো ঐতিহাসিক দলিলের লিপিবদ্ধকরণেই এতখানি সতর্কতা অবলম্বনের দাবি করা যেতে পারে না। পরন্তু ব্যাপকতার দিক দিয়ে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে হযরত (স)-এর কথাবার্তা, কাজ-কর্ম, জীবন-ধারা, আকার-আকৃতি, ওঠা-বসা, চলন-বলন, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, এমনকি খাওয়া পরা, শয়ন-জাগরণ এবং হাসি-তামাসার ন্যায় সামান্য বিষয়গুলো পর্যন্ত সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। মোটকথা, আজ থেকে মাত্র কয়েক শো বছর আগেকার বিশিষ্ট লোকদের সম্পর্কেও যে খুঁটিনাটি তথ্য জানা সম্ভবপর নয়, হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে প্রায় দেড় হাজার বছর পরেও সেগুলো নির্ভুলভাবে জানা যেতে পারে।

www.icsbook.info

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবন-চরিত পর্যালোচনা করার আগে এর আর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। তাহলো এই যে, কোন্ কাজটি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা কেবল সেই কাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতেই অনুধাবন করা চলে। কারণ প্রায়শ দেখা যায়, অনুকূল পরিবেশে যে সব আন্দোলন দ্রুতবেগে এগিয়ে চলে, প্রতিকূল পরিবেশে সেগুলোই আবার স্তিমিত হয়ে পড়ে। তাই সাধারণ আন্দোলনগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সেগুলোকে গ্রহণ করার জন্যে আগে থেকেই লোকদের ভেতর যথারীতি প্রস্তুতি চলতে থাকে। অতঃপর কোনো দিকে থেকে হঠাৎ কেউ আন্দোলন শুরু করলেই লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার প্রতি সহানুভূতি জানাতে থাকে এবং এর ফলে আন্দোলনও স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে চলে। দৃষ্টান্ত হিসাবে দুনিয়ার আজাদী আন্দোলনগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষ স্বভাবতই বিদেশী শাসকদের জুলুম-পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং মনে মনে তার প্রতি ক্ষুব্ধ হতে থাকে। অতঃপর কোনো সাহসী ব্যক্তি যদি প্রকাশ্যভাবে আজাদীর দাবি উত্থাপন করে, তাহলে বিপদ-মুসিবতের ভয়ে মুষ্টিমেয় লোক তার সহগামী হলেও দেশের সাধারণ মানুষ তার প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়ে পারে না। অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলোর অবস্থাও ঠিক এইরূপ। ক্রমাগত আর্থিক দুঃখ-ক্লেশ এবং অর্থগৃধ্নু ব্যক্তিদের শোষণ-পীড়নে লোকেরা স্বভাবতই এরূপ আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। এমতাবস্থায় অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার সংশোধন এবং মানুষের দুঃখ-দুর্গতি মোচনের নামে দেশের কোথাও যদি কোনো বিপ্লবাত্মক আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে লোকেরা স্বভাবতই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু এর বিপরীত—সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে উত্থিত একটি আন্দোলনের কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, কোনো উগ্র মূর্তিপূজারী জাতির সামনে কোনো ব্যক্তি যদি মূর্তিপূজাকে নেহাত একটি অনর্থক ও বাজে কাজ বলে ঘোষণা করে, তাহলে তার ওপর কী বিপদ-মুসিবত নেমে আসতে পারে, একটু ভেবে দেখা দরকার।

বস্তুত ইসলামী আন্দোলনের আহ্বায়ক হযরত মুহাম্মদ (স) কী প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন, তা স্পষ্টত সামনে না থাকলে তাঁর কাজের গুরুত্ব এবং তার বিশালতা উপলব্ধি করা কিছুতেই সম্ভবপর হবে না। এ কারণেই তাঁর জীবনচরিত আলোচনার পূর্বে তৎকালীন আরব জাহান তথা সারা দুনিয়ার সার্বিক অবস্থার ওপর কিছুটা আলোকপাত করা দরকার।

www.icsbook.info

ইসলামী আন্দোলনের প্রাক্কালে দুনিয়ার অবস্থা

ইসলাম মানুষের কাছে যে দাওয়াত পেশ করেছে, তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ হচ্ছে তওহীদ। কিন্তু এই তওহীদের আলো থেকেই তখনকার আরব উপদ্বীপ তথা সমগ্র দুনিয়া ছিলো বঞ্চিত। তৎকালীন মানুষের মনে তওহীদ সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণাই বর্তমান ছিলো না। এ কথা সত্যি যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগেও খোদার অসংখ্য নবী দুনিয়ায় এসেছেন এবং প্রতিটি মানব সমাজের কাছেই তাঁরা তওহীদের পয়গাম পেশ করেছেন। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, কালক্রমে এই মহান শিক্ষা বিস্মৃত হয়ে সে নিজেরই ইচ্ছা-প্রবৃত্তির দাসত্বে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহ, দেব-দেবী, নদী-সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, জ্বিন-ফেরেশতা, মানুষ-পশু ইত্যাকার অনেক বস্তুকে নিজের উপাস্য বা মাবুদের মধ্যে শামিল করে নেয়। এভাবে মানুষ এক খোদার নিশ্চিত বন্দেগীর পরিবর্তে অসংখ্য মা'বুদের বন্দেগীর আবর্তে জড়িয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক দিক থেকে তখন পারস্য ও রোম এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি বর্তমান ছিলো। পারস্যের ধর্মমত ছিলো অগ্নিপূজা (মাজুসিয়াত)। এর প্রতিপত্তি ছিলো ইরাক থেকে ভারতের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। আর রোমের ধর্ম ছিলো খ্রিষ্টবাদ (ঈসাইয়াত)। এটি গোটা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকাকে পরিবেষ্টন করে ছিলো। এই দুটি বৃহৎ শক্তি ছাড়া ধর্মীয় দিক থেকে ইহুদী ও হিন্দু ধর্মেরও কিছুটা গুরুত্ব ছিলো। এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় সভ্যতার দাবি করতো।

অগ্নিপূজা ছাড়া পারস্যে (ইরানে) নক্ষত্রপূজারও ব্যাপক প্রচলন ছিলো। সেই সঙ্গে রাজা-বাদশাহ ও আমীর-ওমরাহগণও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রজাদের খোদা ও দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলো। তাদেরকে যথারীতি সিজদা করা হতো এবং তাদের খোদায়ীর প্রশস্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করা হতো। মোটকথা, সারা দুনিয়া থেকেই তওহীদের ধারণা বিদায় নিয়েছিলো।

রোম সাম্রাজ্য

গ্রীসের পতনের পর রোম সাম্রাজ্যকেই তখন দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা শক্তি বলে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু ঈসায়ী ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যই অধঃপতনের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়। রাষ্ট্র-সরকারের অব্যবস্থা, শত্রুর ভয়, অভ্যন্তরীণ অশান্তি, নৈতিকতার অবলুপ্তি, বিলাসিতার আতিশয্য—এক কথায় তখন এমন কোন দুষ্কৃতি ছিলো না, যা লোকদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি। ধর্মীয় দিক থেকে

www.icsbook.info

তো কিছু লোক নক্ষত্র ও দেবতাদের কল্পিত মূর্তির পূজা-উপাসনায় লিপ্ত ছিলোই; কিন্তু যারা হযরত ঈসার প্রচারিত ধর্মের অনুসারী বলে নিজেদের দাবি করতো, তারাও তওহীদের ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলো। তারা হযরত ঈসা (অ) ও মরিয়মের খোদায়ী মর্যাদায় বিশ্বাসী ছিলো। পরন্তু তারা অসংখ্য ধর্মীয় ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো এবং পরস্পর লড়াই-ঝগড়ায় লিপ্ত থাকতো। তাদের মধ্যে কবর পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। পাদ্রীদেরকে তারা সিজদা করতো। পোপ ও বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্মীয় পদাধিকারিগণ বাদশাহী, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে খোদায়ী ক্ষমতা পর্যন্ত করায়ত্ত করে রেখেছিলো। হারাম ও হালালের প্রকৃত মাপকাঠি তাদের হাতেই নিবদ্ধ ছিলো। তাদের কথাকে 'খোদায়ী আইন' বলে গণ্য করা হতো। পাশাপাশি সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাসব্রতকে ধার্মিকতার উচ্চাদর্শ বলে মনে করা হতো এবং সকল প্রকার আরাম-আয়েস থেকে দেহকে বঞ্চিত রাখাই শ্রেষ্ঠ 'ইবাদত' বলে বিবেচিত হতো।

ভারতবর্ষ

ধর্মীয় দিক থেকে ভারতে তখন 'পৌরাণিক যুগ' বিদ্যমান ছিলো। ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে এই যুগটিকে সবচেয়ে অন্ধকার যুগ বলে গণ্য করা হয়। কারণ এ যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদ পুনরায় প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলো এবং বৌদ্ধদেরকে প্রায় নির্মূল করে দেয়া হয়েছিলো। এ যুগে শির্কের চর্চা মাত্রাতিরিক্ত রকমে বেড়ে গিয়েছিলো। দেবতাদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৩৩ কোটি পর্যন্ত পৌঁছেছিলো। কথিত আছে যে, বৈদিক যুগে কোনো মূর্তিপূজার প্রচলন ছিলো না। কিন্তু এ যুগে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিলো। মন্দিরের পুরোহিতগণ ছিলো অনৈতিকতার এক একটি জীবন্ত প্রতীক। সরলপ্রাণ লোকদেরকে শোষণ ও লুণ্ঠন করাই ছিলো তাদের প্রধান কাজ। সে যুগে বর্ণবাদ বা জাতিভেদ প্রথার বৈষম্য চরমে পৌঁছেছিলো।[১] এবং এর ফলে গোটা সামাজিক শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। সমাজপতিদের খেয়াল-খুশি মতো আইন-কানুন তৈরি করে নেয়া হয়েছিলো এবং বিচার-ইনসাফকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা করা হয়েছিলো। বংশ-গোত্রের দৃষ্টিতে লোকদের মর্যাদা নিরূপণ করা হতো। সাধারণ্যে মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিলো। তবে খোদা-প্রাপ্তির জন্যে বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতে জীবন কাটানোকে অপরিহার্য মনে করা হতো। কুসংস্কার ও ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা চরমে পৌঁছেছিলো। ভূত-প্রেত, শুভাশুভগণন এবং ভবিষ্যৎ কথনে বিশ্বাস গোটা মানব জীবনকে আচ্ছন্ন করেছিলো। যে কোন অদ্ভুত জিনিসকেই 'খোদা' বলে গণ্য করা হতো। যে-কোন অস্বাভাবিক বস্তুর সামনে মাথা নত করাই ধর্মীয় কাজ বলে

১. বিশ শতকের এই শেষ প্রান্তে এসেও বর্ণবাদের অভিশাপ থেকে ভারতীয় সমাজ মুক্তিলাভ করেনি। এখনো সেখানে তথাকথিত কুলীনদের হাতে প্রাণ দিতে হয় নমঃ শুদ্র, অস্পৃশ্য প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীকে। —সম্পাদক

www.icsbook.info

বিবেচিত হতো। দেব-দেবী ও মূর্তির সংখ্যা গণনা তো দূরের কথা, তা আন্দাজ-অনুমানেরও সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিলো। পূজারিণী ও দেব-দেবীদের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত লজ্জাকর অবস্থায় উপনীত হয়েছিলো। ধর্মের নামে সকল প্রকার দুষ্কর্ম ও অনৈতিকতাকে সমর্থন দেয়া হতো। এক-একজন নারী একাধিক পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতো। বিধবা নারীকে আইনের বলে সকল প্রকার সুখ-সম্ভোগ থেকে জীবনভর বঞ্চিত করে রাখা হতো। এই ধরনের জুলুমমূলক সমাজরীতির ফলে জীবন্ত নারী তার মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পর্যন্ত স্বীকৃত হতো। যুদ্ধে হেরে যাবার ভয়ে বাপ, ভাই ও স্বামী তাদের কন্যা, ভগ্নি ও স্ত্রীকে স্বহস্তে হত্যা করে ফেলতো এবং এতে তারা অত্যন্ত গর্ববোধ করতো। নগ্ন নারী ও নগ্ন পুরুষের পূজা করাকে লোকেরা পুণ্যের কাজ বলে গণ্য করতো। পূজা-পার্বন উপলক্ষে মদ্যপান করে তারা নেশায় চুর হয়ে যেতো। মোদ্দাকথা, ধর্মাচরণ, নৈতিকতা ও সামাজিকতার দিক দিয়ে খোদার এই ভূ-খন্ডটি শয়তানের এক নিকৃষ্ট লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিলো।

ইহুদী

আল্লাহ্‌র দ্বীনের অনুসারী হিসেবে কোনো সংস্কার-সংশোধন যদি প্রত্যাশা করা যেতো, তাহলে ইহুদীদের কাছ থেকেই করা যেতে পারতো। কিন্তু তাদের অবস্থাও তখন অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো। তারা তাদের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন সব গুরুতর অপরাধ করেছে যে, তাদের পক্ষে কোনো সংস্কারমূলক কাজ করাই সম্ভব ছিলো না। তাদের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় আকার ধারণ করেছিলো। ফলে তাদের ভেতর কোনো নবীর আগমন ঘটলে তাঁর কথা শুনতে পর্যন্ত তারা প্রস্তুত ছিলো না। এজন্যে কতো নবীকে যে তারা হত্যা করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। তারা এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত ছিলো যে, খোদার সাথে তাদের একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে; সুতরাং কোনো অপরাধের জন্যেই তিনি তাদের শাস্তি দেবেন না। তারা এ-ও ধারনা করতো যে, বেহেস্তের সকল সুখ-সম্ভোগ শুধু তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। নবুয়্যাত ও রিসালাতকে তারা নিজদের মীরাসী সম্পত্তি বলে মনে করতো। তাদের আলেম সমাজ দুনিয়া-পূজা ও যুগ-বিভ্রান্তিতে চরমভাবে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো। বিত্তশালী ও শাসক সম্প্রদায়ের মনোতুষ্টির জন্যে সবসময় তারা ধর্মীয় বিধি-বিধানে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে থাকতো। খোদায়ী বিধানসমূহের মধ্যে যেগুলো অপেক্ষাকৃত সহজতর এবং তাদের মর্জিমাফিক, সেগুলোই তারা অনুসরণ করতো; পক্ষান্তরে যেগুলো কঠিন ও অপসন্দনীয়, সেগুলো অবলীলাক্রমে বর্জন করে চলতো।

পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও খুন-খারাবি করা তৎকালীন ইহুদীদের একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। ধন-মালের লালসা তাদেরকে সীমাহীনভাবে অন্ধ করে তুলেছিলো এবং এদিক থেকে কিছুমাত্র ক্ষতি হতে পারে, এমন কোন কাজ করতেই

www.icsbook.info

তারা প্রস্তুত ছিলো না। এর ফলে তাদের নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাদের ভেতরে মুশরিকদের ন্যায় মূর্তিপূজা (পৌত্তলিকতা)ও প্রভাব বিস্তার করেছিল। যাদু-টোনা, তাবিজ-তুমার, আমল-তদবীর ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার কুপ্রথা তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলো এবং তওহীদের সঠিক ধারণাকে তা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো। এমন কি, যখন আল্লাহ্‌র শেষ নবী তওহীদের সঠিক দাওয়াত পেশ করেন, তখন এই ইহুদীরাই মুসলমানদের চেয়ে আরব মুশরিকদেরকে উত্তম বলে ঘোষণা করে।

আরব দেশের অবস্থা

দুনিয়ার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার পর এবার খোদ আরব দেশের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করবো। কারণ, এই গুরুত্বপূর্ণ ভূ-খন্ডেই আল্লাহ্‌র সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তাঁর আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং এখানকার পরিস্থিতিই তাঁকে সর্বপ্রথম মুকাবিলা করতে হয়।

আরবের একটি বিরাট অংশ—কোরা উপত্যকা, খায়বার ও ফিদাকে তখন বেশির ভাগ বাসিন্দাই ছিলো ইহুদী। খোদ মদীনায় পর্যন্ত ইহুদীদের আধিপত্য কায়েম ছিলো। বাকী সারা দেশে পৌত্তলিক রীতি-রেওয়াজ প্রচলিত ছিলো। লোকেরা মূর্তি, পাথর, নক্ষত্র, ফেরেশতা, জ্বিন প্রভৃতির পূজা-উপাসনা করতো। অবশ্য এক আল্লাহ্‌র ধারণা তখনও কিছুটা বর্তমান ছিলো। তবে তা শুধু এই পর্যন্ত যে, লোকেরা তাকে 'খোদাদের খোদা' বা 'সবচাইতে বড়ো খোদা' বলে মনে করতো। আর এই আকীদাও এতটা দুর্বল ছিলো যে, কার্যত তারা নিজেদের মনগড়া ছোট-খাটো খোদাগুলোর পূজা-উপাসনায়ই লিপ্ত থাকতো। তারা বিশ্বাস করতো যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এইসব ছোট-খাটো খোদার প্রভাবই কার্যকর হয়ে থাকে। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে তারা এগুলোরই পূজা-উপাসনা করতো। এদের নামেই মানত মানতো ও কুরবানী করতো এবং এদের কাছেই নিজ নিজ বাসনা পূরণের আবেদন জানাতো। তারা এও ধারণা করতো যে, এইসব ছোট-খাটো খোদাকে সন্তুষ্ট করলেই আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

এই ভ্রান্ত লোকেরা ফেরেশতাদেরকে খোদার পুত্র-কন্যা বলে আখ্যা দিতো। জ্বিনদেরকে খোদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং খোদায়ীর অন্যতম শরীকদার বলে ধারণা করতো এবং এই কারণে তারা তাদের পূজা-উপাসনা করতো, তাদের কাছে সাহায্য কামনা করতো। যে সব শক্তিকে এরা খোদায়ীর শরীকদার বলে মনে করতো, তাদের মূর্তি বানিয়ে যথারীতি পূজা-উপাসনাও করতো। মূর্তিপূজার এতটা ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিলো যে, কোথাও কোনো সুন্দর পাথর-খন্ড দৃষ্টিগোচর হলেই তারা তার পূজা-উপসনা শুরু করে দিতো। এমন কি, একান্তই কিছু না পাওয়া গেলে মাটির একটা স্তূপ বানিয়ে তার ওপর কিছুটা ছাগ-দুগ্ধ ছিটিয়ে দিতো এবং তার চারদিক প্রদক্ষিণ করতো।

www.icsbook.info

মোটকথা, পূজা-উপাসনার জন্যে আরবরা অসংখ্য প্রকার মূর্তি নির্মান করে নিয়েছিলো। এই সকল মূর্তির পাশাপাশি তারা গ্রহণ-নক্ষত্রেরও পূজা করতো। বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা বিভিন্ন নক্ষত্রের পূজা করতো। এর ভেতর সূর্য ও চন্দ্রের পূজাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। তারা জ্বিন-পরী এবং ভূত-প্রেতেরও পূজা করতো। এদের সম্পর্কে নানা প্রকার অদ্ভুত কথা তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিলো। এছাড়া মুশরিক জাতিগুলোর মধ্যে আর যে সব কুসংস্কারের প্রচলন দেখা যায়, সেসবও এদের মধ্যে বর্তমান ছিলো।

এহেন ধর্মীয় বিকৃতির সাথে সাথে পারস্পরিক লড়াই-ঝগড়া আরবদের মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিলো। মামুলি বিষয়াদি নিয়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়ে যেতো এবং বংশ-পরম্পরায় তার জের চলতে থাকতো। জুয়াখেলা ও মদ্যপানে তারা এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, তখনকার দিনে আর কোন জাতিই সম্ভবত তাদের সমকক্ষ ছিলো না। মদের প্রশস্তি এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট দুষ্কর্মগুলোর প্রশংসায় তাদের কাব্য-সাহিত্য পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। এছাড়া সুদী কারবার, লুটপাট, চৌর্যবৃত্তি, নৃশংসতা, রক্তপাত, ব্যাভিচার এবং এ জাতীয় অন্যান্য দুষ্কর্ম তাদেরকে প্রায় মানবরূপী পশুতে পরিণত করেছিলো। আপন কন্যা সন্তানকে তারা অপয়া ভেবে জীবন্ত দাফন করতো। নির্লজ্জ আচরণে তারা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছিলো যে, পুরুষ ও নারীর একত্রে নগ্নাবস্থায় কা'বা শরীফ তওয়াফ করাকে তারা ধর্মীয় কাজ বলে বিবেচনা করতো। মোটকথা, ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তখনকার আরব ভূমি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিলো।

ইসলামী আন্দোলনের জন্যে আরব দেশের বিশেষত্ব

আরব উপদ্বীপ তথা সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই ঘোর অমানিশার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহ্‌র পথভ্রষ্ট বান্দাদেরকে তাঁরই মনোনীত পথে চালিত করার জন্যে একটি শুভ প্রভাতের যে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই শুভ প্রভাতটির সূচনার জন্যে আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়ার মধ্যে আরব দেশকে কেন মনোনীত করলেন, প্রসঙ্গত এই কথাটিও আমাদের ভেবে দেখা দরকার।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সারা দুনিয়ার জন্যে হেদায়েত ও দিক-নির্দেশনার সর্বশেষ পয়গামসহ পাঠানোর জন্যে মনোনীত করেছিলেন। সুতরাং তাঁর দাওয়াত সমগ্র দুনিয়ায়ই প্রচারিত হবার প্রয়োজন ছিলো। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এই বিরাট কাজের জন্যে কোনো এক ব্যক্তির জীবন-কালই যথেষ্ট হতে পারে না। এর জন্যে প্রয়োজন ছিলো ঃ আল্লাহ্‌র নবী তাঁর নিজের জীবদ্দশায়ই সৎ ও পুণ্যবান

www.icsbook.info

লোকদের এমন একটি দল তৈরি করে যাবেন, যাঁরা তাঁর তিরোধানের পরও তাঁর মিশনকে অব্যাহত রাখবেন। আর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে যে ধরনের বিশেষত্ব ও গুণাবলীর প্রয়োজন ছিলো, তা একমাত্র আরব অধিবাসীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি উন্নত মানের এবং বিপুল পরিমাণে পাওয়া যেতো। উপরন্তু আরবের ভৌগোলিক অবস্থানকে দুনিয়ার জনবসতিপূর্ণ এলাকার প্রায় কেন্দ্রস্থল বলা চলে। এসব কারণে এখান থেকেই নবীজীর দাওয়াত চারদিকে প্রচার করা সবদিক থেকেই সুবিধাজনক ছিলো।

এছাড়া আরবী ভাষারও একটি অতুলনীয় বিশেষত্ব ছিলো। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে এই ভাষায় যতটা সহজে ও হৃদয়গ্রাহী করে পেশ করা যেতো, দুনিয়ার অন্য কোন ভাষায় তা সম্ভবপর ছিলো না। সর্বোপরি, আরবদের একটা বড়ো সৌভাগ্য ছিলো যে, তারা কোনো বিদেশী শক্তির শাসনাধীন ছিলো না। গোলামীর অভিশাপে মানুষের চিন্তা ও মানসিকতার যে নিদারুণ অধঃগতি সূচিত হয় এবং উন্নত মানবীয় গুণাবলীরও অপমৃত্য ঘটে, আরবরা সে সব দোষত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলো। তাদের চারদিকে পারস্য ও রোমের ন্যায় বিরাট দুটি শক্তির রাজত্ব কায়েম ছিলো; কিন্তু তাদের কেউই আরবদেরকে গোলামীর শৃংখলে আবদ্ধ করতে পারেনি। তারা ছিলো দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বীর জাতি; বিপদ-আপদকে তারা কোনোদিন পরোয়া করতো না। তারা ছিলো স্বভাবগত বীর্যবান; যুদ্ধ-বিগ্রহকে তারা মনে করতো একটা খেল-তামাসা মাত্র। তারা ছিলো অটল সংকল্প আর স্বচ্ছ দিলের অধিকারী। যে কথা তাদের মনে জাগতো, তা-ই তারা মুখে প্রকাশ করতো। গোলাম ও নির্বোধ জাতিসমূহের কাপুরুষতা ও কপট মনোবৃত্তির অভিশাপ থেকে তারা ছিলো সম্পূর্ণ মুক্ত। তাদের কাণ্ডজ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি ও মেধা-প্রতিভা ছিলো উন্নত মানের। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথাও তারা অতি সহজে উপলব্ধি করতে পারতো। তাদের স্মরণ-শক্তি ছিলো অত্যন্ত প্রখর; এক্ষেত্রে সমকালীন দুনিয়ার কোনো জাতিই তাদের সমকক্ষ ছিলো না। তারা ছিলো উদারপ্রাণ, স্বাবলম্বী ও আত্ম-মর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি। কারো কাছে মাথা নত করতে তারা আদৌ অভ্যস্থ ছিলো না। সর্বোপরি, মরুভূমির কঠোর জীবন-যাত্রায় তারা হয়ে উঠেছিলো নিরেট বাস্তববাদী মানুষ। কোন বিশেষ পয়গাম কবুল করার পর বসে বসে তার প্রশস্তি কীর্তন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না; বরং সে পয়গামকে নিয়ে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতো এবং তার পিছনে তাদের সমগ্র শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করতো।

আরবদের সংশোধনের পথে বাধা

আরব দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, তার শক্তিশালী ভাষা এবং তার বাসিন্দাদের এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবীকে এই জাতির মধ্যে

www.icsbook.info

প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত করেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অদ্ভুত কওমটিকে সংশোধন করতে গিয়ে খোদ হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, তার গুরুত্বও কোনো দিক দিয়ে কম ছিলো না। আগেই বলেছি, কোনো কাজের সঠিক মূল্যায়ণ করতে হলে সে কাজটির চারদিকের অবস্থা ও পরিবেশের কথা বিচার করা প্রয়োজন। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে আরব ভূমির সেই ঘনঘোর অন্ধকার যুগে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা ও তার সাফল্যকে ইতিহাসের এক নজীরবিহীন কীর্তি বলে অভিহিত করতে হয়। আর এ কারণেই আরবদের ন্যায় একটি অদ্ভুত জাতিকে দুনিয়ার নেতৃত্বের উপযোগী করে গড়ে তুলতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যে সীমাহীন বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছে, তাকেও একটা অলৌকিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

কাজেই আরবদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো যে পর্যন্ত সামনে না রাখা হবে, সে পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নেতৃত্বে সম্পাদিত বিশাল সংস্কার কার্যকে কিছুতেই উপলব্ধি করা যাবে না। এই কওমটির সংশোধনের পথে যে সমস্ত জটিলতর অসুবিধা বর্তমান ছিলো, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমরা এখানে বিবৃত করছি।

আরবরা ছিলো একটা নিরেট অশিক্ষিত জাতি। খোদার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞান, নবুয়্যাতের স্বরূপ ও গুরুত্ব, ওহীর তাৎপর্য, আখিরাত সম্পর্কিত ধারণা, ইবাদতের অর্থ ইত্যাদি কোনো বিষয়ই তারা ওয়াকিফহাল ছিলো না। পরন্তু তারা বাপ-দাদার আমল থেকেই প্রচলিত রীতি-নীতি ও রসম-রেওয়াজের অত্যন্ত অন্ধ অনুসারী ছিলো এবং তা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণ দূরে সরতেও প্রস্তুত ছিলো না। অথচ ইসলামের যাবতীয় শিক্ষাই ছিলো তাদের এই পৈত্রিক ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

অন্যদিকে শির্ক থেকে উদ্ভূত সকল মানসিক ব্যাধিই তাদের মধ্যে বর্তমান ছিলো। অহংকার ও আত্মম্ভরিতার ফলে তাদের বিবেক-বুদ্ধি হয়ে পড়েছিলো প্রায় নিষ্ক্রিয়। পারস্পরিক লড়াই-ঝগড়া তাদের একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিলো। এ জন্যে শান্ত মস্তিষ্কে ও গভীরভাবে কোনো কিছু চিন্তা করা তাদের পক্ষে সহজতর ছিলো না। তারা কিছু ভাবতে হলে তা যুদ্ধ-বিগ্রহের দৃষ্টিকোণ থেকেই ভাবতো, এর বাইরে তাদের আর কিছু যেন ভাববারই ছিলো না। সাধারণভাবে দস্যুবৃত্তি, লুটতরাজ ইত্যাদি ছিলো তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়।

এ থেকে সহজেই আন্দাজ করা চলে যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দাওয়াত তাদের ভেতর কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো। তিনি যখন তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান, তখন তাদের কাছে তা মনে হয়েছিলো একটি অভিনব দুর্বোধ্য ব্যাপার। তারা

www.icsbook.info

বাপ-দাদার আমল থেকে যে সব রসম-রেওয়াজ পালনে অভ্যস্ত, যে সব চিন্তা-খেয়াল তারা মনের মধ্যে পোষণ করছিলো—এ দাওয়াত ছিলো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ দাওয়াতের মূল কথা ছিলো ঃ লড়াই-ঝগড়া বন্ধ করো, শান্তিতে বসবাস করো, দস্যুবৃত্তি ও লুটতরাজ থেকে বিরত থাকো, বদভ্যাস ও ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা পরিহার করো, সর্বোপরি জীবিকার জন্যে হারাম পন্থা ত্যাগ করো। স্পষ্টতই বোঝা যায়, এ ধরনের একটি সর্বাত্মক বিপ্লবী পয়গামকে কবুল করা তাদের পক্ষে কত কঠিন ব্যাপার ছিলো।

মোটকথা, তৎকালীন দুনিয়ার অবস্থা, আরব দেশের বিশেষ পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট জাতির স্বভাব-প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব—এর কোনো জিনিসই ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে অনুকূল ছিলো না। কিন্তু যখন এর ফলাফল প্রকাশ পেলো, তখনই স্পষ্ট বোঝা গেল ঃ

'বজ্রের ধ্বনি ছিলো সে, অথবা ছিলো সে 'সওতে হাদী'

দিল যে কাঁপায়ে আরবের মাটি রাসূল সত্যবাদী।

জাগালো সে এক নতুন লগ্ন সকলের অন্তরে,

জাগায়ে গেল সে জনতাকে চির সুপ্তির প্রান্তরে!

সাড়া পড়ে গেল চারদিকে এই সত্যের পয়গামে,

হলো মুখরিত গিরি-প্রান্তর চির সত্যের নামে।'

বস্তুত এটাই ছিলো ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় মু'জিজা। এই মু'জিজার কথা যখন উত্থাপিত হয়, তখন স্বভাবতঃই হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনধারা আলোচনা এবং তাঁর পেশকৃত পয়গামকে নিকট থেকে উপলব্ধি করার জন্যে প্রতিটি উৎসুক মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এই বিষয়টি আমরা পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

www.icsbook.info

২
জন্ম ও বাল্যকাল

বংশ পরিচিতি

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সম্মানিত পিতার নাম আবদুল্লাহ। তিনি কা'বার মুতাওয়াল্লী আবদুল মুত্তালিবের পুত্র ছিলেন। তাঁর বংশ-পরম্পরা উর্ধ্বদিকে প্রায় ষাট পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে ইব্রাহীম (আ)-তনয় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সাথে মিলিত হয়েছে। তাঁর খান্দানের নাম কুরাইশ। আরব দেশের অন্যান্য খান্দানের মধ্যে এটিই পুরুষানুক্রমে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত খান্দান বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। আরব দেশের ইতিহাসে এই খান্দানের অনেক বড়ো বড়ো মান্য-গণ্য ব্যক্তির নাম দেখতে পাওয়া যায়। এদের ভেতর আদনান, নাযার, ফাহার, কালাব, কুস্‌সী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুস্‌সী তাঁর জামানায় কা'বা শরীফের মুর্তাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি অনেক বড়ো বড়ো স্মরণীয় কাজ করে গেছেন। যেমন ঃ হাজীদের খাবার পানি সরবরাহ করা, তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। তাঁর পরেও তাঁর খান্দানের লোকেরা এই সকল কাজ আঞ্জাম দিতে থাকে। এসব জনহিতকর কাজ এবং কা'বা শরীফের মুতাওয়াল্লী হবার কারণে কুরাইশরা সারা আরব দেশে অতীব সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ খান্দান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সাধারণভাবে আরবে লুটতরাজ, রাহাজানি ইত্যাকার দুষ্কৃতি প্রচলিত ছিলো এবং এ কারণে রাস্তাঘাট আদৌ নিরাপদ ছিলো না। কিন্তু কা'বা শরীফের মর্যাদা ও হাজীদের খেদমতের কারণে কুরাইশদের কাফেলার ওপর কখনো কেউ হামলা করতো না। তারা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ব্যবসায়ের পণ্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারতো।

আবদুল মুত্তালিবের দশটি (মতান্তরে বারোটি) পুত্র ছিলো।[২] কিন্তু কুফর বা ইসলামের বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মাত্র খ্যাতিলাভ করেন। প্রথম, আবদুল্লাহ, ইনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পিতা। দ্বিতীয়, আবু তালিব; ইনি ইসলাম কবুল করেননি বটে, তবে কিছুকাল হযরতের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। তৃতীয়, হযরত হামযা (রা) এবং চতুর্থ, হযরত আব্বাস (রা)—এঁরা দুজনই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন এবং ইসলামের ইতিহাসে অতীব উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন। আর পঞ্চম হচ্ছে আবু লাহাব; ইসলামের প্রতি বৈরিতার কারণে ইতিহাসে যার নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

২. ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের দশ পুত্রের মধ্যে সবার চেয়ে প্রিয়। —সম্পাদক

www.icsbook.info

কুরাইশদের একটি গোত্রের নাম হচ্ছে জাহারা। এই গোত্রের ওহাব বিন্ আবদুল মানাফের কন্যা আমিনার সঙ্গে আবদুল্লাহ্‌র বিবাহ হয়। সমগ্র কুরাইশ খান্দানের ভেতর ইনি একজন বিশিষ্ট মহিলা ছিলেন। বিবাহ কালে আবদুল্লাহ্‌র বয়স ছিলো মাত্র সতেরো বছর। বিয়ের পর খান্দানী রীতি অনুযায়ী তিনি তিন দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করেন। অতঃপর ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। ফিরবার পথে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। ঐ সময় আমিনা অন্তঃসত্তা ছিলেন।

জন্ম-তারিখ

ঈসায়ী ৫৭১ সালের ২০শে এপ্রিল, মুতাবেক ৯ রবিউল আউয়াল[৩] সোমবারের সুবহে সাদেক। এই স্মরণীয় মুহূর্তে রহমতে ইলাহীর ফয়সালা মুতাবেক সেই মহান ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করলেন, সারা দুনিয়া থেকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার বিদূরিত করে হেদায়েতের আলোয় গোটা মানতাকে উদ্ভাসিত করার জন্যে যাঁর আবির্ভাব ছিলো একান্ত অপরিহার্য এবং যিনি ছিলেন কিয়ামত পর্যন্ত এই দুনিয়ায় বসবাসকারী সমগ্র মানুষের প্রতি বিশ্বপ্রভুর পরম আশীর্বাদ স্বরূপ। জন্মের আগেই এই মহামানবের পিতার ইন্তেকাল হয়েছিলো। তাই দাদা আবদুল মুত্তালিব এঁর নাম রাখলেন মুহাম্মদ (স)।

শৈশবে লালন-পালন

সর্বপ্রথম হযরত মুহাম্মদ (স)-এর স্নেহময়ী জননী আমিনা তাঁকে দুধ পান করান। দু-তিন দিন পর চাচা আবু লাহাবের বাঁদী সাওবিয়াও তাঁকে স্তন্য দান করেন। সে জামানার রেওয়াজ অনুযায়ী শহরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাদের সন্তান-সন্ততিকে দুধ পান করানো এবং তাদের লালন-পালনের জন্যে গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দিতেন। সেখানকার খোলা আলো-হাওয়ায় তাদের স্বাস্থ্য ভালো হবে এবং তারা বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিখতে পারবে বলে তাঁরা মনে করতেন। কেননা, আরবের শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের ভাষা অধিকতর বিশুদ্ধ বলে ধারণা করা হতো। এই নিয়ম অনুযায়ী গ্রামের মেয়েরা শহরে এসে বড়ো বড়ো অভিজাত পরিবারের সন্তানদের লালন-পালনের জন্যে সঙ্গে নিয়ে যেতো। তাই হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্মের কয়েক দিন পরই হাওয়াযেন গোত্রের কতিপয় মহিলা শিশুর সন্ধানে মক্কায় আগমন করেন। এদের মধ্যে হালিমা

---

৩. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্ম-তারিখ সম্পর্কে ইতিহাসকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। কারো মতে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্ম হয়েছিলো ১২ রবিউল আউয়াল, ঈসায়ী ৫৭০ সালে। এই মতটি দুনিয়ায় বেশি প্রচলিত। আবার কারো মতে, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জন্ম-তারিখ ১২ নয়, ৯ রবিউল আউয়াল, ঈসায়ী ৫৭১ সাল। এই মতটি অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত হলেও ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে বেশি নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। এখানে এ কারণেই শেষোক্ত মতটি গ্রহণ করা হয়েছে।—সম্পাদক

www.icsbook.info

সা'দিয়া নাম্নী এক মহিলাও ছিলেন। এই ভাগ্যবতী মহিলা অপর কোনো বড়ো লোকের শিশু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আমিনার ইয়াতীম শিশু সন্তানকে নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

দু'বছর পর আমিনা তাঁর শিশু পুত্রকে ফেরত নিয়ে আসেন। এর কিছুদিন পর মক্কায় মহামারী বিস্তার লাভ করলো। তাই আমিনা আবার তাঁকে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তিনি প্রায় ছ'বছর বয়স পর্যন্ত অতিবাহিত করেন।[৪]

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বয়স যখন ছ বছর, তখন আমিনা তাঁকে নিয়ে মদীনায় গমন করেন। সম্ভবত স্বামীর কবর জিয়ারত অথবা কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করার জন্যে তিনি এই সফরে বের হন। মদীনায় তিনি প্রায় এক মাসকাল অবস্থান করেন। কিন্তু ফিরবার পথে আরওয়া নামক স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই চিরতরে সমাহিত হন।[৫]

আম্মার মৃত্যুর পর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর লালন-পালন ও দেখা-শোনার ভার দাদা আবদুল মুত্তালিবের ওপর অর্পিত হয়। তিনি হামেশা তাঁকে সঙ্গে-সঙ্গে রাখতেন। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বয়স যখন আট বছর, তখন দাদা আবদুল মুত্তালিবও মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর লালন-পালনের ভার পুত্র আবু তালিবের ওপর ন্যস্ত করে যান। তিনি এই মহান কর্তব্য অতীব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালন করেন। আবু তালিব এবং আবদুল্লাহ (হযরতের পিতা) সহোদর ভাই ছিলেন। এদিক দিয়েও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি আবু তালিবের গভীর মমত্ব ছিলো। তিনি নিজের ঔরসজাত সন্তানদের চাইতেও হযরত মুহাম্মদ (স)-কে বেশি আদায়-যত্ন করতেন। শোবার কালে তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সঙ্গে নিয়ে শুইতেন; বাইরে বেরুবার সময়ও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেরুতেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বয়স যখন দশ-বারো বছর, তখন তিনি সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ছাগলও চরান। আরবে এটাকে কোনো খারাপ কাজ মনে করা হতো না। ভালো ভালো সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরাও তখন মাঠে ছাগল চরাতো।

আবু তালিব ব্যবসায় করতেন। কুরাইশদের নিয়ম অনুযায়ী বছরে একবার তিনি সিরিয়া যেতেন। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বয়স তখন সম্ভবত বারো বছর; এ সময়

---

৪. ইবনে খালদুন লিখেছেন ঃ এখানে অবস্থানকালে তিনি আপন দুধভাইদের সঙ্গে মাঠে বকরীও চরাতেন। একদিন তিনি জঙ্গলের মাঝে দুধ ভাইদের সঙ্গে খেলাধূলা করছিলেন। এমন সময় সাদা পোশাকধারী দুটি লোক এসে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করলো এবং তাতে নূর ভরে দিল। —সম্পাদক

৫. আরওয়া থেকে উম্মে আইমান নাম্নী এক মহিলা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে মক্কায় নিয়ে আসেন (ইবনে খালদুন)। —সম্পাদক

www.icsbook.info

একবার আবু তালিব সিরিয়া সফরের ইরাদা করলেন। সফরকালীন কষ্টের কথা স্মরণ করে তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সঙ্গে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি তাঁর অত্যন্ত প্রগাঢ় মমতা ছিলো; তাই সফরে রওয়ানা করার সময় তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে হযরত মুহাম্মদ (স) পীড়াপীড়ি শুরু করলে আবু তালিব তাঁর মনে আঘাত দিতে পারলেন না। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।[৬]

৬. ইবনে খালদুন লিখেছেন ঃ বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ার দক্ষিণে বসরা নামক স্থানে পৌঁছলে খ্রিস্টান পাদ্রী বহিরা নিজের অন্তর্দৃষ্টিতে গাছপালা, পাথর ইত্যাদিকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উদ্দেশ্যে সিজদা করতে দেখে স্বগতোক্তি করলেন ঃ এতো সেই সাইয়্যেদুল মুরসালীন, অতীতের সমস্ত নবী যাঁর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন।—সম্পাদক

www.icsbook.info

৩
নবুয়্যাতের আগে

ফুজ্জারের যুদ্ধ

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের এক সুদীর্ঘ ও অসমাপ্য ধারা বর্তমান ছিলো। এর ভেতর সবচেয়ে ভয়ংকর ও মশহুর ছিল ফুজ্জারের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ কুরাইশ ও কায়েস গোত্রসমূহের মধ্যে সংঘটিত হয়। এতে কুরাইশদের ভূমিকা ছিলো সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগ; তাই হযরত মুহাম্মদ (স)ও কুরাইশদের পক্ষ থেকে এতে অংশগ্রহণ করেন।৭ কিন্তু তিনি কারো ওপর আঘাত হানেন নি। এ যুদ্ধে প্রথমে কায়েস এবং পরে কুরাইশরা জয়লাভ করে। শেষ অবধি সন্ধি মারফত এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

হিলফুল ফযুল

এভাবে অবনরত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে আরবের শত শত পরিবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিলো। লোকদের না ছিলো দিনের বেলায় কোন স্বস্তি আর না ছিলো রাত্রে কোনো আরাম। ফুজ্জারের যুদ্ধের পর এই পরিস্থিতিতে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু কল্যাণকামী লোক এর প্রতিকারের জন্যে একটা আন্দোলন শুরু করেন। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চাচা জুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব পরিস্থিতি দ্রুত শোধরাবার জন্যে কিছু বাস্তবধর্মী কাজের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলেন। এর কিছুদিন পর কুরাইশ খান্দানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ জমায়েত হয়ে নিম্নোক্ত চুক্তি সম্পাদন করেন ঃ

১. আমরা দেশ থেকে অশান্তি দূর করবো।

২. পথিকের জান-মালের হেফাজত করবো।

৩. গরীবদের সাহায্য করতে থাকবো।

৪. মজলুমের সহায়তা করে যাবো।

৫. কোনো জালেমকে মক্কায় আশ্রয় দেব না।

এই চুক্তিতে হযরত মুহাম্মদ (স)ও অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। নবুয়্যাতের জামানায় এ চুক্তি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন ঃ 'আমাকে ঐ চুক্তির বদলে যদি একটি লাল রঙ-এর মূল্যবান উটও দেয়া হতো, তবুও তা আমি কবুল করতাম না। আজো যদি কেউ ঐরূপ চুক্তির জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানায়, তাতে সাড়া দিতে আমি প্রস্তুত।

৭. এই যুদ্ধের সময় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বয়স ছিলো ১৫ বছর। —সম্পাদক

www.icsbook.info

কা'বা গৃহের সংস্কার

তখন কা'বা গৃহের শুধু চারটি দেয়াল বিদ্যমান ছিলো। তার ওপর কোনো ছাদ ছিলো না। দেয়ালগুলোও বড়োজোর মানুষের দৈর্ঘ্য সমান উঁচু ছিলো। পরন্তু গৃহটি ছিলো খুব নীচু জায়গায়। শহরের সমস্ত পানি গড়িয়ে সেদিকে যেতো। ফলে পানি প্রতিরোধ করার জন্যে বাঁধ দেয়া হতো। কিন্তু পানির চাপে সে বাঁধ বারবার ভেঙে যেতো এবং গৃহ প্রাঙ্গনে পানি জমে উঠতো। এভাবে গৃহটি দিন দিন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো। তাই গৃহটি ভেঙে ফেলে একটি নতুন মজবুত গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। সমগ্র কুরাইশ খান্দান মিলিতভাবে নির্মাণ কাজ শুরু করলো। কেউ যাতে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্যে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা গৃহের বিভিন্ন অংশ ভাগ করে নিলো। কিন্তু কা'বা গৃহের দেয়ালে যখন 'হাজরে আসওয়াদ' (পবিত্র কালো পাথর) স্থাপনের সময় এলো, তখন বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেলো। প্রত্যেক গোত্রই দাবি করছিলো যে, এ খেদমতটি শুধু তারাই আঞ্জাম দেবার অধিকারী। অবস্থা এতদূর পর্যন্ত গড়ালো যে, অনেকের তলাওয়ার পর্যন্ত কোষমুক্ত হলো। চার দিন পর্যন্ত এই ঝগড়া চলতে থাকলো। পঞ্চম দিন আবু উম্মিয়া বিন্ মুগীরা নামক এক প্রবীণ ব্যক্তি প্রস্তাব করেন যে, আগামীকাল প্রত্যুষে যে ব্যক্তি এখানে সবার আগে হাযির হবে, এর মীমাংসার জন্যে তাকেই মধ্যস্থ নিয়োগ করা হবে। সে যা সিদ্ধান্ত করবে, তা-ই পালন করা হবে। সবাই এ প্রস্তাব মেনে নিলো।

পরদিন আল্লাহ্‌র কুদরতে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির ওপর সবার নজর পড়লো, তিনি ছিলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (স)। ফয়সালা অনুযায়ী তিনি 'হাজরে আসওয়াদ' স্থাপন করতে ইচ্ছুক প্রতিটি খান্দানকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বললেন। অতঃপর একটি চাদর বিছিয়ে তিনি নিজ হাতে পাথরটিকে তার ওপর রাখলেন এবং বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিগণকে চাদরের প্রান্ত ধরে পাথরটিকে ওপরে তুলতে বললেন। চাদরটি তার নির্দিষ্ট স্থান বরাবর পৌছলে তিনি 'হাজরে আসওয়াদ'কে যথাস্থানে স্থাপন করলেন। এভাবে তিনি একটি বিরাট সংঘর্ষের সম্ভাবনা বিনষ্ট করে দিলেন। এ সংঘর্ষে কতো খুন-খারাবী হতো, কে জানে!

এবার কা'বার যে নয়া গৃহ নির্মিত হলো, তার ওপর যথারীতি ছাদও দেয়া হলো; কিন্তু পুরো ভূমির ওপর গৃহ নির্মাণের উপযোগী উপকরণ না থাকায় এক দিকের ভূমি কিছুটা বাইরে ছেড়ে দিয়ে নয়া ভিত্তি গড়ে তোলা হলো। এই অংশটিকেই এখন 'হিত্তিম' বলা হয়।

ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ

আরবদের, বিশেষত কুরাইশদের পুরানো পেশা ছিলো ব্যবসায়। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চাচা আবু তালিবও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। এ কারণেই হযরত মুহাম্মদ

www.icsbook.info

(স) যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তিনিও ব্যবসায়কে অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন। কিশোর বয়সে চাচার সঙ্গে তিনি ব্যবসায় উপলক্ষে যে সফর করেন, তাতে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। অতঃপর তিনি নিজ কারবার শুরু করলে তাঁর লেন-দেনের সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে তিনি লোকদের কাছে অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রতিপন্ন হলেন। লোকেরা তাঁর ব্যবসায়ে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ মূলধন তাঁর কাছে জমা করতে লাগলো। পরন্তু ওয়াদা পালন, সদাচরণ, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি কারণেও তিনি লোকদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা অর্জন করলেন। এমন কি, লোকেরা তাঁকে 'আস্-সাদিক' (সত্যবাদী) ও 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে সাধারণভাবে অভিহিত করতে লাগলো। ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি সিরিয়া, বসরা, বাহরাইন ও ইয়েমেনে কয়েক বার সফর করেন।

খাদীজার সাথে বিবাহ

তখন খাদীজা[৮] নামে আরবে এক সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী মহিলা ছিলেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দূর সম্পর্কের চাচাতো বোন ছিলেন। প্রথম বিবাহের পর তিনি বিধবা হন এবং দ্বিতীয় বিবাহ করেন। কিন্তু কিছু দিন পর তাঁর দ্বিতীয় স্বামীও মৃত্যুবরণ করেন এবং পুনরায় বিধবা হন। তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ও সচ্চরিত্রের অধিকারী মহিলা ছিলেন। লোকেরা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'তাহিরা'(পবিত্রা) বলে ডাকতো। তাঁর অগাধ ধন-দৌলত ছিলো। তিনি লোকদেরকে পুঁজি ও পণ্য দিয়ে ব্যবসায় চালাতেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বয়স তখন পঁচিশ বছর। ইতোমধ্যে ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি বহুবার সফর করেছেন। তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও সচ্চরিত্রের কথা জনসমাজে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাঁর এ খ্যাতির কথা শুনে হযরত খাদীজা তাঁর কাছে এই মর্মে এক পয়গাম পাঠান ঃ 'আপনি আমার ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে সিরিয়া গমন করুন। আমি অন্যান্যকে যে হারে পারিশ্রমিক দিয়ে থাকি, আপনাকেও তা-ই দেবো।' হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর এই প্রস্তাব কবুল করলেন এবং পণ্যদ্রব্য নিয়ে সিরিয়ার অন্তর্গত বসরা পর্যন্ত গমন করলেন।[৯]

খাদীজা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অসামান্য যোগ্যতা ও অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে প্রায় তিন মাস পর তাঁর কাছে বিয়ের পয়গাম প্রেরণ করেন। হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর পয়গাম মঞ্জুর করলেন এবং বিয়ের দিন-ক্ষণও নির্ধারিত হলো। নির্দিষ্ট দিনে

---

৮. পুরো নাম খাদীজা বিন্‌তে খওলিদ। ইনি বনু সাদ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উর্ধ্বদিকে পঞ্চম পুরুষ গিয়ে এ গোত্র হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে মিলিত হয়। —সম্পাদক

৯. এই সফরে প্রচুর মুনাফা অর্জিত হলো। এরপর তিনি আরো ২/৩ বার সফর করেন। —সম্পাদক

www.icsbook.info

আবু তালিব, হযরত হামজা এবং খান্দানের অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স) খাদীজার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। আবু তালিব বিয়ের খোতবা পড়লেন। পাঁচ শো তালায়ী দিরহাম (স্বর্ণ-মুদ্রা) বিয়ের মোহরানা নির্ধারিত হলো।

বিবাহকালে হযরত খাদীজার বয়স চল্লিশ বছর এবং তাঁর পূর্বোক্ত দুই স্বামীর ঔরসজাত দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিলো।[১০]

অসাধারণ ঘটনাবলী

দুনিয়ায় যতো বিশিষ্ট লোকের আবির্ভাব ঘটে, তাঁদের জীবনে শুরু থেকেই অসাধারণ কিছু নিদর্শনাবলী লক্ষ্য করা যায়। এ দ্বারা তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা সহজেই অনুমান করা চলে। এ কথা অবশ্য এমন সব লোকের বেলায়ই প্রযোজ্য, যাঁরা পরবর্তীকালে কোনো বিশেষ খান্দান, কওম বা দেশের কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করে থাকেন। কিন্তু যে মহান সত্তাকে কিয়ামত অবধি সারা দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যাঁকে মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগের পূর্ণ সংস্কারের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে, তাঁর জীবন-সূচনায় এমন অসাধারণ নিদর্শনাবলী তো প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হওয়াই স্বাভাবিক। তাই স্বভাবতই তাঁর জীবনী গ্রন্থগুলোয় এ ধরনের নিদর্শনাবলীর প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু যে সকল ঘটনা প্রামাণ্য এবং বিশুদ্ধ রেওয়ায়েতসহ উল্লিখিত হয়েছে, তার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন ঃ 'আমি যখন আমার মায়ের গর্ভে ছিলাম, তখন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর দেহ থেকে একটি আলো নির্গত হয়েছে এবং তাতে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত আলোকিত হয়ে গেছে।' বহু রেওয়ায়েত থেকে এ-ও জানা যায় যে, তখন ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ এক নতুন নবীর আগমন প্রতীক্ষায় ছিলো এবং এ ব্যাপারে তারা নানারূপ ভবিষ্যৎবাণী করছিলো।

তাঁর বাল্যকালের একটি ঘটনা। তখন কা'বা গৃহের কিছুটা সংস্কার কার্য চলছিলো এবং এ ব্যাপারে বড়োদের সাথে ছোট ছোট ছেলেরাও ইট বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলো। এই ছেলেদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর চাচা হযরত আব্বাসও ছিলেন। হযরত আব্বাস তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ 'তোমার লুঙ্গি খুলে কাঁধের ওপর দিয়ে নাও, তাহলে ইটের চাপে ব্যথা পাবে না।' তখন তো বড়োরা পর্যন্ত নগ্ন হতে লজ্জানুভব করতো না। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) যখন এরূপ করলেন, নগ্নতার অনুভূতিতে সহসা তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দুটো প্রায় ফেটে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলো। সম্বিত ফিরে এলে তিনি শুধু বলতে লাগলেন ঃ 'আমার লুঙ্গি, আমার লুঙ্গি"। লোকেরা

---

১০. রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পুত্র-কন্যাদের মধ্যে একমাত্র মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভজাত ইবরাহীম ছাড়া বাকী সবাই হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এরা হলেন ঃ কাসেম, তৈয়েব, তাহির জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা জাহরা। এদের মধ্যে একমাত্র ফাতিমাই হযরত আলী (রা) স্ত্রী এবং ইমাম হাসান হুসেনের জননীরূপে খ্যাতি লাভ করেন।—সম্পাদক

www.icsbook.info

তাড়াতাড়ি তাঁকে লুঙ্গি পরিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ পর আবু তালিব তাঁর অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ ' আমি সাদা কাপড় পরিহিত এক লোককে দেখতে পাই। সে আমাকে বললো, শীগ্‌গীর সতর আবৃত করো।' সম্ভবত এই প্রথম হযরত মুহাম্মদ (স) গায়েবী আওয়াজ শুনতে পান।

আরবে তখন আসর জমিয়ে কিস্‌সা বলার একটা কুপ্রথা চালু ছিলো। লোকেরা রাত্রি বেলায় কোনো বিশেষ স্থানে জমায়েত হতো এবং কাহিনীকাররা রাতের পর রাত তাদেরকে নানারূপ উদ্ভট কিস্‌সা-কাহিনী শোনাতো। বাল্য বয়সে হযরত মুহাম্মদ (স) একবার এই ধরনের আসরে যোগদান করার ইরাদা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে একটি বিয়ের মজলিস দেখার জন্যে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং পরে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর চোখ মেলে দেখেন যে, ভোর হয়ে গেছে। এরূপ ঘটনা তাঁর জীবনে আরো একবার সংঘটিত হয়। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কুসংসর্গ থেকে রক্ষা করেন।

রাসূলুল্লাহ (স) যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তখন মক্কা মূর্তি-পূজার সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিলো। খোদ কা'বাগৃহে তখন তিন শ' ষাটটি মূর্তির পূজা হতো এবং তাঁর নিজ খান্দানের লোকেরা অর্থাৎ কুরাইশরাই তখন কা'বার মুতাওয়াল্লী বা পূজারী ছিলো। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ (স) কোনো দিন মূর্তির সামনে মাথা নত করেননি এবং সেখানকার কোনো মুশরিকী অনুষ্ঠানেও অংশ নেননি। এছাড়া কুরাইশরা আর যে সব খারাপ রসম-রেওয়াজে অভ্যস্ত ছিলো, তার কোনো ব্যাপারেই হযরত মুহাম্মদ (স) কোনো দিন তাঁর খান্দানের সহযোগিতা করেননি।[১১]

---

১১. ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন এ প্রসঙ্গে আরো দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হযরত খাদীজা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হাকীম বিন খাজাম হযরত মুহাম্মদ (স)-কে জায়েদ বিন হারেসা নামক একটি গোলাম উপহার দেন। হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর বিশাল হৃদয় ও উন্নত চরিত্রের তাগিদে জায়েদকে অতি প্রিয়জনের ন্যায় লালন-পালন করেন। ইত্যবসরে জায়েদের পিতা হারেসা এবং চাচা কা'ব তাঁর সন্ধানে মক্কায় আসে এবং জায়েদকে ফেরত দেয়ার অনুরোধ জানায়। হযরত মুহাম্মদ (স) তাদেরকে জানান যে, জায়েদ ফেরত যেতে চাইলে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু জায়েদ তাদেরকে স্পষ্টত জানিয়ে দেন, 'আমি হযরতকে ছেড়ে কক্ষনো যাবো না; কারণ তিনি আমার কাছে আপন বাপ-চাচার চাইতেও প্রিয়।' এতে জায়েদের পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন ঃ 'তুমি কি স্বাধীনতার চাইতে গোলামীকে শ্রেয়ঃ মনে করো?' জবাবে জায়েদ বলেন ঃ 'হ্যা তা-ই করি। কারণ আমি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মধ্যে এমন কিছু দেখেছি, যাতে তাঁর চাইতে আর কাউকে শ্রেয়ঃ ভাবতে পারি না।' একথা শুনে হযরত মুহাম্মদ (স) জায়েদকে কা'বা গৃহের কাছে নিয়ে মুক্ত করে দেন এবং তাকে পুত্র বলে ঘোষণা করেন। এ দৃশ্য দেখে জায়েদের পিতা ও চাচা তাঁকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে রেখে সন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরে যান।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চাচা আবু তালিবের পরিবারের লোকসংখ্যা ছিলো যেমন বেশি, তেমনি তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিলো খুবই খারাপ। হযরত মুহাম্মদ (স) একদিন তাঁর অপর চাচা আব্বাস বিন্ মুত্তালিবকে বললেন ঃ 'আপনার ভাই আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। এমতাবস্থায় তাঁর একটি ছেলেকে আপনি এবং অপর একটি ছেলে আমি নিয়ে গেলে খুব ভালো হয়।' আব্বাস সানন্দে এতে রাযী হলেন এবং আবু তালিবের অনুমতিক্রমে জাফরকে তিনি এবং আলীকে হযরত মুহাম্মদ (স) নিয়ে এলেন। আলীর বয়স ছিল তখন ৫/৬ বছর। —সম্পাদক।

www.icsbook.info

৪
নবুয়্যাতের সূচনা

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি পৌঁছলো। তাঁর জীবনে এবার আর একটি বিপ্লবের সূচনা হতে লাগলো। নির্জনে বসে একাকী আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকা এবং আপন সমাজের নৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় তিনি মশগুল হয়ে পড়লেন। তিনি ভাবতে লাগলেন ঃ তাঁর কওমের লোকেরা কিভাবে হাতে-গড়া মূর্তিকে নিজেদের মা'বুদ ও উপাস্য বানিয়েছে! নৈতিক দিক থেকে তারা কতো অধঃপাতে গিয়ে পৌঁছেছে! তাদের এই সব ভ্রান্তি কি করে দূরীভূত হবে? খোদা-পরস্তির নির্ভুল পথ কিভাবে তাদের দেখানো যাবে? এই বিশ্ব-জাহানের প্রকৃত স্রষ্টা ও মালিকের বন্দেগী কিভাবে করা উচিত? এমন অসংখ্য রকমের চিন্তা ও প্রশ্ন তাঁর মনের ভেতর তোলপাড় করতে লাগলো। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে এসব বিষয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

হেরা গুহায় ধ্যান

মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত জাবালুন নূর-এ 'হেরা' নামে একটি পর্বত-গুহা ছিলো।[১২] হযরত মুহাম্মদ (স) প্রায়শ সেখানে গিয়ে অবস্থান করতেন এবং নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা-ভাবনা ও খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। সাধারণত খানাপিনার দ্রব্যাদি তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন, শেষ হয়ে গেলে আবার নিয়ে আসতেন। কখনো কখনো হযরত খাদীজা (রা)ও তা পৌঁছে দিতেন।

সর্বপ্রথম ওহী নাযিল

এভাবে দীর্ঘ ছয়টি মাস কেটে গেলো। হযরত চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। একদা তিনি হেরা গুহার ভেতর যথারীতি খোদার ধ্যানে মশগুল রয়েছেন। সময়টি তখন রমযান মাসের শেষ দশক। সহসা তাঁর সামনে আল্লাহ্‌র প্রেরিত এক ফেরেশতা আত্মপ্রকাশ করলেন। ইনি ফেরেশতা-শ্রেষ্ঠ জিবরাঈল (আ)। ইনিই যুগ যুগ ধরে আল্লাহ্‌র রাসূলদের কাছে তাঁর পয়গাম নিয়ে আসতেন।

হযরত জিবরাঈল (আ) আত্মপ্রকাশ করেই হযরত মুহাম্মদ (স)-কে বললেন ঃ 'পড়ো'। তিনি বললেন ঃ 'আমি পড়তে জানি না।' একথা শুনে জিবরাঈল (আ) হযরত মুহাম্মদ (স)-কে বুকে জড়িয়ে ধরে এমনি জোরে চাপ দিলেন যে, তিনি থতমত খেয়ে

১২.পবর্ত-গুহাটি এখনো সেখানে বর্তমান রয়েছে। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ সেটি পরিদর্শন করছে। —সম্পাদক

www.icsbook.info

গেলেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ (স)-কে ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন ঃ 'পড়ো'। কিন্তু তিনি আগের জবাবেরই পুনরুক্তি করলেন। জিবরাইল (আ) আবার তাঁকে আলিঙ্গন করে সজোরে চাপ দিলেন এবং বললেন ঃ 'পড়ো'। এবারও হযরত মুহাম্মদ (স) জবাব দিলেন ঃ 'আমি পড়তে জানি না।' পুনর্বার জিবরাঈল (আ) হযরত মুহাম্মদ (স)-কে বুকে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ-الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ - (علق)

পড়ো তোমার প্রভুর (রব) নামে, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন; সৃষ্টি করেছেন জমাট-বাঁধা রক্ত থেকে। পড়ো এবং তোমার প্রভু অতীব সম্মানিত, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জিনিস শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।

এই হচ্ছে সর্বপ্রথম ওহী নাযিলের ঘটনা। এ ঘটনার পর হযরত মুহাম্মদ (স) বাড়ি চলে এলেন। তখন তাঁর পবিত্র অন্তঃকরণে এক প্রকার অস্থিরতা[১৩] বিরাজ করছিলো। তিনি কাঁপতে কাঁপতে খাদীজা (রা) কে বললেন ঃ 'আমাকে শীগ্‌গীর কম্বল দ্বারা ঢেকে দাও।' খাদীজা (রা) তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন। অতঃপর কিছুটা শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে এলে তিনি খাদীজা (রা)-এর কাছে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন; বললেন ঃ 'আমার নিজের জীবন সম্পর্কে ভয় হচ্ছে।' খাদীজা (রা) বললেন ঃ 'না, কক্ষনোই নয়। আপনার জীবনের কোনো ভয় নেই। খোদা আপনার প্রতি বিমুখ হবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়দের হক আদায় করেন; অক্ষম লোকদের ভার-বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেন; গরীব-মিসকিনদের সাহায্য করেন; পথিক-মুসাফিরদের মেহমানদারী করেন। মোটকথা, ইনসাফের খাতিরে বিপদ-মুসিবতের সময় আপনিই লোকদের উপকার করে থাকেন।'

এরপর খাদীজা (রা) হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নিয়ে প্রবীণ খ্রিস্টান ধর্মবেত্তা অরাকা বিন্ নওফেলের কাছে গমন করলেন। তিনি তওরাত সম্পর্কে খুব ভালো পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা আদ্যন্ত বর্ণনা করলেন। তিনি সব শুনে বললেন ঃ 'এ হচ্ছে মূসার ওপর অবতীর্ণ সেই 'নামূস' (গোপন রহস্যজ্ঞানী ফেরেশতা)। হায়! তোমার কওমের লোকেরা যখন তোমাকে বের করে

১৩. এই অস্থিরতা ছিলো তাঁর ওপর অর্পিত আকস্মিক দায়িত্বানুভূতির প্রতিক্রিয়া মাত্র। এ প্রসঙ্গে তিনি যা কিছু বলেছেন এবং খাদীজা (রা) যেভাবে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন তা নিছক একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছাড়া কিছুই ছিলো না। —সম্পাদক

www.icsbook.info

দেবে, তখন পর্যন্ত আমি যদি জিন্দা থাকতাম! হযরত মুহাম্মদ (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আমার কওমের লোকেরা কি আমায় বের করে দেবে'? অরাকা বললেন ঃ 'তুমি যা কিছু নিয়ে এসেছো, তা নিয়ে ইতঃপূর্বে যে-ই এসেছে, তার কওমের লোকেরা তার সঙ্গে দুশমনী করেছে। আমি যদি তখন পর্যন্ত জিন্দা থাকি, তাহলে তোমায় যথাসাধ্য সাহায্য করবো।' এর কিছুদিন পরই অরাকার মৃত্যু ঘটে।

এরপর কিছুদিন জিবরাঈলের আগমন বন্ধ রইলো। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) যথারীতি হেরা গুহায় যেতে থাকলেন। এই অবস্থা অন্তত ছয় মাস চলতে থাকলো। এই বিরতির ফলে কিছুটা ফায়দা হলো। মানবীয় প্রকৃতির দরুণ তাঁর অন্তঃকরণে এখন ওহী নাযিলের ঔৎসুক্য সঞ্চারিত হলো। এমন কি, এই অবস্থা কিছুটা বিলম্বিত হলে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে জিবরাঈলের আগমন শুরু হলো। তবে ঘন ঘন নয়, মাঝে মাঝে। জিবরাঈল এসে তাঁকে এই বলে প্রবোধ দেন যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র রাসূল মনোনীত হয়েছেন। এরপর হযরত মুহাম্মদ (স) শান্ত চিত্তে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিছুদিন পর জিবরাঈল ঘন ঘন আসা শুরু করলেন।

www.icsbook.info

৫
আন্দোলনের সূচনা

হেরা গুহায় প্রথম ওহী নাযিলের পর কিছুদিন পর্যন্ত আর কোনো ওহী আসেনি। এরপর সূরা মুদ্দাস্‌সিরের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাযিল হলো।

يَـٰٓأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ -وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ -
وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ - وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ - (مدثر)

হে কম্বল আচ্ছাদনকারী! ওঠো এবং (ভ্রষ্টাচারী লোকদেরকে) ভয় দেখাও। আর আপন প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। লেবাস-পোশাক পরিষ্কার রাখো এবং নোংরামি ও অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। বেশি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কারো প্রতি অনুগ্রহ করো না এবং আপন প্রভুর খাতিরে বিপদ-মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করো।

নবুয়্যাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবার এটা ছিলো সূচনা মাত্র। এবার তিনি যথারীতি হুকুম পেলেন যে, ওঠো এবং ভ্রষ্ট মানবতাকে কল্যাণ পথ দেখাও। লোকদেরকে সতর্ক করে দাও যে, সফলতার পথ মাত্র একটি এবং তা হচ্ছে এক খোদার বন্দেগী ও আনুগত্য। যারা এই পথ অবলম্বন করবে, পরিণামে তারাই সফলকাম হবে। আর যারা এ ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করতে চায়, তাদেরকে আখিরাতের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখাও। তাদেরকে বলো, মানুষের জীবন-ধারা প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত শুধুমাত্র এক খোদার বন্দেগী, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের স্বীকৃতির ওপর। একমাত্র এভাবেই মানুষ সর্ববিধ প্রকাশ্য নাপাকী ও গোপন নোংরামি থেকে বেঁচে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে খোদা ছাড়া অন্যান্য শক্তির বন্দেগী হচ্ছে ধ্বংস ও বিশৃংখলার মূলীভূত কারণ। একইভাবে মানুষের পরস্পরের মধ্যে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করা উচিত; সে সদাচরণের বুনিয়াদ কোনো পার্থিব স্বার্থ কিংবা লালসার ওপর স্থাপিত হওয়া সমীচীন নয়।

সংগ্রামের দুই পর্যায়

এখান থেকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের সংগ্রামী পর্যায় শুরু হলো। এই পর্যায়কে আমরা দু'টি বড়ো বড়ো অংশে ভাগ করতে পারি। এক ঃ হিজরতের পূর্বে মক্কায় অতিবাহিত অংশ; যাকে বলা হয় মক্কী পর্যায়। দুই ঃ হিজরতের পর মদীনায় অতিক্রান্ত অংশ; একে বলা হয় মাদানী পর্যায়। প্রথম পর্যায় তের বছর এবং দ্বিতীয় পর্যায় প্রায় দশ বছর বিস্তৃত ছিলো।

www.icsbook.info

প্রথম পর্যায় ঃ মক্কী জীবন

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সংগ্রামী জীবনের এই পর্যায় তার নিজস্ব পরিণতির দিক দিয়ে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এই পর্যায়েই ইসলামের ক্ষেত্র কর্ষিত হয়। এই পর্যায়ে মানবতার এমন সব উন্নত নমুনা তৈরী হয়, যাদের কল্যাণে উত্তরকালে ইসলামী আন্দোলন সারা দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমানে যে সব ইতিহাস ও নবী-চরিত পাওয়া যায়, তার কোথাও মক্কী পর্যায়ের বিস্তৃত বর্ণনা দেখা যায় না। তাই এ পর্যায়ের গুরুত্ব এবং এর শিক্ষামূলক ঘটনাবলী অনুধাবন করতে হলে কুরআনের মক্কী অংশ গভীরভাবে অধ্যয়ন করা দরকার। প্রকৃতপক্ষে এই পর্যায়ের সঠিক গুরুত্ব ঠিক তখন উপলব্ধি করা সম্ভব, যখন মক্কী সূরাসমূহের প্রকাশ-ভঙ্গি, তখনকার পরিস্থিতি ও ঘটনাবলীর বর্ণনা, তওহীদ ও আখিরাতের প্রমাণাদি, জীবন ও চরিত্র গঠনের নির্দেশাবলী এবং হক ও বাতিলের চরম সংঘাতকালে আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে মুষ্টিমেয় কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টা-সাধনার বিবরণ সামনে আসবে।

মক্কী জীবনের চার স্তর

হিজরতের পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর পবিত্র জীবনের যে অংশ মক্কায় অতিবাহিত করেন এবং যা ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়, তাকে আপন বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে চারটি স্বতন্ত্র স্তরে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম স্তর ঃ নবুয়্যাতের পর প্রায় তিন বছরকাল; এ সময়ে দাওয়াত ও প্রচারের কাজ গোপনে আঞ্জাম দেয়া হয়।

দ্বিতীয় স্তর ঃ নবুয়্যাতের প্রকাশ্য ঘোষণার পর প্রায় দু' বছরকাল। এ স্তরের প্রথম দিকে আন্দোলনের কিছু বিরোধিতা করা হয়। এরপর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, নানারূপ অপবাদ দিয়ে, মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে এবং বিরুদ্ধ কথাবার্তা বলে তাকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়।

তৃতীয় স্তর ঃ এতৎসত্ত্বেও যখন ইসলামী আন্দোলন দৃঢ়ভাবে সামনে এগুতে থাকে, তখন জুলুম-নির্যাতনের ধারা শুরু হয়। মুসলমানদের ওপর নিত্য-নতুন জোর-জুলুম চলতে থাকে। এই অবস্থা প্রায় পাঁচ-ছয় বছরকাল অব্যাহত থাকে। এ সময় মুসলমানদের নানারূপ বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হতে হয়।

চতুর্থ স্তর ঃ আবু তালিব ও হযরত খাদীজা (রা)-এর ওফাতের পর থেকে হিজরত পর্যন্ত প্রায় তিন বছরকাল। এ স্তরটি হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর সঙ্গীদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন সংকটকাল ছিলো।

www.icsbook.info

প্রথম স্তর ঃ গোপন দাওয়াত

নবুয়্যাতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হবার পর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সামনে প্রথম সমস্যা ছিলো ঃ এক খোদার বন্দেগী কবুল করার ও অসংখ্য মিথ্যা খোদার অস্তিত্ব অস্বীকার করার দাওয়াত প্রথম কোন্ ধরনের লোকদের দেয়া যাবে? দেশ ও জাতির লোকদের তখন যে অবস্থা ছিলো, তার একটি মোটামুটি চিত্র ইতঃপূর্বে পেশ করা হয়েছে। এহেন লোকদের সামনে তাদের মেজাজ, পসন্দ ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত কোনো জিনিস পেশ করা বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিলো। তাই যে সব লোকের সঙ্গে এতদিন হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো এবং যাঁরা তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ও নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে সরাসরি অবহিত ছিলেন, তাঁদেরকেই তিনি সর্বপ্রথম দাওয়াতের জন্যে মনোনীত করলেন। কারণ, এরা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সততা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্ক নিঃসংশয় ছিলেন এবং তিনি কোন কথা বললে তাকে সরাসরি অস্বীকার্ করা এঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিলো না। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হযরত খাদীজা (রা)। তারপর হযরত আলী (রা), হযরত জায়েদ (রা), হযরত আবু বকর (রা) প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আলী (রা) হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চাচাত ভাই, জায়েদ (রা) গোলাম এবং আবু বকর (রা) ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এঁরা বছরের পর বছর ধরে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাহচর্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই সর্বপ্রথম হযরত খাদীজা (রা) এবং পরে অন্যান্যদের কাছে তিনি তাঁর দাওয়াত পেশ করেন। এঁরাই ছিলেন উম্মতের মধ্যে পয়লা ঈমানদার—ঈমানের আলোয় উদ্ভাসিত প্রথম ভাগ্যবান দল। এঁরা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই তার সত্যতা স্বীকার করেন। এঁদের পর হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রচেষ্টায় হযরত উসমান (রা), হযরত জুবাইর (রা), হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রা), হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রা), হযরত তালহা (রা) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে গোপনে গোপনে ইসলামের দাওয়াত ছড়াতে লাগলো এবং মুসলমানদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

কুরআনের অনন্য প্রভাব

এ পর্যায়ে কুরআনে যে অংশগুলো নাযিল হয়েছিলো, তা ছিলো আন্দোলনের প্রথম স্তরের উপযোগী ছোট-খাটো বাক্য-সমন্বিত। এর ভাষা ছিলো অতীব প্রাঞ্জল, কবিত্বময় ও হৃদয়গ্রাহী। পরন্তু এতে এমন একটা সাহিত্যিক চমক ছিলো যে, শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তা শ্রোতার মনে প্রভাব বিস্তার করতো এবং এক একটি কথা তীরের ন্যায় বিদ্ধ হতো। এসব কথা যে শুনতো তার মনেই প্রভাব বিস্তার করতো এবং বারবার তা আবৃত্তি করার ইচ্ছা জাগতো।

www.icsbook.info

আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন

কুরআন পাকের এই সূরাগুলোতে তওহীদ ও আখিরাতের তাৎপর্য বর্ণনা করা হচ্ছিলো। এ ব্যাপারে এমন সব প্রমাণাদি পেশ করা হচ্ছিলো, যা প্রতিটি শ্রোতার মনে বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিলো। এসব দলীল-প্রমাণ শ্রোতাদের নিকটতম পরিবেশ থেকেই পেশ করা হচ্ছিলো। পরন্তু এসব কথা এমন ভঙ্গিতে পেশ করা হচ্ছিলো, যে সম্পর্কে শ্রোতারা পুরোপুরি অভ্যস্ত ও অবহিত ছিলো। তাদেরই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এসব কথা বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছিলো। আকীদা-বিশ্বাসের যে সব ভ্রান্তি সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল ছিলো, সেগুলো সম্পর্কেই আলোচনা করা হচ্ছিলো। এ কারণেই খোদার এই কালাম শুনে কেউই প্রভাবিত না হয়ে পারছিলো না। খোদার নবী প্রথমে একাকীই এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু কুরআনের এই প্রাথমিক আয়াতসমূহ এ ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। ফলে গোপনে গোপনে আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

এ পর্যায়ে দাওয়াত প্রচারের জন্যে তওহীদ ও আখিরাতের দলীল-প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্যে খোদ হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কিভাবে আত্মপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং কি কি পন্থা তাঁকে অবলম্বন করতে হবে, সে সম্পর্কেও তাঁকে সরাসরি শিক্ষাদান করা হচ্ছিলো।

চুপিসারে নামায

এ পর্যন্ত সবকিছু গোপনে গোপনেই হচ্ছিলো। নেহাত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোক ছাড়া বাইরের কারো কাছে যাতে কিছু ফাঁস না হয়ে যায়, সেজন্যে হামেশা সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছিলো। নামাযের সময় হলে হযরত মুহাম্মদ (স) আশপাশের কোনো পাহাড়ের ঘাঁটিতে চলে যেতেন এবং সেখানে নামায আদায় করতেন। একবার তিনি হযরত আলী (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে কোন এক জায়গায় নামায পড়ছিলেন। এমন সময় তাঁর চাচা আবু তালিব ঘটনাক্রমে সেখানে এসে হাযির হলেন। তিনি অনেকক্ষণ ধরে ইবাদতের এই নতুন পদ্ধতি তাজ্জবের সাথে লক্ষ্য করলেন। নামায শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা কোন ধরনের দ্বীন?' হযরত মুহাম্মদ (স) জবাব দিলেন ঃ 'আমাদের দাদা ইবরাহীম (আ)-এর দ্বীন।' আবু তালিব বললেন ঃ 'বেশ, আমি যদিও এটা গ্রহণ করতে পারছি না, তবে তোমাকে পালন করার পুরো অনুমতি দিলাম। কেউ তোমার পথে বাদ সাধতে পারবে না।'

এ যুগের মুমিনদের বৈশিষ্ট্য

এই প্রারম্ভিক যুগের বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, এ সময়ে ইসলাম গ্রহণ ছিলো প্রকৃতপক্ষে জীবন নিয়ে বাজী খেলার নামান্তর। কাজেই এ যুগে যাঁরা সামনে অগ্রসর

www.icsbook.info

হয়ে ইসলামের দাওয়াত কবুল করেন, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিলো, যার ভিত্তিতে তাঁরা এ বিপদ-সঙ্কুল পথে অগ্রসর হবার সাহস পেয়েছেন। এর মধ্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ঃ এসব লোক আগে থেকেই মুশরিকী রসম-রেওয়াজ ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং সত্যের জন্যে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে এঁরা ছিলেন সৎ ও - অধিকারী।

প্রায় তিন বছর যাবত দাওয়াত ও প্রচারের কাজ এভাবে গোপনে গোপনে চলতে লাগলো। কিন্তু কতোদিন আর এমনিভাবে চলা যায়! যে সূর্যকে আপন রশ্মি দ্বারা সারা দুনিয়াকে আলোকময় করে তুলতে হবে, তাকে তো লোকচক্ষুর সামনে আত্মপ্রকাশ করতে হবেই। তাই আন্দোলন এবার দ্বিতীয় স্তরে পদার্পণ করলো।

দ্বিতীয় স্তর ঃ প্রকাশ্য দাওয়াত

এবার গোপন কর্মসূচী পরিহার করে প্রকাশ্যেই দাওয়াত প্রচারের আদেশ পাওয়া গেলো। সুতরাং একদিন হযরত মুহাম্মদ (স) সাফা পর্বতের ওপর আরোহণ করলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন ঃ 'ইয়া সাবা হা—হে সকাল বেলার জনতা!' আরবে সে সময় একটা নিয়ম ছিলো এই যে, কখনো কোনো বিপদ দেখা দিলে কোনো উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে কেউ এই সাংকেতিক কথাটি উচ্চারণ করতো। লোকেরা এই সংকেত ধ্বনি শুনেই দ্রুত সেখানে জমায়েত হতো। কাজেই হযরত মুহাম্মদ (স) যখন সাফার ওপর দাঁড়িয়ে এই সাংকেতিক কথাটি উচ্চারণ করে কুরাইশদেরকে আহবান জানালেন, তখন বহু লোক সেখানে জমায়েত হলো। এদের মধ্যে তাঁর চাচা আবু লাহাবও ছিলো।

হযরত মুহাম্মদ (স) সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে বললেন ঃ 'হে লোকসকল! আমি যদি বলি যে, এই পাহাড়ের পিছনে বিরাট একদল শত্রু সৈন্য তোমাদের ওপর হামলা চালানোর জন্যে ওঁত পেতে আছে, তাহলে তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?' লোকেরা বললো ঃ 'নিশ্চয় করবো। তুমি তো কখনো মিথ্যা কথা বলোনি। আমরা তোমাকে আস সাদিক এবং আল-আমীন বলেই জানি।' হযরত মুহাম্মদ (স) বললেন ঃ 'তাহলে শোনো, আমি তোমাদেরকে এক খোদার বন্দেগীর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং মূর্তি পূজার পরিণাম থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে চাচ্ছি। তোমরা যদি আমার কথা না মানো, তাহলে তোমাদের এক কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি।'

কুরাইশরা একথা শুনে যারপরনাই অসন্তুষ্ট হলো। আবু লাহাব ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলো ঃ 'ব্যস, এটুকু কথার জন্যেই বুঝি তুমি এই সাত সকালে আমাদেরকে ডেকেছিলে?'

এটা ছিলো ইসলামের সাধারণ ও প্রকাশ্য দাওয়াতের সূচনা। এবার রাসূলে খোদা অত্যন্ত খোলাসা করে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁকে কি কথা বলবার এবং কোন্ রাজপথের

www.icsbook.info

দিকে লোকদের আহ্বান জানাবার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন ঃ এই বিশাল সাম্রাজ্যের স্রষ্টা ও মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই তার প্রকৃত মালিক। মানুষের মর্যাদা এই যে, সে এক আল্লাহ্‌র বান্দাহ ও গোলামের বেশি কিছু নয়। তাঁরই আনুগত্য ও ফর্মাবর্দারী করা প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য (ফরয)। তিনি ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত করা অথবা তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা মালিক কর্তৃক প্রদত্ত মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ্‌ই মানুষ এবং তামাম জাহানের স্রষ্টা, মা'বুদ ও শাসক। তাঁর এই সাম্রাজ্যের ভেতর মানুষ না পূর্ণ স্বাধীন আর না অন্য কারো গোলাম। মানুষের কাছে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আনুগত্য—বন্দেগী বা পূজা-উপাসনা—পাওয়ার যোগ্য নয়। দুনিয়ার এই জীবনে আল্লাহ মানুষকে কিছুটা কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছেন বটে, কিন্তু আসলে দুনিয়ার জীবন একটা পরীক্ষাকাল ছাড়া আর কিছুই নয়। এ পরীক্ষার পর অবশ্যই মানুষকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে এবং তিনি সমস্ত কাজকর্ম যাচাই করে পরীক্ষার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে ফলাফল ঘোষণা করবেন।

এ ঘোষণা কোন মামুলি ব্যাপার ছিলো না। এর ফলে গোটা কুরাইশ এবং অন্যান্য গোত্রের ভেতর আগুন জ্বলে উঠলো এবং চারদিকে এ সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেলো। কয়েকদিন পর হযরত মুহাম্মদ (স) আলী (রা)-কে একটি ভোজসভার আয়োজন করতে বললেন। এতে গোটা আবদুল মুত্তালিব খান্দানকে আমন্ত্রণ করা হলো। এ ভোজসভায় হামজাহ, আবু তালিব, আব্বাস প্রমুখ সবাই শরীক হলেন। পানাহারের পর হযরত মুহাম্মদ (স) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'আমি এমন একটি জিনিস নিয়ে এসেছি, যা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্যেই যথেষ্ট। এই বিরাট বোঝা উত্তোলনে কে আমার সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছেন?' এটা ছিলো অত্যন্ত কঠিন সময়। চারদিকে শুধু বিরোধিতার ঝাণ্ডা উত্তোলিত হচ্ছিলো। সুতরাং এ বোঝা উত্তোলনে সহযোগিতা করার অর্থ ছিলো এই যে, শুধু দু'-একটি খান্দান, গোত্র বা শহরের লোকদেরই নয়, বরং গোটা আরবের বিরোধিতার মুকাবিলা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রস্তুত হতে হবে। তাকে এজন্যেও তৈরি হতে হবে যে, এর বিনিময়ে শুধু তার আখিরাতের জিন্দেগী সফলকাম হবে এবং সে আপন মালিকের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে। এছাড়া দূরব্যাপী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও তাৎক্ষণিক ফায়দা লাভের কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিলো না। ফলে সমস্ত মজলিসের ওপর একটা নিস্তব্ধতা নেমে এলো। উঠে দাঁড়ালেন শুধু কিশোর আলী। তিনি বললেন ঃ 'আমার চোখে যদিও যন্ত্রণা অনুভূত হচ্ছে, আমার হাঁটুদ্বয়ও অত্যন্ত দুর্বল, পরন্তু বয়সেও আমি সবার ছোট, তবুও আমি আপনার (হযরতের) সহযোগিতা করে যাবো।' মাত্র তেরো বছর বয়স্ক একটি বালক না বুঝে-শুনে এত বড় একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো। গোটা কুরাইশ খান্দানের পক্ষে এটা ছিলো এক বিস্ময়কর দৃশ্য।

www.icsbook.info

আন্দোলনের বিরোধিতা

এ পর্যন্ত ইসলামী সংগঠনে চল্লিশ কি তার চেয়ে কিছু বেশি লোক যোগদান করেছিলো। এরপর একদিন হযরত মুহাম্মদ (স) কাবা শরীফে গিয়ে তওহীদের কথা ঘোষণা করলেন। মুশরিকদের কাছে এটা ছিলো কা'বা শরীফের সবচেয়ে বড়ো অবমাননা। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এক বিরাট হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেলো। চারদিক থেকে লোকেরা এসে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হযরত হারিস বিন আবী হালাহ (রা) তাঁকে সাহায্য করার জন্যে ছুটে এলেন। কিন্তু চারদিক থেকে এত তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে উঠলো যে, তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। ইসলামের পথে এই ছিলো প্রথম শাহাদত। খোদার ফযলে হযরত মুহাম্মদ (স) নিরাপদ রইলেন এবং কোন রকমে হাঙ্গামাও মিটে গেলো।

বিরোধিতার কারণসমূহ

ইসলামী আন্দোলনের মূলমন্ত্র তওহীদের এই ঘোষণা সবচেয়ে বেশি আতঙ্কজনক ছিলো কুরাইশদের জন্যে। তারাই এ আন্দোলনের বিরোধিতা করছিলো তীব্রভাবে। কারণ এ সময় কা'বার কারণেই মক্কার যা কিছু ইজ্জত বর্তমান ছিলো। আর কুরাইশ খান্দান ছিলো কাবার মুতাওয়াল্লী ও তত্ত্বাবধায়ক। ফলে, প্রায় সারা আরব উপদ্বীপেই কুরাইশদের এক প্রকার ধর্মীয় আধিপত্য কায়েম ছিলো। ধর্মীয় ব্যাপারে লোকেরা তাদের দিকেই চেয়ে থাকতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করতো। তাই ইসলামী আন্দোলনের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক তীব্র আঘাত পড়ে কুরাইশদের এই ধর্মীয় আধিপত্যের ওপর। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, বাপ-দাদার অনুসৃত ধর্মের প্রতি মূর্খ জাতিগুলোর একটা অন্ধ বিশ্বাস থাকে বলে কোনো যুক্তিসম্মত কথা পর্যন্ত তারা শুনতে চায় না। এ কারণেই এই নতুন ধর্ম-আন্দোলনের কথা শুনে আরবের কায়েমী স্বার্থীরা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। তাছাড়া কুরাইশদের প্রভাবশালী লোকেরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলো যে, এই নয়া আন্দোলন ফলে-ফুলে বিকশিত হতে পারলে তাদের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই ধুলিসাৎ হয়ে যাবে। ধর্মীয় কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে যে মর্যাদা তারা ভোগ করে আসছে, তা-ও আপন-আপনিই খতম হয়ে যাবে। এই কারণে যে যতো বড় গদীতে সমাসীন, সে ততোখানি ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করতে লাগলো।

অপরদিকে কুরাইশদের মধ্যে নানারূপ দুষ্কৃতি ও অনৈতিকতা বিস্তার লাভ করেছিলো। বড় বড় পদস্থ ব্যক্তিরা নাণারূপ গর্হিত কার্যকলাপে লিপ্ত ছিলো। এতৎসত্ত্বেও ধর্মীয় ও সামাজিক মর্যাদার কারণে তারা লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হতো না। এই প্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (স) একদিকে মূর্তি-পূজার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করে তার পরিবর্তে লোকদেরকে খালেস তওহীদের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, অন্যদিকে তিনি মানুষের বুনিয়াদী চরিত্রের দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলোও খোলাখুলি বয়ান করে

www.icsbook.info

এসব থেকে বাঁচার জন্যে তাদের উপদেশ দিচ্ছিলেন। তাঁর এসব উপদেশ ঐ বড়ো লোকদেরকে কঠিন পেরেশানীতে ফেলে দিচ্ছিলো। কারণ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথাগুলোকে তারা সত্য বলে স্বীকার করে নিতে পারছিলো না। আর যেহেতু তারা নিজেরা এসব দুষ্কৃতি থেকে মুক্ত ছিলো না, তাই জনসাধারণের মধ্যে এসব কথা প্রচারিত হতেই তারা আতঙ্কিত বোধ করলো। তারা উপলব্ধি করলো যে, লোকচক্ষে তাদের মর্যাদার অবনতি ঘটছে এবং সামনা-সামনি না হলেও অন্তত পেছনে অবশ্যই তাদের সমালোচনা হচ্ছে। তাদের মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধির জন্যে এই কথাগুলোই যথেষ্ট ছিলো। পরন্তু কুরআন মজীদে এই ধরনের দুশ্চরিত্র ও দুষ্কৃতিকারী লোকদের সম্পর্কে বারবার আয়াত নাযিল হচ্ছিলো এবং তাদের এই শ্রেণীর কীর্তিকলাপের জন্যে কঠোর আযাবের ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছিলো। এই সকল আয়াত যখন সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হতে লাগলো, তখন কোথাকার পানি কোন্ দিকে গড়াচ্ছে, তা সবাই স্পষ্টত উপলব্ধি করতে পারলো।

ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা ও বৈরিতার জন্যে এই কারণগুলো এতই যথেষ্ট ছিলো যে, হয়তো এই ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা ইসলামী সংগঠনের মুষ্টিমেয় লোকদের বিরুদ্ধে অসংখ্য তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতো এবং এই নয়া 'বিপদের' নাম-নিশানাকে একেবারে মুছে ফেলতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে আগেই ফয়সালা হয়েছিলো যে, এই মুষ্টিমেয় লোকদের মারফতেই তিনি কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার একমাত্র মুক্তি-পয়গামকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেবেন। এই জন্যে এ সময় এমন কতকগুলো কার্য-কারণও দেখা দিলো, যার ফলে কুরাইশরা ঐরূপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হলো না।

বিরুদ্ধবাদীদের অপ্রচার

মাত্র অল্প কিছুকাল আগে কুরাইশরা গৃহযুদ্ধের ফলে নাস্তানাবুদ হয়ে গিয়েছিলো। ফুজ্জারের যুদ্ধের পর তারা এতোটা হীনবল হয়ে পড়েছিলো যে, যুদ্ধের নাম শুনলেই সবাই আঁতকে উঠতো। তদুপরি বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত এবং ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত মুষ্টিমেয় মুসলমানদের হত্যা করার অর্থ ছিলো আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে আবার যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়া। কেননা এ সময় কোন এক ব্যক্তিকে হত্যার করার অর্থই ছিলো তার সাথে সংশ্লিষ্ট তামাম গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। আর এভাবে যুদ্ধ বাঁধলে সমগ্র মক্কারই যুদ্ধের ময়দানের পরিণত হবার প্রবল আশংকা ছিলো। তাই এই পর্যায়ে আন্দোলনকে দমিয়ে দেবার জন্যে নানারূপ বিকল্প পন্থা অবলম্বন করা হলো। আন্দোলন ও তার আহ্বায়ককে নানাভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হলো। তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাপবাদ রটনা করা হলো; রাস্তাঘাটে গালিগালাজ ও হৈহল্লা দ্বারা উত্যক্ত করা হলো। নিত্য-নতুন মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা বানিয়ে প্রচার চালানো হলো। মজনু ও পাগল বলে

www.icsbook.info

তাঁকে আখ্যা দেয়া হলো; কবি ও জাদুকর বলে প্রচার করা হলো। সর্বোপরি, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথা শোনা থেকে বিরত রাখার জন্য লোকদেরকে সরাসরি বাধা দেয়া হলো।

অপ্রচারের মুকাবিলা

এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের যে সব সূরা অবতীর্ণ হচ্ছিলো, তাতে এ পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্যে বারবার পথনির্দেশনা আসছিলো এবং বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের যথোচিত ও যুক্তিযুক্ত জবাবও দেয়া হচ্ছিলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সূরা ক্বলমে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হলো ঃ আপনার প্রতি আল্লাহ খুবই মেহেরবান। আপনি পাগল বা মজনু নন; আপনার প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহ রয়েছে। কার জ্ঞান-বুদ্ধি বিকৃত হয়ে গেছে, তা খুব শীগ্‌গীরই জানা যাবে। আপনার প্রভু খুব ভালো করেই জানেন যে, কে সঠিক পথে রয়েছে আর কে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আপনি নিজের কাজ চালিয়ে যেতে থাকুন। যারা এ আন্দোলনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের কথায় মোটেও কর্ণপাত করবেন না। তারা চায় যে, আপনি আপনার আন্দোলনের কাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করুন তো তাদের তৎপরতাও আপনা-আপনি শিথিল হয়ে আসবে। কিন্তু ঐসব লোকের প্রবৃত্তি অনুসরণ করা আপনার কাজ নয়। আপনি যা কিছু পেশ করেছেন, তা যারা মানতে রাযী নয়, তাদের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। তারা খুব শীগগীরই জানতে পারবে যে, তাদের যে অবকাশ দেয়া হয়েছিলো, তার তাৎপর্য কি? আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন ঃ ' আমি কি তোমাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করছি? না নিজের ফায়দার জন্যে কিছু দাবি করছি? অথবা আমার কথার বিরুদ্ধে তোমাদের কাছে কোনো যুক্তি-প্রমাণ আছে? এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, তাদের কাছে এ ধরনের প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। আপনি অত্যন্ত ধৈর্যশীলতার সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করুন। যথাসময়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবেই।'

উদ্ধৃত বাণী একটি নমুনা মাত্র। এ ধরনের বাণী বরাবরই নাযিল হচ্ছিলো। তাতে লোকদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হলো যে, সত্যের আহ্বায়ক না মজনু না গণক—না কবি, না জাদুকর। গণক, কবি ও জাদুকরের বৈশিষ্ট্যগুলো তোমাদের সামনে রাখো এবং সত্যের আহ্বায়কের ভিতর তার কোন্ কোন্ লক্ষণ পাওয়া যায়, তাও বিচার করে দেখ। তিনি যে কালাম পেশ করছেন, তাঁর প্রতিটি কাজের মাধ্যমে যে চরিত্র প্রতিভাত হচ্ছে এবং তোমাদের মাঝে তিনি যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছেন, তার কোন্‌টির সাথে পাগল, কবি ও জাদুকরের তুলনা হতে পারে?

আন্দোলনের প্রতি লোকদের মনোযোগ

মক্কাবাসীদের এই ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় অবশ্য একটি ফায়দা হলো। তারা লোকদেরকে যতোই বিরত রাখার চেষ্টা করছিলো, তাদের মধ্যে ততোই এ কৌতূহল

www.icsbook.info

জাগতে লাগলো ঃ আচ্ছা, এ লোকটি কি বলছেন, একটু দেখা যাক না। এই কৌতূহলের ফলে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে যে সব লোক হজ্জ কিংবা অন্য কোনো কাজে মক্কায় আগমন করতো, তাদের অনেকে চুপি চুপি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খেদমতে গিয়ে হাযির হতো। এখানে এসে তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মহান চরিত্র অবলোকন এবং আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করতো; ফলে তাদের অন্তর-রাজ্যে এক প্রচণ্ড আলোড়ন ও পরিবর্তন সূচিত হতো। অতঃপর নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তারা ইসলামের দাওয়াত প্রচারে আত্মনিয়োগ করতো।

এভাবে ইসলামের প্রচারকার্য যখন বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়লো, তখন লোকেরা শুধু হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অবস্থা জানবার জন্যেই দূর-দারাজ এলাকা থেকে আসতে লাগলো। এ ধরনের ঘটনাবলীর মধ্যে হযরত আবু জার গিফারী (রা)-এর ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুরাইশরা ব্যবসায় উপলক্ষে যে পথ দিয়ে সিরিয়ায় যাতায়াত করতো, সেই পথের পাশেই গিফার গোত্রটি বসবাস করতো। ঐ গোত্রের কাছে মক্কার ঘটনাবলীর কথা উপনীত হলে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্যে হযরত আবু জরের হৃদয়ে প্রবল আগ্রহ জাগলো। তিনি প্রথমত তাঁর সহোদর ভাই আনীসকে এই বলে মক্কায় পাঠালেন ঃ 'তুমি গিয়ে দেখ, যে লোকটি নবুয়্যাতের দাবি করেছেন, তিনি লোকদেরক কি তালীম দিচ্ছেন।' আনীস মক্কায় এসে হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে যথারীতি ফিরে গেলেন এবং তাঁর ভাইকে বললেন ঃ 'লোকটি অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তিনি খুব চমৎকার নৈতিক শিক্ষা প্রদান করেন এবং এক খোদার বন্দেগীর প্রতি লোকদেরকে আহ্বান জানান। তিনি যে কালাম পেশ করেন, তা কবিত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।'

এই সংক্ষিপ্ত কথায় হযরত আবু জার হৃষ্ট হতে পারলেন না। তিনি নিজেই সফরের জন্যে তৈরি হলেন। কিন্তু মক্কায় পৌঁছে ভয়ে কারো কাছে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নাম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে তিনি সাহস পেলেন না। অবশ্য কা'বা গৃহে হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটলে তাঁর বাড়িতে তিন দিন তিনি মেহমান হিসেবে অবস্থান করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে সফরের উদ্দেশ্য বিবৃত করতে ভরসা পেলেন। আলী (রা) তাঁকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খেদমতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছেই আবু জার ইসলাম কবুল করলেন। হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁকে নিজ গোত্রের মধ্যে ফিরে যেতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তওহীদের যে সতেজ প্রভাব তাঁর মনে ক্রিয়াশীল হলো, তা তাঁর মনে থেকে সমস্ত দ্বিধা-সংকোচ ও ভয়-ভীতি দূর করে দিলো। তিনি সেখান থেকে কা'বা গৃহে পৌঁছেই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللّٰهِ -

এ ঘোষণা শুনেই লোকেরা চারদিক থেকে ছুটে এসে তাঁকে বেদম প্রহার করতে

www.icsbook.info

লাগলো। এমনি সময় হযরত আব্বাস (রা) সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি হামলাকারীদের বললেন ঃ 'এ লোকটি গিফার গোত্রভুক্ত এবং তোমাদের বাণিজ্য পথটি এদেরই এলাকা দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। কাজেই এরা যদি তোমাদের পথ বন্ধ করে দেয়, তাহলে কি করবে? একথা শুনেই হামলাকারীরা তাঁকে ছেড়ে দিলো।

হযরত আবু জার আপন গোত্রের মধ্যে ফিরে এসে ইসলামের আহ্বান জানালে সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় অর্ধেক লোক মুসলমান হয়ে গেল। গিফারদের কাছাকাছি আসলাম গোত্র বসবাস করত। এদের প্রভাবে তারাও ইসলামের দাওয়াত কবুল করলো। এভাবে ইসলামের দাওয়াত ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। বিরুদ্ধবাদীদের কাছে এটা নিদারুণ ক্ষোভ ও বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে লাগালো। এমনকি এদের ভেতরকার কিছু লোক বাধ্য হয়ে আবু তালিবের কাছে গিয়ে অভিযোগ পেশ করলো। এই প্রতিনিধি দলে প্রায় সমস্ত কুরাইশ নেতাই শামিল ছিলো। তারা আবু তালিবকে বললো ঃ 'তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের মা'বুদ ও উপাস্য দেবতাদের অপমান করছে, আমাদের বাপ-দাদাদের গোমরাহ বলে প্রচার করছে, আমাদের সবাইকে আহম্মক ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যা দিচ্ছে। সুতরাং হয় তুমি মাঝপথ থেকে সরে দাঁড়াও, ব্যাপারটা আমরা শেষবারের মতো মিটিয়ে ফেলি, নচেত তাকে তুমি বুঝিয়ে ঠিক করো।' আবু তালিব বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটা এখন খুবই নাজুক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া তিনি একাকী কতো দিনই-বা সমস্ত কুরাইশের মুকাবিলা করবেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে ডেকে বললেন ঃ 'স্নেহের ভাতিজা, আমার ওপর তুমি এতো বোঝা চাপিও না, যাতে আমি উঠে দাঁড়াতে না পারি।'

হযরত মুহাম্মদ (স) দেখলেন, এবার চাচা আবু তালিবের পাও নড়ে-চড়ে যাচ্ছে। তাই তিনি দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ 'খোদার কসম! এই লোকগুলো যদি আমার এক হাতে চন্দ্র এবং অপর হাতে সূর্যও এনে দেয়, তবুও আমি আপন কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হবো না। খোদা হয় এই কাজকে পুরা করার সুযোগ দেবেন, নতুবা নিজেই আমি এ কাজের ভেতর বিলীন হয়ে যাবো।' 'হযরত মুহাম্মদ (স)-এর এই কঠোর সংকল্প ও নির্ভীক ফয়সালার কথা শুনে আবু তালিবও আবার হিম্মত ফিরে পেলেন। তিনি বললেন ঃ 'যাও, কেউ তোমার একটি চুলও বাঁকা করতে পারবে না।'

বিরুদ্ধবাদীদের প্রলোভন

কুরাইশরা এদিক থেকেও নিরাশ হয়ে অবশেষে চরম পন্থা হিসেবে স্থির করলো যে, কঠোরতা দ্বারা সম্ভব না হলে নম্রতা দ্বারাই এই আন্দোলন খতম করতে হবে। তারা প্রবীন নেতা উত্‌বা বিন রাবিয়াকে একটি প্রস্তাবসহ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খেদমতে প্রেরণ করলো। সে এসে বললো ঃ 'মুহাম্মদ! আচ্ছা বলো তো, তুমি কি চাও? মক্কার শাসন ক্ষমতা পেতে চাও? কিংবা কোনো বড় ঘরে বিবাহ করতে চাও? অথবা অগাধ ধন-দৌলত তোমার কাম্য? আমরা এসবই তোমাকে যোগাড় করে দিতে পারি। এজন্যে

www.icsbook.info

কেন মিছেমিছি এসব করছো? আমরা সমগ্র মক্কাকে তোমার কর্তৃত্বাধীন করে দিতে রাযী। এছাড়া আর কিছু চাইলে তারও ব্যবস্থা করে দিতে প্রস্তুত; কিন্তু তুমি এই আন্দোলন থেকে বিরত হও।'[১৪]

বেচারা বিরুদ্ধবাদীরা এটুকুই শুধু ভাবতে পেরেছিলো। প্রচ্ছন্ন বস্তুগত স্বার্থ ছাড়াই যে কোনো আন্দোলন পরিচালনা অথবা কোন আদর্শের দাওয়াত বুলন্দ করা যেতে পারে, এটা আদৌ তাদের মন-মানসে ঠাঁই পায়নি। তারা একথা চিন্তাই করতে পারেনি যে, কোনো কাজ শুধু খোদার সন্তুষ্টি এবং নিছক তাঁর আনুগত্যের জন্যেও করা যেতে পারে। তারা শুধু এটুকুই জানতো যে, ধন-দৌলত আর শাসন-কর্তৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যেই মানুষ জান-মাল কুরবানী করে থাকে। তারা কি করে বুঝবে যে, আখিরাতে অনন্ত জীবনের কামিয়াবীর জন্যেও মানুষ এগুলো উৎসর্গ করে থাকে? তাই উত্‌বার দৃঢ় প্রত্যয় ছিলো যে, তার প্রস্তাবটি অবশ্যই মঞ্জুর হবে। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) তার প্রশ্নের জবাবে শুধু তওহীদের দাওয়াত এবং তাঁর নবুয়্যাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত কুরআন পাকের কতিপয় আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জবার শুনে উত্‌বা অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে ফিরে গেলো। সে কুরাইশ নেতৃবর্গের সামনে নিজের রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে বললো ঃ 'মুহাম্মদ যে কালাম পেশ করছে, তা কিন্তু কবিত্ব নয়, বরং অন্য কিছু। আমার মতে, মুহাম্মদকে তাঁর নিজের ওপরই ছেড়ে দেয়া উচিত। যদি সে কামিয়াব হয় তো সমগ্র আরবের ওপরই বিজয়ী হবে এবং তাতে তোমাদেরও ইজ্জত বাড়বে। আর তা না হলে আরব নিজেই তাকে ধ্বংস করে ফেলবে। কিন্তু কুরাইশরা তার এ অভিমত সমর্থন করলো না।

এরপর একটি কর্মপন্থাই শুধু বাকী রইলো, যা এ পর্যায়ে এসে প্রত্যেক বাতিল শক্তিই হকের বিরুদ্ধে অবলম্বন করে থাকে। তাহলো, পূর্ণ জোর-জবরদস্তি ও নিষ্ঠুরতার সাথে হকের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াস। তাই কুরাইশরা ফয়সালা করলো যে, মুসলমানরা যাতে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হয়, সেজন্যে তাদের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করতে হবে। তাদের যাকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই নিপীড়ন চালাতে হবে।

তৃতীয় স্তর ঃ ঈমানের পরীক্ষা

এই পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের কাজ যেটুকু অগ্রসর হয়েছিলো, তার প্রতিক্রিয়া তিন প্রকারে প্রকাশ পেলো ঃ

---

১৪. রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এটা ছিলো খুবই লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু রাসূলে করীম (স) প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন না। কারণ ইসলামের জন্যে ময়দান তৈরি না করে বাতিলের সাথে আপোষক্রমে ক্ষমতায় গেলেও ইসলাম কায়েম হতে পারে না।—সম্পাদক।

www.icsbook.info

১. কিছু সৎ ও ভালো লোক এ আন্দোলনকে কবুল করলো। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আন্দোলনকে যে কোনো মূল্যে এগিয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হলো।

২. অজ্ঞতা, ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা বাপ-দাদার অনুসৃত ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসহেতু বহু লোক এ আন্দোলনের বিরোধিতার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

৩. মক্কা ও কুরাইশদের গণ্ডী অতিক্রম করে এ আন্দোলন অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো।

এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে এই নতুন আন্দোলন এবং পুরনো জাহিলিয়াতের মধ্যে এক কঠিন দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হলো। যেসব লোক নিজেদের পুরনো ধর্মকে আঁকড়ে থাকতে চাইলো, তারা পূর্ণ শক্তি দিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে কোমর বাঁধলো। তারা নও-মুসলিমদের ওপর অমানুষিক জুলুম-নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালালো এবং তাদেরকে সর্বতোভাবে হীনবল করার জন্যে সংঘবদ্ধ হলো। বস্তুত কুরাইশদের এ পর্যায়ের জুলুম-নিপীড়নের ঘটনাবলী যেমন নির্মম ও হৃদয়বিদারক, তেমনি তা শিক্ষামূলকও। আরবের মতো উষ্ণ দেশে দুপুরের প্রচণ্ড রোদে জ্বলন্ত বালুকার ওপর নও-মুসলিমদের শুইয়ে দেয়া, তাদের বুকের ওপর ভারী ভারী পাথর চাপিয়ে রাখা, লোহা গরম করে শরীরে দাগ দেয়া, পানিতে চুবিয়ে ধরা, নির্দয়ভাবে মারধোর করা এবং এ ধরনের অসংখ্য নির্যাতনের ষ্টীম রোলার মুসলমানদের ওপর চালানো হলো। এ পর্যায়ে সাধারণভাবে সমগ্র মুসলমানের জীবনই দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছিলো; তবে ইতিহাসে যে সব মজলুমের জীবন কাহিনীর কিছুটা বিবৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে থেকে নমুনাস্বরূপ কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হলো।

হযরত খাব্বাব (রা) ঃ ইনি উম্মে আম্মারের গোলাম ছিলেন। সবেমাত্র ছয়-সাত ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেছেন, এমনি সময় তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই অপরাধে তিনি কুরাইশদের নির্মম জুলুমের শিকারে পরিণত হন। একদিন কুরাইশরা মাটির ওপর কয়লা জ্বালিয়ে তার ওপর খাব্বা (রা)-কে চিৎ করে শুইয়ে দিলো এবং তিনি যাতে নড়াচড়া করতে না পারেন, সেজন্যে এক ব্যক্তি তাকে পা দিয়ে সজোরে চেপে ধরলো। এমন কি, তাঁর পিঠের নীচেই জ্বলন্ত কয়লা নিভে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। কিছুকাল পর একদিন তিনি তাঁর পিঠের ওপর সাদা সাদা কতকগুলো পোড়া দাগ সবাইকে দেখান।

হযরত বিলাল (রা) ঃ ইনি উমাইয়া বিন্ খালফের গোলাম ছিলেন। উমাইয়া তাঁকে দুপুরে তপ্ত বালুকার ওপর শুইয়ে দিতো এবং বুকের ওপর ভারী পাথর চাপা দিয়ে বলতো ঃ 'ইসলামকে অস্বীকার কর, নচেত এভাবেই ধুঁকে ধুঁকে মরে যাবি।' কিন্তু সেই নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও তাঁর মুখে শুধু 'আহাদ' শব্দই উচ্চারিত হতো। উমাইয়া তাঁর গলায় রশি বেঁধে ছোটো ছোটো ছেলেদের হাতে দিতো। ওরা তাঁকে শহরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে টেনে নিয়ে যেতো।

www.icsbook.info

হযরত আম্মার (রা) ঃ ইনি ইয়ামেনের বাসিন্দা ছিলেন। প্রথম দিকে যে ক'জন সাহসী ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন, ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশরা তাঁকে উত্তপ্ত জমিনের ওপর শুইয়ে এত প্রহার করতো যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন।

হযরত লুবাইনিয়া (রা) ঃ ইনি একজন বাঁদী ছিলেন। মুসলমান হবার আগে হযরত উমর (রা) এঁকে এত মারধোর করতেন যে, তিনি নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু এই খোদাভক্ত মহিলা শুধু বলতেন ঃ 'যদি ইসলাম গ্রহণ না করো তো খোদা তোমার কাছ থেকে এর বদলা গ্রহণ করবেন।'

হযরত জুনাইরাই (রা) ঃ ইনিও হযরত উমর (রা)-এর পরিবারে বাঁদী ছিলেন। একবার আবু জেহেল তাঁকে এত প্রহার করে যে, তাঁর চোখ দুটো বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়।

মোটকথা, পুরুষ ও নারীর মধ্যে এরকম অনেক লাচার ও নিরুপায় মুসলমানকেই নানারূপ অকথ্য নির্যাতন সইতে হয়। কিন্তু এসব জুলুম-পীড়ন একজন মুসলমানকেও ইসলাম ত্যাগে সম্মত করাতে পারেনি।

এইসব বেকসুর ও নিরপরাধ মুসলমানের ওপর যখন জুলুম-পীড়ন চলছিলো, তখন লোকেরা স্বভাবতই তাদের প্রতি কৌতুহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে লাগলো। তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো ঃ এত মুসিবত সত্ত্বেও এই লোকগুলো কিসের মোহে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে? কোন্ প্রলোভনের হাতছানি এদেরকে এতখানি কষ্ট-সহিষ্ণু করে তুলেছে? একথা সবাই জানতো যে, নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহার এবং মানবীয় গুণাবলীর দিক দিয়ে এরা নিঃসন্দেহে উত্তম মানুষ। এদের 'অপরাধ' শুধু এই যে, এরা বলে—'আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে আমরা নিজেদের রব্ব (মনিব, মালিক ও মা'বুদ) বলে মানবো না এবং তিনি ছাড়া আর কোনো সত্ত্বার আনুগত্য এবং বন্দেগীও করবো না।[১৫]

---

১৫. স্থূল দৃষ্টিতে দেখলে কথাটাকে অত্যন্ত মামুলি বলে মনে হয় এবং এ কারণে অনেকের মনে বিস্ময়েরও সঞ্চার হয় যে, শুধু এটুকু কথা বলার জন্যেই লোকদেরকে এত উৎপীড়ন করার তাৎপর্য কি! আসল ব্যাপার এই যে, আমাদের সামনে 'রব্ব' শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য যেমন খুব সুস্পষ্ট নয়, তেমনি 'ইবাদত' সম্পর্কিত ধারণাও পূর্ণাঙ্গ নয়। কিন্তু কুরাইশরা জানতো, মুসলমানদের মুখে উচ্চারিত 'রব্ব' ও 'ইবাদত' শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য কতো ব্যাপক। তাই তারা যখন বলতো আমাদের 'রব্ব' হচ্ছে আল্লাহ্ ,তখন সবাই তার নিম্নোক্ত অর্থ বুঝতো ঃ

ক. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো পরোয়ারদিগার (প্রতিপালক) নেই; সুতরাং তাঁর শোকর-গুজারী করা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। একমাত্র তাঁর কাছে দো'আ-প্রার্থনা এবং তাঁর সামনে প্রেম-প্রীতি ও প্রত্যয় নিয়ে মাথা নত করাই সর্বতোভাবে বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত। তিনি ছাড়া আর কেউ পূজা -উপাসনা পাবার যোগ্য নয়। আর কেউ এরূপ যোগ্যতার অধিকারীও হতে পারে না।

www.icsbook.info

অব্যাহত জুলুম-পীড়ন সত্ত্বেও নও-মুসলিমদের এহেন দৃঢ়তাব্যঞ্জক উক্তি অনেক লোকের সামনেই এক বিরাট প্রশ্ন তুলে ধরলো এবং তাদের হৃদয়-মনে স্বতঃই এক প্রকার নম্রতার সৃষ্টি করলো। তারা এই নতুন আন্দোলনকে নিকট থেকে দেখবার ও বুঝবার জন্যে আগ্রহান্বিত হলো। সত্যাশ্রয়ী ও ন্যায়নিষ্ঠদের ওপর জুলুম-পীড়ন চিরকালই সত্যের কামিয়াবীর পক্ষে সহায়ক হয়ে থাকে। তাই একদিকে যেমন কুরাইশদের জুলুম-পীড়ন বেড়ে চলছিলো, অন্যদিকে তেমনি ইসলামী আন্দোলনের পরিধিও সম্প্রসারিত হলো লাগলো। এমনিক গোটা পরিবার বা খান্দানের কোনো একটি লোক ইসলাম কবুল করেনি, মক্কায় এমন কোনো খান্দান বা পরিবারই আর রইলো না। এই কারণে কুরাইশরা ইসলামের বিরুদ্ধে আরো বেশি ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা দেখতে লাগলো ঃ তাদেরই আপন ভাই-ভাতিজা, বোন-ভগ্নিপতি, পুত্র-কন্যা ইসলামী দাওয়াতকে কবুল করে চলেছে এবং ইসলামের খাতিরে সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। তাদের কাছে এটা ছিলো অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসহ আঘাতের শামিল। পরন্তু মজার ব্যাপার এই যে, যারা এই নয়া আন্দোলনে যোগদান করছিলো, তাদের নৈতিক চরিত্র এবং সাধারণ মানবীয় গুণাবলী সবার কাছেই সুস্পষ্ট ও সুবিদিত ছিলো। এই শ্রেণীর লোকেরা যখন ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের সমস্ত পার্থিব স্বার্থ কুরবানী করতে প্রস্তুত হতে লাগলো, তখন সাধারণ লোকেরা হতবাক হয়ে ভাবলো ঃ এই নতুন আন্দোলন এবং এর আহ্বায়কের ভেতর এমন কী আকর্ষণ রয়েছে, যা লোকদেরকে এরূপ আত্মোৎসর্গের জন্যে অনুপ্রাণিত করছে! তাছাড়া লোকেরা এ-ও দেখতে লাগলো যে, ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করার পর এসব লোক অধিকতর ন্যায়ানুগ, সত্যবাদী, চরিত্রবান এবং আচার-ব্যবহারে উত্তম ও পুত-পবিত্র মানুষে পরিণত হচ্ছে। এসব বিষয় প্রতিটি দর্শকের মনে অনির্বচনীয় এক ভাবধারার সঞ্চার করতে লাগলো এবং এর ফলে ইসলামী দাওয়াতকে কবুল করুক আর না-ই করুক, তার শ্রেষ্ঠত্বকে তারা কিছুতেই উপলব্ধি না করে পারলো না।

খ. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মালিক ও মনিব নেই। কাজেই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তাঁরই বন্দেগী ও গোলামী কবুল করা। তাঁর মুকাবিলায় না নিজেকে নিজে স্বাধীন মনে করা চলে আর না অন্য কারো সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা যায়। তিনি ছাড়া আর কারো গোলামী ও বশ্যতা স্বীকার করা আদৌ জায়েয নয়।

গ. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শাসক বা বিধানকর্তা নেই। এজন্যে একমাত্র তাঁরই আনুগত্য ও ফর্মাবর্দারী (বিধান পালন) বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত। মানুষ না নিজের শাসক হতে পারে আর না অন্য কোনো সত্তার শাসন ব্যবস্থাকে সে মেনে নিতে পারে।

বস্তুত এই বিরাট ঘোষণার ফলে কুরাইশদের বাপ-দাদার আমল থেকে প্রচলিত উপাস্য দেবতাদের খোদায়ীর আসন যেমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে লাগলো, তেমনি তাদের যাবতীয় সর্দারী ও কর্তৃত্ব-প্রভুত্বের বিরুদ্ধেও প্রকাশ্য বিদ্রোহের ডংকা বেজে উঠলো। এ কারণেই তৎকালীন ধর্মনেতা ও গোত্র-প্রধানগণ কেউই এ ঘোষণাকে বরদাশত করতে প্রস্তুত ছিলো না।—লেখক

www.icsbook.info

আবিসিনিয়ায় হিজরত

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়্যাতের বয়স এবার পাঁচ বছর হলো। তিনি বুঝতে পারলেন যে, কুরাইশদের জুলুম-নির্যাতন খুব শীগ্‌গীর বন্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। অপরদিকে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমানের অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, কোনো দুঃসহ পরিস্থিতিতেই তারা ইসলামের প্রতি বিমুখ হবে না বটে; কিন্তু দুঃখ-দুর্ভোগের মাত্রা তাদের সহ্য-শক্তির বাইরে চলে যাচ্ছে এবং এজন্যে ইসলামের প্রতি কর্তব্য (ফরয) পালন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাই হযরত মুহাম্মদ (স) ফয়সালা করলেন যে, কিছু মুসলমানকে হিজরত করে আবিসিনিয়ায়[১৬] যেতে হবে। আবিসিনিয়া আফ্রিকার পূর্ব উপকূলবর্তী একটি দেশ। এখানকার বাদশাহ নাজ্জাশী ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ন ও সুবিচারক খ্রিস্টান। এই হিজরতের একটি উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, অবস্থা অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত কিছুসংখ্যক মুসলমান অন্তত কুরাইশদের জোর-জুলুম থেকে রেহাই পাবে। এর আরও একটি বড় ফায়দা ছিলো এই যে, এইসব আত্মোৎসর্গকারী লোকদের সাহায্যে ইসলামের দাওয়াত দূর-দারাজ এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হবার সুযোগ পাবে।

সুতরাং প্রথম দফায় এগারো জন পুরুষ ও চার জন মহিলা এই হিজরতের জন্য তৈরি হলেন। এঁরা পঞ্চম নববী সালের রজব মাসে যাত্রা করলেন। আল্লাহ্‌র কুদরত এই যে, এঁরা যখন বন্দরে পৌছলেন, তখন একটি বাণিজ্য জাহাজ প্রত্যাগমনের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়েছিলো। এটি তাদেরকে খুব কম ভাড়ায় নিতে সম্মত হলো। কুরাইশরা এই হিজরতের খবর শুনে মুসলমানদের পিছন ধাওয়া করলো। কিন্তু তারা বন্দরে পৌছবার আগেই আল্লাহ্‌র ফযলে জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেলো।

আবিসিনিয়ায় মুসলমানরা বেশ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বাস করতে লাগলো। এ খবর কুরাইশদের কাছে পৌছলে তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর (আরবরা তাঁকে এ নামে ডাকতো) কাছে কয়েকজন লোক পাঠাতে হবে। তারা গিয়ে মুসলমানদের সম্পর্কে বলবে যে, এই লোকগুলো আমাদের দেশ থেকে পলাতক অপরাধী; এদেরকে আপনি আপনার দেশ থেকে বের করে দিন। আমরা এদেরকে সাথে নিয়ে যাবো। আবদুল্লাহ বিন রাবিআ ও আমর বিন আসকে এ কাজের জন্যে মনোনীত করা হলো। তারা অত্যন্ত জাঁক-জমকের সাথে রওয়ানা করলো। প্রথমে তারা আবিসিনিয়ার পাদ্রীদের কাছে গিয়ে বললো ঃ 'এই লোকগুলো একটি নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করেছে। আমরা এদেরকে তাড়িয়ে দেয়ায় আপনাদের দেশে পালিয়ে এসেছে। এখন আপনাদের বাদশাহ্‌র খেদমতে আমরা এই মর্মে আবেদন পেশ করতে চাই যে, এরা আমাদের দেশ থেকে পলাতক অপরাধী;

১৬. দেশটির প্রাচীন নাম 'হাবশা' কিংবা 'আবিসিনিয়া'। বর্তমানে এটি ইথিওপিয়া নামে পরিচিত।—সম্পাদক

www.icsbook.info

এদেরকে আমাদের হাতে প্রত্যর্পণ করুন। আমাদের এই আবেদনের সপক্ষে বাদশাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করার জন্যে আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি'।

নাজ্জাশীর দরবারে মুসলমান

মক্কাবাসী কুরাইশরা নাজ্জাশীর দরবারে উপরিউক্ত মর্মে আবেদন জানালে তিনি মুসলমানদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমরা কি কোনো নতুন ধর্ম আবিষ্কার করেছো? 'মুসলমানরা নিজেদের পক্ষ থেকে কথা বলবার জন্যে হযরত জাফর বিন্ আবু তালিবকে (হযরত আলীর ভ্রাতা) মনোনীত করলেন। তিনি নাজ্জাশীর দরবারে যে ভাষণ দেন, তার বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাস গ্রন্থে সংরক্ষিত রয়েছে। তার সারসংক্ষেপ হচ্ছে এই ঃ

'হে বাদশাহ! আমরা কিছুকাল অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছিলাম। এক খোদাকে বিস্মৃত হয়ে মানুষের গড়া অসংখ্য মূর্তির পূজা করতাম। মরা জীব-জন্তুর গোশত খেতাম; ব্যভিচার, লুটতরাজ, চৌর্যবৃত্তি, পারস্পরিক জুলুম ইত্যাদি ছিলো আমাদের দৈনন্দিন কাজের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের শক্তিমানরা দুর্বলদের শোষণ করতে গর্ববোধ করতো। মোটকথা, জীব-জন্তুর চেয়েও আমাদের জীবনযাত্রা ছিলো নিম্ন পর্যায়ের। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমত দেখুন, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। আমাদেরই ভেতরকার এক ব্যক্তিকে তিনি রাসূল নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন। আমরা তাঁর বংশ-খান্দানকে খুব ভালো মতো জানি; তিনি অত্যন্ত শরীফ লোক। আমরা তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থার সঙ্গেও সম্যক রূপে পরিচিত। তিনি অতীব সত্যবাদী, আমানতদার ও সচ্চরিত্রবান। দোস্ত, দুশমন সবাই তাঁর সততা ও শরাফতের প্রশংসা করে। তিনি আমাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছেন এবং এই শিক্ষা দিয়েছেন ঃ তোমরা মূর্তিপূজা ছেড়ে দাও, এক আল্লাহ্‌কে নিজের মালিক ও মনিব বলে স্বীকার করো, জীবনের সকল কাজে তাঁরই বন্দেগী করো, সত্য কথা বলো, হত্যা ও খুন-খারাবি থেকে বিরত থাকো, ইয়াতিমের মাল খেয়ো না, পাড়া-পড়োশীর সাহায্য করো, ব্যভিচার ও অন্যান্য অশ্লীল ক্রিয়াকর্ম থেকে বেঁচে থাকো, নামায পড়ো, রোজা পালন করো'। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি, শিরক ও মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছি এবং সমস্ত অসৎ কাজ থেকে তওবা করেছি। এর ফলে আমাদের কওম আমাদের সাথে দুশমনি শুরু করেছে এবং পুনরায় তাদেরই ধর্মে ফিরে যাবার জন্যে আমাদের ওপর ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে। আর এজন্যেই এ লোকগুলো আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে নেবার জন্য আবেদন জানাচ্ছে।'

নাজ্জাশী বললেন ঃ 'বেশ, তোমাদের নবীর ওপর আল্লাহ্‌র যে কালাম নাযিল হয়েছে, তার কিছু অংশ আমাকে পড়ে শোনাও।' হযরত জাফর (রা) সূরা মরিয়ম থেকে কতিপয় আয়াত পড়ে শোনালেন। নাজ্জাশী তা শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। তাঁর চোখ দিয়ে

www.icsbook.info

দরদর বেগে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন ঃ 'খোদার কসম! এই কালাম আর ইঞ্জিল কিতাব একই প্রদীপের আলোকরশ্মি।' অতঃপর তিনি কুরাইশ প্রতিনিধিদের স্পষ্টত জানিয়ে দিলেন যে, তাদের হাতে মুসলমানদেরকে সমর্পণ করা যাবে না।

নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণ

পরদিন কুরাইশরা আর একটি নতুন কৌশল উদ্ভাবন করলো। তারা বাদশার দরবারে গিয়ে বললো ঃ 'এই মুসলমানদের কাছে জিজ্ঞেস করুন তো, এরা হযরত ঈসা সম্পর্কে কি আকীদা পোষণ করে?' কুরাইশরা জানতো যে, মুসলমানরা খ্রিস্টানদের আকীদার খেলাফ হযরত ঈসাকে 'খোদার পুত্র'-এর পরিবর্তে 'মরিয়ম পুত্র' বলে বলে বিশ্বাস করে আর এই কথাটি যখন নাজ্জাশীর সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন তিনি অবশ্যই এদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে আবার দরবারে ডেকে পাঠালেন। পরিস্থিতিটা আঁচ করতে পেরে মুসলমানরাও কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু হযরত জাফর (রা) বললেন যে, 'ব্যাপার যাই হোক না কেন, আমাদের সত্য কথাই বলতে হবে।' অতঃপর তিনি ভরপুর দরবারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন ঃ 'আমাদের পয়গম্বর (স) আমাদেরকে বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আ) খোদার বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল ছিলেন।' একথা শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি সরু ঘাস হাতে তুলে নিয়ে বললেন ঃ 'খোদার কসম! তুমি যা কিছু বললে, ঈসা তার চেয়ে এই ঘাস পরিমাণও বেশি ছিলেন না।' এভাবে কুরাইশদের শেষ চালবাজিও ব্যর্থ হলো। নাজ্জাশী হযরত জাফর এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে সম্মানের সাথে তাঁর দেশে বাস করবার অনুমতি দিলেন এবং তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়্যাতকে সত্য মেনে নিয়ে ইসলাম কবুল করলেন। এই নাজ্জাশীরই নাম ছিলো আসমাহা। এঁর ইন্তেকাল হলে হযরত মুহাম্মদ (স) এঁর গায়বানা জানাযা আদায় করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে ৮৩ জন মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।

হযরত হামযা (র)-র ইসলাম গ্রহণ

মক্কায় একদিকে কুরাইশদের জুলুম-পীড়ন তীব্রতর হচ্ছিলো, অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ ধৈর্য ও স্থৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগলেন। এই সংঘাতের মধ্যে মক্কার উত্তম ব্যক্তিগণ একে একে ইসলামী সংগঠনে শামিল হতে লাগলেন। হযরত হামযা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পিতৃব্য ছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি ইসলাম কবুল করেননি। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর সঙ্গে যেরূপ নির্দয় ব্যবহার করছিলো, তা আপনজন তো দূরের কথা, কোনো অনাত্মীয় লোকও সহ্য করতে পারে না। একদিন আবু জেহেল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গে অত্যন্ত অবমাননাকর আচরণ করলো। হযরত হামযা তখন শিকারে গিয়ে ছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন

www.icsbook.info

করলে জনৈক ক্রীতদাসী তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলো। তিনি ক্রোধে ধৈর্যচ্যুত হলেন এবং তীর-ধনুক সহ সোজা কা'বা গৃহে গিয়ে আবু জেহেলকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করলেন। এমন কি, সেখানেই তিনি ঘোষণা করলেন ঃ 'আমিও ইসলাম কবুল করলাম।'

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি সহানুভূতির আবেগে মুখে তো তিনি ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন; কিন্তু তাঁর মন তখনো বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করার জন্যে তৈরি হয়নি। সমস্ত দিন তিনি ভাবতে লাগলেন। অবশেষে সত্যের আবেদনই বিজয়ী হলো। তিনি মনে-প্রাণে ইসলামের প্রতি ঈমান আনলেন। এ ঘটনাটি ঘটে নবুয়্যাতের পঞ্চম বছরে। এর মাত্র কদিন পরই হযরত উমর (রা) ইসলাম কবুল করেন। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এ ঘটনাটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত উমর (রা) ছিলেন ইসলামের কঠোরতম দুশমনদের অন্যতম। কুরাইশরা একদিকে ইসলামী আন্দোলন ও তাঁর আহ্বায়কের বিরোধিতায় চরম পন্থা অবলম্বন করতে লাগলো, অন্যদিকে এদের সঠিক পথ-নির্দেশনার জন্যে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হৃদয়-মন প্রেমের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। আবু জেহেল এবং উমর উভয়েই তাঁর দুশমনীতে অত্যন্ত কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো। দাওয়াত ও তাবলীগের কোনো প্রচেষ্টাই তাদের ওপর কার্যকর হচ্ছিলো না। তাই একদিন রহ্‌মাতুল্লিল আলামীন সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করলেন ঃ 'প্রভু হে! আবু জেহেল এবং উমর এ দু'জনের মধ্যে যে তোমার কাছে বেশি প্রিয়, তাকে তুমি ইসলামের দ্বারা সম্মানিত করো।' এ দো'আর কয়েকদিন পরই হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করার তওফীক লাভ করেন। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

খোদ হযরত উমর (রা) বলেন ঃ 'একদা রাত্রে আমি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলাম। তখন তিনি কা'বার মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। তিনি ত্রস্তপায়ে এগিয়ে গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করে নামায শুরু করলেন। আমি তা শুনবার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি সূরা আল-হাক্কাহ থেকে কিরআত পড়ছিলেন। আমি সে কালাম শুনে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হলাম। তার কবিত্বময় ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী মনে হলো। আমি মনে মনে ভাবলাম ঃ খোদার কসম! লোকটি নিশ্চয়ই কবি। ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি এ আয়াত পড়লেন ঃ

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ط قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ -

এ এক সম্মানিত বার্তাবাহকের কালাম, এ কোনো কবির বাণী নয়, (কিন্তু) তোমাদের মধ্যে খুব কম লোকই ঈমান এনে থাকে। (আয়াত ঃ ৪০-৪১)

www.icsbook.info

একথা শোনামাত্রই আমার ধারণা হলো ঃ 'ওহো, লোকটি তো আমার মনের কথা জেনে ফেলেছে। এ নিশ্চয়ই কোনো গণক হবে।' এরপরই মুহাম্মদ (স)-এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ط قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ط تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

এ কোনো গণকের কালাম নয়; তোমরা খুব কমই নসিহত পেয়ে থাকো। এতো রাব্বুল 'আলামীনের কাছ থেকে নাযিল হয়েছে। (আয়াত ঃ ৪২-৪৩)

তিনি এ সূরা শেষ পর্যন্ত পড়লেন। আমি অনুভব করলাম, ইসলাম আমার হৃদয়ে তার আসন তৈরি করে নিচ্ছে।'

কিন্তু যতদূর মনে হয়, হযরত উমর (রা) অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির ও দৃঢ়চিত্ত লোক ছিলেন। এজন্যে এবারই তাঁর ভেতরকার পরিবর্তনটা পূর্ণ হলো না। তিনি তাঁর চিরাচরিত পথেই চলতে লাগলেন। এমন কি, একদিন তিনি দুশমনীর তাড়নায় উত্তেজিত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা (নাউযুবিল্লাহ) করার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন। পথিমধ্যে নয়ীম বিন্ আবদুল্লাহ্‌র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছো উমর?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মদ (স) কে খতম করতে যাচ্ছি।' নয়ীম বললো, 'আগে তোমার নিজের ঘরেরই খবর নিয়ে দেখো। তোমার নিজের বোন-ভগ্নিপতিই তো ইসলাম গ্রহণ করেছে।' একথা শুনে উমর মোড় ফিরলেন এবং সোজা বোনের বাড়িতে গিয়ে হাযির হলেন। তাঁর বোন-ভগ্নিপতি উভয়ই তখন কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। উমরকে আসতে দেখেই তাঁরা চুপ করে গেলেন এবং কুরআনের অংশটি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু তাঁরা যে কিছু পড়ছেন, তা উমর টের পেয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী পড়ছিলে? তোমরা নাকি বাপ-দাদার ধর্মকে ত্যাগ করেছো?' একথা বলেই তিনি ভগ্নিপতিকে প্রহার করতে লাগলেন। স্বামীর সাহায্যের জন্যে বোন এগিয়ে এলে তাঁকেও তিনি মারতে শুরু করলেন। এমন কি উভয়ে রক্তাপ্লুত হয়ে গেলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁরা সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন ঃ 'আমরা সজ্ঞানে ইসলাম কবুল করেছি; কাজেই তোমার কোনো কঠোরতাই আমাদেরকে এ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।' তাঁদের এই অটল সংকল্প দেখে হযরত উমর (রা) কিছুটা প্রভাবিত হলেন। তিনি বললেন, 'আচ্ছা তোমরা কি পড়ছিলে আমাকে শোনাও দেখি।' বোন ফাতিমা কুরআনের অংশটি এনে সামনে রাখলেন। সেটি ছিলো সূরা তা-হা। তিনি পড়তে শুরু করলেন এবং এই আয়াত পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন ঃ

اِنَّنِيْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ -

আমিই খোদা, আমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই; সুতরাং আমারই বন্দেগী করো এবং আমার স্মরণের জন্যে নামায পড়ো।

www.icsbook.info

এ পর্যন্ত আসতেই তিনি এতোটা প্রভাবিত হলেন যে, হঠাৎ সজোরে বলে উঠলেন ঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ। এরপর সেখান থেকে তিনি সোজা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খেদমতে রওয়ানা হলেন। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (স) সাহাবী আরকামের গৃহে অবস্থান করছিলেন। উমর দরজার কাছে পৌছলে তাঁর হাতে তরবারি দেখে উপস্থিত সাহাবীগণ ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু হযরত হামযা (রা) বললেন ঃ 'আসুক না, তাঁর নিয়্যত যদি ভালো হয় তো ভালো কথা। নচেত তার তরবারি দ্বারাই তার মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো।' উমর ঘরের মধ্যে পা বাড়াতেই হযরত মুহাম্মদ (স) এগিয়ে এসে তাঁকে সজোরে আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কি উমর , কি উদ্দেশ্য এসেছো?' একথা শুনেই যেন উমর ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জবাব দিলেন, 'ঈমান আনার উদ্দেশ্যে।' হযরত মুহাম্মদ (স) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবার' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাহাবী তকবীর ধ্বনি উচ্চরণ করলেন।[১৭]

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী সংগঠনের শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেলো। এতোদিন মুসলমানরা প্রকাশ্যে ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে পারছিলো না; কা'বাগৃহে জামা'আতের সাথে নামায পড়াও ছিলো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন ঘটলো। তিনি নিজেই প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। এ ব্যাপারে অনেক হাঙ্গামা হলো বটে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা কা'বা মসজিদে জামা'আতের সাথে নামায পড়ার সুযোগ লাভ করলো; তাদের সংগঠনও আগের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হলো। পরন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে আখিরী নবী (স)-এর দো'আ কতোখানি মঞ্জুর হয়েছিলে, তা-ও বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করতে পারলো। দীর্ঘ চৌদ্দ'শ বছর অতিক্রান্ত হবার পরও আজ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলা হরযত উমর (রা)-এর দ্বারা ইসলামকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন, তার দ্বিতীয় কোনো নজীর নেই।

সামাজিক বয়কট ও গিরি-দুর্গে বন্দী

ইসলামী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি দেখে কুরাইশ সর্দারগণ ক্রমাগত তেলে-বেগুনে জ্বলতে লাগলো। তারা এ আন্দোলনকে দমিয়ে দেবার জন্যে নিত্য-নতুন ফন্দি উদ্ভাবন করতে লাগলো। এবার তারা একটি নতুন ফন্দি আঁটলো। তারা সমস্ত গোত্রকে একত্র করে এই মর্মে এক চুক্তি সম্পাদন করলো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করার জন্যে তাদের হাতে সমর্পণ না করা হবে, ততক্ষণ কেউ তাঁর খান্দান বনী হাশিমের সংস্পর্শে যাবে না, কেউ তাদের সাথে বেচাকেনা করবে না, কেউ

১৭. হযরত হামযা (রা) ও হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন ৫ম নববী সালে। এ সময় পর্যন্ত চল্লিশ জনেরও বেশি পুরুষ এবং ১১ জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। —সম্পাদক

www.icsbook.info

তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করবে না এবং কেউ তাদেরকে খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ করবে না। এই চুক্তি লিখে কা'বার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হলো।[১৮]

এবার বনী হাশিমের সামনে মাত্র দুটি পথই খোলা রইলো ঃ হয় হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কাফিরদের হাতে সমর্পণ করে দিতে হবে, নচেত এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের ফলে উদ্ভূত দুঃখ-মুসিবত বরদাশ্‌ত করার জন্যে তৈরি হতে হবে। আবু তালিব বাধ্য হয়ে এই শেষোক্ত পন্থাটিই বেছে নিলেন এবং বনী হাশিমের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত খান্দান নিয়ে 'শে'বে আবু আবুতালিব' নামক একটি গিরি-দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।[১৯] জায়গাটি উত্তরাধিকার সূত্রে বনী হাশিমের মালিকানাভুক্ত ছিলো। এ গিরি-দুর্গের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে তাঁদের দীর্ঘ তিন বছরকাল অশেষ দুর্গতির মধ্যে জীবন কাটাতে হলো। এ সময়ে কখনো কখনো তাঁদের গাছের পাতা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হতো। এমনকি ক্ষুধার তাড়নায় শুকনো চামড়া পর্যন্ত তাঁদের সিদ্ধ করে খেতে হতো। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা যখন ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করতো, তখন জালিমরা তা শুনে পৈশাচিক আনন্দ প্রকাশ করতো। কখনো কোনো হৃদয়বান ব্যক্তির মনে করুণার উদ্রেক হলে হয়তো লুকিয়ে তিনি কিছু খাবার পাঠিয়ে দিতেন।

এভাবে ক্রমাগত তিন বছরকাল বনী হাশিম গোত্র ধৈর্যের অগ্নি-পরীক্ষা প্রদান করলো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জালিমদের হৃদয়েই করুণার সঞ্চার করলেন। একের পর এক কুরাইশের মন নম্র হতে লাগলো এবং তাদের তরফ থেকেই চুক্তি ভঙ্গের আন্দোলন শুরু হলো। আবু জেহেল এবং তার মতাবলম্বী কিছু লোক অবশ্য বেঁকে বসলো; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের চক্রান্ত আর সফলকাম হলো না। প্রায় দশম নববী সালে হাশিম গোত্র গিরি-দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলো।

আন্দোলনের বিস্তৃতি

আগেই বলা হয়েছে যে, ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থগুলোতে মক্কী পর্যায়ের সংগ্রামের বিবরণ খুব কমই উল্লেখিত হয়েছে। তাই এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের মধ্যে দাওয়াত ও আন্দোলনের কাজ কিভাবে চালু ছিলো এবং তা কতোটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলো, এ সম্পর্কে কোনো বিস্তৃত বিবরণই পাওয়া যায় না। অবশ্য কুরআন শরীফ যথারীতিই নাযিল হতে থাকে। এ সময় যে সমস্ত সূরা নাযিল হয়, তার বিষয়বস্তু, নির্দেশাবলী ও শিক্ষাগুলো সামনে রাখলে এ পর্যায়ে আন্দোলনকে কোন্ কোন্ অবস্থার ভেতর দিয়ে এগোতে হয়েছে, তা অনেকটাই অনুমান করা যায়।

---

১৮. এ সময় আবার ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করলো।—সম্পাদক

১৯. ইবনে খালদুনের মতে, গিরি দুর্গে বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিবের অমুসলিম সদস্যরাও (আবু লাহাব ছাড়া) হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গী হয়েছিলো।—সম্পাদক

www.icsbook.info

এই দীর্ঘ ও কঠিন সংঘাতকালে আল্লাহ তা'আলা যে সব কালাম নাযিল করেন, সে সবের বক্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত আবেগময় এবং প্রভাবশালী। এতে ঈমানদারগণকে তাদের কর্তব্য-কর্ম বাতলে দেয়া হয় এবং তার ওপর অবিচল থাকার নির্দেশ দেয়া হয়; তাদের ব্যক্তি-চরিত্রকে উচ্চ থেকে উচ্চতর মানে উন্নীত করার পদ্ধতি বলে দেয়া হয়; তাক্‌ওয়া ও পরহেজগারী রপ্ত করা এবং অধিক পরিমাণে এ গুণটি অর্জন করার ওপর জোর দেয়া হয়; নৈতিক চরিত্রের সমুন্নতি এবং আদত-অভ্যাস সংশোধনের জন্যে তাগিদ দেয়া হয়; লোকদের মধ্যে সংগঠনী চেতনা উজ্জীবিত করে সমষ্টিগত চরিত্রের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; দ্বীন-ইসলাম প্রচারে সঠিক পন্থা বাতলে দেয়া হয় এবং কঠিন ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধৈর্য ধারণ করার জন্যে বারবার তাকিদ দেয়া হয়; সাফল্যের ওয়াদা এবং জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে লোকদের মনোবল বৃদ্ধি করা হয়; দ্বীন-ইসলামের বন্ধুর পথে অবিচল থাকা এবং হিম্মতের সঙ্গে আল্লাহ্‌র পথে অব্যাহত সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়; সর্বোপরি, লোকেরা যাতে দুঃখ-মুসিবত ও নির্মমতা বরদাশত করতে সমর্থ হয়, সেজন্যে তাদের মধ্যে আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনার সঞ্চার করা হয়। পক্ষান্তরে বিরুদ্ধবাদী অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রতি বিরূপ লোকদেরকে ও তাদের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে বারবার সতর্ক করে দেয়া হয়। এ ধরনের গাফিলতি ও অবিশ্বাসের কারণে ইতঃপূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের শিক্ষামূলক ঘটনাগুলো এদেরকে বারবার শোনানো হয়। (এ সমস্ত ঘটনার কথা খোদ আরবরাও কম-বেশি অবহিত ছিলো)। যে বিরাট জনপদের ওপর দিয়ে তারা দিনরাত যাতায়াত করতো, সেগুলোর ধ্বংসাবশেষের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। পরন্তু তারা জমিন ও আসমানে দিনরাত যে সব সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছিলো, সেগুলোর সাহায্যে তওহীদ ও আখিরাতের দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়; শিরকের অনিষ্টকারিতা ও ভয়াবহ পরিণতি সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করা হয়; খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা গ্রহণের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়; আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসের ফলে জীবনে যে বিকৃতি ও বিপর্যয় দেখা দেয়, সে সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয়। বাপ-দাদার অন্ধ অনুসৃতির ফলে মানবতার যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়, তার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়। আর এসব কথা এমন অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে বিবৃত করা হয় যে, একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই তা মনের গভীরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

পরন্তু বিরুদ্ধবাদী ও অবিশ্বাসীদের উত্থাপিত আপত্তিগুলোরও যুক্তিসহ জবাব দান করা হয়। তারা যেসব সন্দেহ পেশ করতো, তারও নিরসন করা হয়। মোটকথা, যেসব বিভ্রান্তিতে তারা নিজেরা নিমজ্জিত ছিলো এবং যা দ্বারা অন্যকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করতো, তার সবই দূরীভূত করা হয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এই গোটা সময়ে তাদের বিরুদ্ধতা ও বৈরিতা এতটুকু হ্রাস পায়নি, বরং তা ক্রমাগত বেড়েই চলছিলো।

www.icsbook.info

চতুর্থ স্তর ঃ জুলুম ও নির্যাতনের পরাকাষ্ঠা

হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীগণ শে'ব গিরি-দুর্গ থেকে কেবল বেরিয়ে এসেছেন এবং কুরাইশদের জুলুম-পীড়ন থেকে সাময়িকভাবে কিছুটা অব্যাহতি পেয়েছেন। এর মাত্র ক'দিন পরই তাঁর চাচা আবু তালিব মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এর কিছুদিন পর হযরত খাদীজা (রা)ও পরলোক গমন করলেন।[২০] এই বছরটিকে হযরত মুহাম্মদ (স) 'শোকের বছর' বলে অভিহিত করতেন। এই দুই ব্যক্তিত্বের তিরোধানের পর কুরাইশদের বিরুদ্ধতা ও জুলুম-পীড়নের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। এ যুগটি ছিল ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন যুগ। এরপর থেকে কুরাইশরা মুসলমান ও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয়ভাবে উৎপীড়ন চালাতে শুরু করলো।

মক্কার বাইরে তাবলীগ

মক্কাবাসীদের মধ্যে যাঁরা উত্তম লোক ছিলেন, তাঁরা একে একে প্রায় সকলেই ইসলামী সংগঠনে যোগদান করলেন। তাই হযরত মুহাম্মদ (স) এবার মক্কার বাইরে গিয়ে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করার ফয়সালা করলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রথমে তিনি তায়েফ[২১] গমন করলেন। তায়েফে ছিলো বড়ো বড়ো বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকদের বাস। হযরত মুহাম্মদ (স) ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এইসব বড় লোকদের কাছে হাযির হলেন। কিন্তু দৌলত ও ক্ষমতা যেমন প্রায়শই সত্যের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, এখানেও ঠিক তা-ই হলো। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে জনৈক তায়েফ সর্দার বিদ্রূপ করে বললো ঃ 'খোদা কি তাঁর রাসূল বানাবার জন্যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে খুঁজে পাননি?' অপর একজন বললো ঃ 'আমি তো তোমার সঙ্গে কথাই বলতে পারি না। কারণ, তুমি যদি সত্যবাদী হও তো তোমার সঙ্গে কথা বলা আদবের খেলাফ। আর মিথ্যাবাদী (নাউযুবিল্লাহ) হলে তো তুমি মুখ লাগানোরই যোগ্য নও।'

মোটকথা, এই 'বড়ো' লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথাকে এমনি হেসে উড়িয়ে দেয়। শুধু তা-ই নয়, তারা শহরের গুণ্ডা-বদমায়েশদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে উস্কে দেয়। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে পথে প্রান্তরে সর্বত্র ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং তাঁর প্রতি অবিরাম পাথর নিক্ষেপ করে। এর ফলে তিনি অত্যন্ত গুরুতরভাবে আহত হন; তাঁর পবিত্র দেহ থেকে অনর্গল রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে এবং তাতে তাঁর পবিত্র পাদুকাদ্বয়

---

২০. মৃত্যুকালে আবু তালিবের বয়স হয়েছিলো ৮৭ বছর এবং হযরত খাদীজা (রা)-এর ৬৫ বছর।

২১. তায়েফ মক্কা থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি উর্বর, সমৃদ্ধ ও মনোরম স্থান। আরবের বিত্তবান বনী সাকীফ গোত্র এখানে বাস করতো। —সম্পাদক

www.icsbook.info

পূর্ণ হয়ে যায়। তবুও জালিমরা অবিরাম তাঁর প্রতি পাথর নিক্ষেপ ও গালি-গালাজ বর্ষণ করতে থাকে। এমন কি, তিনি একটি বাগানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হন।[২২]

কোনো বিরোধী শহরে এভাবে একাকী গিয়ে তাবলীগী দায়িত্ব পালন করা এবং জীবন বিপন্ন করে খোদার বান্দাদের কাছে খোদার বাণী পৌঁছানো কতোখানি হিম্মত ও নির্ভীকতার পরিচায়ক, তা আন্দাজ করা মোটেই কষ্টকর নয়। খোদার প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান ও তাঁর ওপর চূড়ান্ত নির্ভরতার এ যেমন এক মহত্তম উদাহরণ, তেমনি পরবর্তীকালের লোকদের জন্যেও এ এক অনুকরণীয় আদর্শ।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর একটি নিয়ম ছিলো এই যে, প্রতি বছর হজ্জ উপলক্ষে যখন সারা দেশ থেকে নানান গোত্রের লোকেরা মক্কায় আগমন করতো, তখন তিনি প্রত্যেক গোত্রের কাছে গিয়ে লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতেন। অনুরূপভাবে আরবের বিভিন্ন স্থানে যে সব মেলা বসতো, তাতেও তিনি যোগদান[২৩] করতেন এবং এই জনসমাগমের সুযোগে লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। এই সব ক্ষেত্রে প্রায়শই কুরাইশ সর্দারগণ (বিশেষত আবু লাহাব) তাঁর পেছন ধরতো এবং তিনি যেসব সমাবেশে বক্তৃতা দান করতেন, সেখানে গিয়ে লোকদেরকে বলতো ঃ 'দেখ, এর কথা তোমরা শুনো না; এ আমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং লোকদের কাছে মিথ্যা কথা বলে।' এসব ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (স) লোকদেরকে কুরআন পাকের এমন সব অংশ শোনাতেন, প্রভাব বিস্তারের দিক দিয়ে যা শাণিত তীরের ন্যায় কাজ করতো। কুরআনের এসব অংশ শুনে অধিকাংশ লোকের হৃদয়ে ইসলামের জন্যে আসন তৈরি হয়ে যেতো। মোটকথা, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর এই সব তাবলীগী সফর প্রভাব ও পরিণতির দিক দিয়ে অত্যন্ত সফলকাম বলে প্রমাণিত হলো। এখন আর আরবে ইসলামী আন্দোলন কোনো অভিনব বস্তুর পর্যায়ে রইলো না, বরং দূর-দূরাঞ্চল পর্যন্ত তার পরিধি বিস্তৃতি লাভ করলো। আর যাঁরা এ আন্দোলনের সঙ্গী হবার জন্যে আগেই মনস্থ করেছিলেন, তাঁরাও নিজ নিজ এলাকায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করে দিলেন।

জ্বিনদের প্রসঙ্গ

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে জ্বিনও একটি বিশেষ সৃষ্টি। মানুষের ন্যায় জ্বিনদেরও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা আছে। এই কারণে তাদের প্রতিও খোদার

---

২২. তায়েফে রাসূলে করীম (স) এক মাসকাল অবস্থান করেন। এই একটি মাস তিনি খোদার বাণী প্রচারের জন্যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তাঁর দাওয়াতে কেউ সাড়া দেয়া দূরের কথা, সর্বত্র তিনি চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও নিগ্রহের সম্মুখীন হন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি জালিমদের বিরুদ্ধে খোদার কাছে এতটুকু বদ্‌দো'আ করেননি।—সম্পাদক

২৩. এই যোগদানের অর্থ মেলার গর্হিত ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ নয়, বরং তার কাছাকাছি স্থানে গিয়ে সমবেত লোকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।—সম্পাদক

www.icsbook.info

দেয়া বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য। তওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ এবং এক আল্লাহর তা'আলার হুকুম-আহকামের আনুগত্য করা তাদের জন্যেও বাধ্যতামূলক। আর এ কারণে তাদের মধ্যেও ভালো-মন্দ দুটি শ্রেণী আছে।

জ্বিনদের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে মানব সমাজে নানারূপ আজগুবি ধারণা চলে আসছে। আরবেও জ্বিন সম্পর্কে একটি বিশেষ মতবাদ গড়ে উঠেছিলো। মূর্খ লোকেরা তাদের পূজা করতো, তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো। সাধারণ ওঝা শ্রেণীর লোকেরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের দাবি করতো। নানারূপ কিস্‌সা-কাহিনী তাদের সম্পর্কে প্রচলিত ছিলো। মোটকথা, অসংখ্য দেব-দেবীর ন্যায় জ্বিনদেরকেও খোদায়ীর ব্যাপারে শরীকদার মনে করা হতো। ইসলাম এসে এসব আকীদা-বিশ্বাস সংশোধন করে দিলো। সে বললো ঃ জ্বিন খোদার একটি বিশেষ সৃষ্টি বটে, কিন্তু খোদায়ীর ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্রও দখল নেই। সে আপন ক্ষমতাবলে না পারে কারো উপকার করতে আর না পারে কারো ক্ষতি করতে। মানুষের ন্যায় জ্বিনদের প্রতিও আল্লাহ্‌র বন্দেগী ফরয করা হয়েছে।[২৪] তাদের মধ্যেও খোদার অনুগত ও অবাধ্য—এ দুটি শ্রেণী রয়েছে। তারাও মানুষের ন্যায় নিজ নিজ আমলের পুরস্কার ও শাস্তি লাভ করবে। খোদার কুদরতের সামনে তারাও একটি অক্ষম ও অসহায় জীবমাত্র।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন পরিপূর্ণ ও সর্বশেষ রূপ নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে। এ দ্বীনের আনুগত্য যেমন মানুষের জন্যে, তেমনি জ্বিনের জন্যেও বাধ্যতামূলক ছিলো। একদা হযরত মুহাম্মদ (স) এক তাবলীগী সফর উপলক্ষে 'উকাজ' নামক আরবের এক বিখ্যাত মেলায় গমন করছিলেন। পথে 'নাখলা' নামক স্থানে তাঁকে একটি রাত অবস্থান করতে হলো। ঘটনাক্রমে এমনি সময় জ্বিনদের একটি দল ঐদিক দিয়ে যাচ্ছিলো। তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কিরআত শুনে থমকে দাঁড়ালো। এ ঘটনা কুরআনের সূরা আহকাফ-এ এভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ - قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ - يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ -

২৪. এ পর্যায়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার বন্দেগী ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।—সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬

www.icsbook.info

হে নবী! আমরা জ্বিনদের একটি দলের গতি তোমার দিকে ফিরিয়ে দিই, যেন তারা কুরআন শুনতে পায়। তারা এসে পরস্পরকে বললো ঃ 'চুপ থাক।' কুরআন পাঠ শেষ হলে তারা গিয়ে আপন জাতিকে সতর্ক করে বললো ঃ 'ভাই সব! আমরা একটি কিতাব শুনে এসেছি, যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে এবং পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে, যা সত্যের দিকে পরিচালিত করে এবং সোজা পথ প্রদর্শন করে। ভাইসব! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীদের কথা মানো এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনো, যেন তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেন এবং কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দান করেন। (আয়াত ঃ ২৯-৩১)।

এ ঘটনার কথা হযরত মুহাম্মদ (স) ওহীর মারফতে জানতে পারেন। সূরা জ্বিনে এর বিস্তৃত বিবরণও উল্লিখিত হয়েছে।

মদীনায় ইসলামের আগমন

ইসলামের আওয়াজ যেমন আরবের বিভিন্ন দূর-দারাজ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিলো, তেমনি সে আওয়াজ মদীনায় গিয়েও উপনীত হলো। মদীনায় তখন বেশ কিছু ইহুদী জনবসতি ছিলো। তারা বহু প্রাচীনকাল থেকে সেখানে এসে বসবাস করতো। তারা মদীনার আশপাশে ছোট ছোট দুর্গ বানিয়ে নিয়েছিলো। এছাড়াও সেখানে ছিলো বড় বড় দুটি অ-ইহুদী গোত্র।

একদা আওস ও খাজরাজ নামে মদীনায় দুই ভাই ছিলো। এদের আদি নিবাস ছিলো ইয়ামেন; কিন্তু কোন এক সময় এরা মদীনায় এসে বসবাস শুরু করে। এদেরই সন্তান সন্ততি থেকে সেখানে 'আওস' ও 'খাজরাজ' নামে দুটি বড়ো বড়ো খান্দান গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এরাই 'আনসার' উপাধিতে ভূষিত হয়। এরা মদীনা এবং তার আশপাশে অনেক ছোটো ছোট দুর্গ তৈরি করে রেখেছিলো। ধর্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়ে এরাও মূর্তিপূজক ছিলো বটে, কিন্তু ইহুদীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ওহী, নবুয়্যাত, আসমানী কিতাব এবং আখিরাত সম্পর্কিত আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গেও অনেকটা পরিচিত ছিলো। কিন্তু যেহেতু এদের নিজেদের কাছেই এ ধরনের কোনো জিনিস বর্তমান ছিলো না, সে জন্যে ধর্মীয় ব্যাপারে এরা ইহুদীদের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত ছিলো। তাদের কথার ওপর এরা যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করতো। এরা ইহুদী আলেমদের কাছ থেকে এ-ও জানতে পেরেছিলো যে, দুনিয়ায় আরো একজন পয়গম্বর আসবেন। যারা তাঁর অনুগমন করবে, তারাই সফলকাম হবে। পরন্তু এই পয়গাম্বরের অনুবর্তীরাই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে। এই সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতেই মদীনাবাসী নবী করীম (স) এবং তাঁর আন্দোলনের প্রতি উৎসুক হয়ে উঠেছিলো।

www.icsbook.info

আগেই বলা হয়েছে যে, হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আগত গোত্র-প্রধানদের কাছে গমন করা এবং তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হবার আহ্বান জানানো হযরত মুহাম্মদ (স)-এর একটা নিয়ম ছিলো। দশম নববী সালের কোনো এক সময়ে হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কার অদূরবর্তী 'আকাবা' নামক স্থানে খাজরাজ বংশের কতিপয় লোকের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন এবং তাদেরকে কুরআন মজীদের কিছু আয়াত পড়ে শোনান। সে কালাম শুনে তারা অত্যন্ত প্রভাবিত হলো এবং বুঝতে পারলো ঃ ইহুদী অলেমরা যে নবী আসার কথা বলে থাকে, ইনিই সেই নবী। তারা একে অপরের দিকে চেয়ে বললো ঃ 'না জানি এই নবীর ওপর ঈমান আনার ব্যাপারে ইহুদীরা শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবটুকু অর্জন করে বসে।' একথা বলেই তাঁরা ইসলাম কবুল করলো। এদের দলে মোট ছয়জন সদস্য ছিলো। এভাবে মদীনার আনসারদের মধ্যে ইসলামের সূচনা হলো এবং যে জনপদটি উত্তরকালে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিলো, তাতে সর্বপ্রথম ইসলামের রোশনি প্রবেশ করলো।

বিরোধিতার তীব্রতা

যে কোনো আন্দোলনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতও স্বভাবত বাড়তে থাকে। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের বিস্তৃতির সঙ্গে বিরোধিতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যে প্রচন্ডতা দেখা দেয়, তা তার অনুগামীদেরকে অধিকতর কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করে। দশম নববী সাল নাগাদ ইসলামী আন্দোলন যেমন ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করছিল, তেমনি সত্যের আহ্বায়ক এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছিলো। কুরাইশ প্রধানগণ চূড়ান্তভাবে স্থির করলো যে, তারা খোদ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর এতোটা উৎপীড়ন চালাবে, যাতে তিনি নিজেই বাধ্য হয়ে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত হন। কুরাইশের বড়ো বড়ো সর্দারগণ ছিলো তাঁর প্রতিবেশী এবং এরাই ছিলো তাঁর সবচেয়ে বড় দুশমন। এরা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো, নামায পড়ার সময় হাসি-ঠাট্টা করতো। তিনি সিজদায় থাকলে তাঁর ঘাড়ের ওপর নাড়িভুঁড়ি এনে ফেলতো এবং গলায় চাদর জড়িয়ে এমন নির্দয়ভাবে টানতো যে, তাঁর পবিত্র গর্দানে দাগ পড়ে যেতো। তাঁর পেছনে দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে দেয়া হতো। তারা তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতো এবং নারকীয় উল্লাসে হাততালি দিতো। কোথাও কখনো তিনি বক্তৃতা দান করলে সভার মাঝখানে তারা গোলযোগের সৃষ্টি করতো এবং বলতো, এ সবই মিথ্যা কথা। মোটকথা, হয়রানি ও উৎপীড়নের যতো ন্যক্কারজনক পন্থা ছিলো, তা সবই তারা অবলম্বন করছিলো।

এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি যে সব ওহী নাযিল করছিলেন, তাতে এ সব অবস্থার মুকাবিলার জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বর্তমান ছিলো। ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসেনাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হলো ঃ বর্তমানে সত্যের ওপর

www.icsbook.info

দৃশ্যত যে জুলুমের পাহাড় ভেঙে পড়ছে, তাকে কোনো স্থায়ী ব্যাপার মনে করা উচিত নয়। দুনিয়ার জীবনে এ ধরনের তামাসা বারবারই ঘটে আসছে। তাছাড়া সফলতার আসল ক্ষেত্র এ দুনিয়াবী জীবন নয়, বরং পরকালীন জীবন। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, যারা তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে, পরকাল তাদের জন্যেই উত্তম।

রাসূলে আকরাম (স)-কে উদ্দেশ করে বলা হলো ঃ 'আমি জানি তোমার সঙ্গে যা কিছু করা হচ্ছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কিন্তু এই সব লোক সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে শুধু তোমারই নয়, বরং আমারই প্রতি অসত্যারোপ করছে। আর এটা কোনো নতুন কথা নয়, এর আগেও আমার নবী-রাসূলদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা ধৈর্য ও সবরের সাথে এই পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছেন এবং আমার সাহায্য না পৌঁছা পর্যন্ত সর্ববিধ দুঃখ-মুসিবতকে হাসিমুখে সহ্য করেছেন। তুমিও এমনি পরিস্থিতি অতিক্রম করছো এবং এরূপ পরিস্থিতিই অতিক্রম করতে হবে।'

সাহাবায়ে কিরামকে বারবার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝিয়ে দেয়া হলো যে, হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, যাকে বদলে দেয়ার সাধ্য কারো নেই। সে নিয়ম অনুসারে হকপন্থীদেরকে এক সুদীর্ঘকালব্যাপী যাচাই করা এবং তাদের ধৈর্য, সততা, আত্মত্যাগ, আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও ঈমানী দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়া একান্ত অপরিহার্য। সেই সঙ্গে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা এবং তাঁর প্রতি ঈমানের ব্যাপারে তারা কতখানি মজবুত, তা-ও নিরূপন করা প্রয়োজন। কারণ, এইরূপ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের মাধ্যমে তাদের মধ্যে এমন এসব গুণাবলীর সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীকালে আল্লাহ্‌র দ্বীনের খাঁটি অনুবর্তী হবার পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে থাকে। আর লোকেরা যখন এরূপ পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্য প্রতিপন্ন হয়, কেবল তখনই আল্লাহ্‌র সাহায্য এসে হাযির হয়। এর আগে কখনো তা আসতে পারে না।

আকাবার প্রথম শপথ

পরবর্তী বছর মদীনার বারোজন অধিবাসী আকাবা নামক স্থানে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হাতে হাত দিয়ে ছটি মৌল বিষয়ে আনুগত্যের শপথ (বাইয়াত) গ্রহণ করলো[২৫] এবং ইসলামের শিক্ষা প্রচারের নিমিত্ত তাদের সাথে কাউকে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়ার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলো। হযরত মুহাম্মদ (স) মাসয়াব বিন উমাইর (রা)-কে তাদের সাথে মদীনায় প্রেরণ করলেন। তিনি মদীনার ঘরে ঘরে গিয়ে লোকদেরকে কুরআন মজীদ পড়ে শোনাতেন এবং ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। এভাবে দু'একজন করে লোক

২৫. শপথের বিষয়বস্তু আকাবার দ্বিতীয় শপথ পর্যায়ে উল্লিখিত হচ্ছে। —সম্পাদক

www.icsbook.info

ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো। ক্রমান্বয়ে মদীনার বাইরেও ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। আওস গোত্রের প্রধান হযরত সা'দ বিন মা'আজও হযরত মাসয়াবের হাতে ইসলাম কবুল করলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিলো গোটা আওস গোত্রেরই ইসলাম গ্রহণের শামিল।

আকাবার দ্বিতীয় শপথ

এর পরবর্তী বছর হজ্জ উপলক্ষে মদীনা থেকে বাহাত্তর জন অধিবাসী মক্কায় এলো। তারা অন্য সঙ্গীদের থেকে লুকিয়ে আকাবা গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর হাতে ইসলাম কবুল করলো এবং যে কোন অবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের সাথে সহযোগিতা করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। হযরত মুহাম্মদ (স) এই দলটির মধ্য থেকে বারো ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে নকীব (নেতা) নিযুক্ত করলেন। এদের মধ্যে নয়জন ছিলো খাজরাজ গোত্রের এবং বাকী তিনজন আওস গোত্রের। হযরত মুহাম্মদ (স) পূর্বোক্তদের মতো এদের কাছ থেকে ও নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞাসমূহ গ্রহণ করলেন ঃ

১. এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবো না।

২. চৌর্যবৃত্তির প্রশ্রয় দেবো না।

৩. ব্যভিচারে লিপ্ত হবো না।

৪. আপন সন্তানদের হত্যা করবো না।

৫. কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেবো না। (কারো গীবত করবো না)।

৬. রাসূলুল্লাহ (স)-এর দেয়া সুকৃতির আদেশ কখনো অমান্য করবো না।

শপথের পর হযরত মুহাম্মদ (স) বললেন ঃ 'যদি তোমরা এই শর্তগুলো পালন করো, তাহলে তোমাদের জন্যে বেহেশতের সুসংবাদ। নচেত তোমাদের ব্যাপার সম্পূর্ণ খোদার হাতে নিবদ্ধ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের মাফ করেও দিতে পারেন অথবা শাস্তিদানও করতে পারেন।'

এই লোকগুলো যখন শপথ গ্রহণ করছিলেন, তখন সা'দ বিন জারারাহ দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'ভাইসব! তোমরা কি জানো, কি কথার ওপর তোমরা শপথ গ্রহণ করছো? জেনে রাখো, এ হচ্ছে গোটা আরব ও আজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল।' সকলে সমস্বরে বললো, 'হ্যাঁ, আমরা সব কিছু বুঝে-শুনেই শপথ গ্রহণ করছি।' প্রতিনিধিদলের আরো কয়েকজন সদস্য এ ধরনের জোরালো বক্তৃতা প্রদান করেন। ঠিক এই সময়েই

www.icsbook.info

মদীনার এই সব নও-মুসলিম এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মধ্যে স্থিরিকৃত হয় যে, কোনো সময় যদি হযরত মুহাম্মদ (স) মদীনায় গমন করেন তো মদীনাবাসীরা সর্বতোভাবে তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা করবে। এই সময় হযরত বারাআ (রা) বলেন যে, 'আমরা তরবারির কোলে লালিত হচ্ছি।'

www.icsbook.info

৬
মু'জিযা ও মি'রাজ

মু'জিযা কথাটির সাধারণ অর্থ কোনো অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু দ্বীন-ইসলামের পরিভাষায় মু'জিযা হচ্ছে এক প্রকারের চূড়ান্ত দলীল। কোনো পয়গাম্বরের নবুয়্যাত দাবিকে প্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে এই দলীলকে উপস্থাপন করেন। অবশ্য তার জন্যে শর্ত এই যে, দলীলের বিষয়বস্তুকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ঃ আগুনের কাজ হচ্ছে দাহ করা, কিন্তু এক্ষেত্রে তা দাহ করবে না; সমুদ্রের ধর্ম হচ্ছে প্রবাহিত হওয়া, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রবাহ থেমে যাবে; বৃক্ষের স্বভাব হচ্ছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা, কিন্তু এক্ষেত্রে সে চলমান হবে। অনুরূপভাবে মৃত জীবিত হয়ে উঠবে, লাঠি সাপে পরিণত হবে ইত্যাদি। যেহেতু দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজের আসল কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মহিমা এবং তাঁর ইচ্ছা মাত্র, সেহেতু কোনো কোনো কাজ যেমন নির্ধারিত নিয়মে ক্রমাগত সম্পন্ন হতে থাকে, ঠিক তেমনি কোনো কোনো কাজ আল্লাহ্‌র তা'আলারই মহিমায় এই স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বিচ্যুত হয়ে কোনো অস্বাভাবিক নিয়মেও হতে পারে। আর যখন আল্লাহর ইচ্ছা হয়, তখন তা হয়েও থাকে।

আল্লাহ তা'আলা অধিকাংশ নবীকেই তাঁদের নবুয়্যাতের সত্যতা প্রমাণের জন্যে মু'জিযার ক্ষমতা দান করেছিলেন। কিন্তু সে মু'জিযা কাফিরদের ঈমান আনা ও বিশ্বাস পোষণের কারণ হিসেবে খুব কমই কাজ করেছে। আগেই বলা হয়েছে, মু'জিযা হচ্ছে এক প্রকারের চূড়ান্ত দলীল। এজন্যে লোকেরা যখন মু'জিযা দেখার পরও নবীকে অস্বীকার করেছে, তখন তাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা গযব নাযিল করেছেন এবং দুনিয়া থেকে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। মক্কার কুরাইশরাও হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে মু"জিযা দাবি করছিলো। তাদের এই দাবিকে বারবার এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। কারণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামানুযায়ী কোনো জনগোষ্ঠীকে তাদের দাবি অনুসারে যদি কোনো মুজিযা দেখানো হয়, তাহলে তারপর তাদের সামনে শুধু দুটি পথই খোলা থাকে ঃ ঈমান অথবা ধ্বংস। কুরাইশদেরকে এক্ষুণি ধ্বংস করে দেয়ার কোনো ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলার ছিলো না। সেজন্যে তাদের দাবিকেও বারবার এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। কিন্তু ইসলামের দাওয়াত পেশ করতে করতে যখন দীর্ঘ দশ-এগারটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো এবং লোকদেরকে বুঝানোর কাজও প্রায় শেষ হয়ে এলো, তখন হযরত মুহাম্মদ (স) এবং অন্যান্য মুমিনদের মনে মাঝে মাঝে আগ্রহ জাগতে লাগলো ঃ হায়! আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যদি কোনো অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ পেতো, যা

www.icsbook.info

দেখে অবিশ্বাসী লোকেরা ঈমান আনতো এবং ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতো! কিন্তু তাঁদের এই আগ্রহের জবাবে বলা হচ্ছিলো ঃ 'দেখো, অধৈর্য হয়ো না। যে ধারা ও নিয়মে আমি আন্দোলন পরিচালিত করছি, ঠিক সেভাবে ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে তুমি কাজ করতে থাকো। মু'জিযা দ্বারা কাজ হাসিল করতে চাইলে তা অনেক আগেই সম্পন্ন হয়ে যেতো। আমি যদি ইচ্ছা করতাম তো এক একটি কাফিরের অন্তর মোমের মতো নরম করে দিতাম এবং তাদেরকে জোরপূর্বক সুপথে চালিত করতাম। কিন্তু এ আমার নীতি নয়। এভাবে না মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার কোনো পরীক্ষা হয়ে থাকে আর না তার চিন্তাধারা ও নৈতিক জীবনে আদর্শ সমাজ গড়ার উপযোগী কোনো বিপ্লব আসতে পারে। তথাপি লোকদের বেপরোয়া আচরণ এবং তাদের অবিশ্বাসের ফলে যদি তুমি ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে না পারো তো তোমার যা ইচ্ছা হয় তা-ই করো। জমিনের মধ্যে ঢুকে অথবা আসমানে উঠে কোনো মু'জিযা নিয়ে এসো।'[২৬]

কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কোনো মু'জিযাই দান করা হয়নি। তাঁর সবচেয়ে বড়ো মু'জিযা তো খোদ কুরআন মজীদ (এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে আছে)। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে অসংখ্য মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে চন্দ্র দ্বিখন্ডিতকরণ এবং তাঁর মহাকাশ ভ্রমণ (মি'রাজ) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এতৎভিন্ন বহুতর ভবিষ্যৎবাণীর সফল হওয়া, তাঁর দো'আর ফলে পানি বর্ষিত হওয়া, লোকদের সুপথপ্রাপ্ত হওয়া, প্রয়োজনের সময় অল্প জিনিস বৃদ্ধি পাওয়া, রুগ্ন ব্যক্তির আরোগ্য লাভ করা, পানি প্রবাহিত হওয়া ইত্যাকার অসংখ্যা মু'জিযা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্র দ্বিখন্ডিতকরণ

মক্কার কাফিরদের সামনে প্রমাণ পেশ করার জন্যে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যে সব মু'জিযা দেখাতে হয়, তন্মধ্যে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের ঘটনাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মাসউদ (রা) এই ঘটনাটি বিবৃত করেছেন এবং সহীহ বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে তা উল্লিখিত হয়েছে। তিনি এ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন এবং স্বচক্ষে চাঁদকে দু'টুকরা হতে দেখেছেন। তিনি বলেন ঃ "আমরা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গে মিনায় ছিলাম, ঠিক এমনি সময় দেখলাম চন্দ্রটি দ্বিখন্ডিত হয়ে গেলো এবং তার একটি খণ্ড পাহাড়ের দিকে চলে গেলো। হযরত মুহাম্মদ (স) বললেন ঃ 'সাক্ষী থেকো।'[২৭]

---

২৬. সূরা আন'আম, আয়াত ঃ ৩৫

২৭. 'সিরাতুন্নবী' প্রণেতা আল্লামা শিবলী নোমানীসহ অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, আরবের বিভিন্ন স্থান থেকে মক্কায় আগত অনেক লোকই এ ঘটনা সম্পর্কে অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়েছেন।—সম্পাদক

www.icsbook.info

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, মু'জিযা দেখার পরই কাফিররা ঈমান আনবে, এমন কোনো বাধ্যবধাকতা নেই; বরং কার্যত দেখা যায় যে, যে সব লোকের মন অবিশ্বাস ও হঠকারিতায় পরিপূর্ণ, কেবল তারাই মু'জিযা দাবি করে। এভাবেই তারা নিজেদের অবিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকার জন্যে বাহানা তালাশ করে থাকে। নচেত যাদের অন্তরে ঈমান কবুল করার মতো যোগ্যতা থাকে এবং যারা পার্থিব স্বার্থের জালেও জড়িত নয়, তাদের কাছে তো হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মহান চরিত্র এবং তাঁর শিক্ষাগুলোই সবচেয়ে বড়ো মুজিযা। আর এই শ্রেণীর লোকেরাই যে সত্য ধর্ম গ্রহণে হামেশা অগ্রবর্তী হয়ে থাকে, তা বলাই বাহুল্য। তাই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হবার পরও কাফিররা বলতে পারলো; 'ওহো, এটা তো একটা জাদুর ব্যাপার; জাদুর সাহায্যে চিরদিনই এরকম কাজ হয়ে আসছে।' এভাবে তারা সুপথপ্রাপ্তির এক দুর্লভ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলো। অবশ্য এমনি সুস্পষ্ট নিদর্শনের পরও তারা আল্লাহ্‌র রাসূলকে মিথ্যা মনে করায় তাদের ব্যাধির তালিকায় আরো একটি গুরুতর ব্যাধি সংযোজিত হলো।

মি'রাজ

মি'রাজ অর্থ ঊর্ধে আরোহণ। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর এক মহাকাশ ভ্রমণ সম্পর্কে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এজন্যে তাঁর এই ভ্রমণকে মি'রাজ বলা হয়। এর অপর নাম হচ্ছে 'ইস্‌রা' অর্থাৎ রাতের পর রাত ভ্রমণ করা। এ ভ্রমণ যেহেতু রাতের পর রাত অব্যাহত ছিলো, সে জন্যে একে 'ইস্‌রা'ও বলা হয়। কুরআন পাকে এই শব্দটিই ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ্‌র নবীদেরকে দাওয়াত, তাবলীগ ও ইকামতে দ্বীনের যে বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিতে হয়, সে জন্যে অত্যন্ত উঁচুদরের ঈমান ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন। এ কারণেই তাঁরা যে অদৃশ্য সত্যের প্রতি ঈমান আনার জন্যে আহ্বান জানিয়ে থাকেন, তা অন্তত তাঁদের নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করা দরকার। কারণ তাঁদেরকে সারা দুনিয়ার সামনে এ কথা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে হয় যে, তোমরা শুধু আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে একটা জিনিসকে অস্বীকার করছো; অথচ আমরা নিজ চোখে দেখা সত্যকেই বিবৃত করছি। তোমাদের কাছে আছে শুধু আন্দাজ-অনুমান, আমাদের কাছে আছে ইল্‌ম ও জ্ঞান। এজন্যে অধিকাংশ নবীর কাছেই ফেরেশতা আত্মপ্রকাশ করেছে, তাঁদেরকে আসমান ও জমিনের বিশাল রাজত্ব প্রত্যক্ষ করানো হয়েছে, স্বচক্ষে বেহেশত ও দোযখ দেখানো হয়েছে এবং এ জীবনেই মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করানো হয়েছে। মি'রাজ বা ইস্‌রা এ ধরনেরই একটি ঘটনা মাত্র। এতে একজন মুমিনকে যে সব অদৃশ্য সত্যের প্রতি ঈমান আনতে হয়, হযরত মুহাম্মদ (স)-কে তা স্বচক্ষে দেখানো হয়েছে।

মি'রাজের ঘটনা কোন্ তারিখে ঘটেছিলো, এ সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্ন রূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। অবশ্য সমস্ত বর্ণনা সামনে রেখে ঐতিহাসিকগণ এ তথ্যকে অগ্রাধিকার

www.icsbook.info

দিয়েছেন যে, এ ঘটনা হিজরতের প্রায় বছর দেড়েক আগে ঘটেছিলো। এ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারী এবং মুসলিমের বর্ণনা সামনে রাখলে যে মোটামুটি বিবরণ পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ ঃ

একদিন সকাল বেলা হযরত মুহাম্মদ (স) প্রকাশ করেন ঃ 'গত রাতে আমার প্রভু আমায় অত্যন্ত সম্মানিত করেন। আমি শুয়ে বিশ্রাম করছিলাম, এমন সময় জিবরাঈল এসে আমাকে জাগিয়ে কা'বা মসজিদে নিয়ে যান। সেখানে তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করেন এবং তা জমজমের (কা'বার মধ্যকার পবিত্র কুয়া) পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলেন। অতঃপর তাকে ঈমান ও হিকমত দ্বারা পূর্ণ করে বিদীর্ণ স্থান পূর্বের ন্যায় জুড়ে দেন। এরপর তিনি আমার আরোহণের জন্যে খচ্চরের চেয়ে কিছু ছোট একটি সাদা জানোয়ার উপস্থিত করেন। তার নাম ছিলো বুরাক। এটি অত্যন্ত দ্রুতগতিসম্পন্ন জানোয়ার ছিলো। আমি তার ওপর আরোহণ করতেই বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে উপনীত হলাম। এখানে বুরাকটি মসজিদে আকসার দরজার সাথে বেঁধে রেখে আমি মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে দু' রাকা'আত নামায পড়লাম। এই সময় জিবরাঈল আমার সামনে দুটি পেয়ালা উপস্থিত করলেন। তার একটিতে শরাব এবং অপরটিতে ছিলো দুধ। আমি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করে শরাবেরটি ফেরত দিলাম। এটা দেখে জিবরাঈল বললেন ঃ 'আপনি দুধের পেয়ালাটি গ্রহণ করে স্বভাব-ধর্মকেই (দ্বীনে ফিত্‌রাত) অবলম্বন করেছেন।'

'এরপর মহাকাশ ভ্রমণ শুরু হলো। আমরা যখন প্রথম আকাশ (পৃথিবীর নিকটতম আকাশ) পর্যন্ত পৌছলাম, তখন জিবরাঈল পাহারাদার ফেরেশতাকে দরজা খুলে দিতে বললেন। সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার সাথে কে আছেন?' জিবরাঈল বললেন, 'মুহাম্মদ।' ফেরেশতা আবার জিজ্ঞেস করলো, এঁকে কি ডাকা হয়েছে?' জিবরাঈল বললেন, 'হ্যাঁ ডাকা হয়েছে।' একথা শুনে ফেরেশতা দরজা খুলতে খুলতে বললো, 'এমন ব্যক্তিত্বের আগমন মুবারক হোক।'

'আমরা ভেতরে ঢুকতেই হযরত আদম (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। জিবরাঈল আমায় বললেন, 'ইনি আপনার পিতা (মানব বংশের আদি পুরুষ) আদম। আপনি এঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাবদান প্রসঙ্গে বললেন, 'খোশ আমদেদ! হে নেক পুত্র, হে সত্য নবী'! এরপর আমরা দ্বিতীয় আকাশে পৌছলাম এবং প্রথম আকাশের ন্যায় সওয়াল-জবাবের পর দরজা খুলে দেয়া হলো। আমরা ভেতরে গেলাম এবং হযরত ইয়াহ্ইয়া ও হযরত ঈসা (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। জিবরাঈল তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি সালাম করুন।' আমি সালাম করলাম। উভয়ে জবাবদান প্রসঙ্গে বললেন, 'খোশ-আমদেদ! হে নেক ভ্রাতা, হে সত্য নবী!' অতঃপর আমরা তৃতীয় আকাশে পৌছলাম। এখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর

www.icsbook.info

সঙ্গে দেখা হলো। আগের মতোই তার সঙ্গে সালাম-কালাম হলো। অনুরূপভাবে চতুর্থ আকাশে হযরত ইদরীস (আ)-এর সঙ্গে, পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন (আ)-এর সঙ্গে এবং ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। সর্বশেষ সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো এবং তিনিও সালামের জবাবদান প্রসঙ্গে বললেন, 'খোশ-আমদেদ! হে নেক পুত্র, হে নেক নবী! এরপর আমাকে 'সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা' নামক একটি সমুন্নত বরই গাছ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া হলো। এর ওপর অগণিত ফেরেশতা জোনাকির মত ঝিকমিক করছিলো।'

এখানে হযরত মুহাম্মদ (স) অনেক গোপন রহস্য প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গেও কথাবার্তা বললেন।[২৮] এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মতের জন্যে দিন-রাত মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিলেন। এ সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পর তিনি যখন প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আবার হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'বলুন, খোদার দরবার থেকে কি উপহার নিয়ে যাচ্ছেন?' হযরত মুহাম্মদ (স) বললেন, 'দিন-রাতে পঞ্চাশ বার নামায।' মূসা (আ) বললেন ঃ 'আপনার উম্মত এতো বড়ো বোঝা বহন করতে পারবে না; কাজেই আপনি ফিরে যান এবং এটা কম করে আনুন।' হযরত মুহাম্মদ (স) আবার ফিরে গেলেন এবং নামাযের ওয়াক্ত কমানোর জন্যে আবেদন জানালেন। ফলে ওয়াক্তের সংখ্যা কিছুটা কমিয়ে দেয়া হলো। কিন্তু মূসা (আ) হযরত মুহাম্মদ (স)-কে বারবার পাঠালেন এবং প্রত্যেক বারই সংখ্যা কমতে লাগলো। অবশেষে কমতে কমতে সংখ্যা মাত্র পাঁচটি রয়ে গেলো। এতেও হযরত মূসা (অ) নিশ্চিত হলেন না, বরং তিনি আরো কম করানোর কথা বললেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) বললেন ঃ 'আমার আর কিছু বলতে লজ্জা করছে।' এ সময় আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে এই মর্মে ঘোষণা এলো ঃ 'যদিও আমি নামাযের সংখ্যা কমিয়ে পঞ্চাশ থেকে পাঁচ করে দিয়েছি, তবু তোমার উম্মতের মধ্যে যারা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে, তাদেরকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযেরই পুরস্কার দান করা হবে।'

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া এই উপলক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আরও দু'টি উপহার পাওয়া গেলো। একটি হচ্ছে সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমষ্টি, যাতে ইসলামের মৌল আকীদাগুলো এবং ঈমানের পূর্ণতার বিষয় বিবৃত করার পর এই মর্মে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, মুসিবতের দিন এখন সমাপ্ত-প্রায়। দ্বিতীয় হচ্ছে এই সুসংবাদ যে, উম্মতে মুহাম্মদীর ভেতর যারা অন্তত শিরক থেকে বেঁচে থাকবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।'

---

২৮. এই কথাবার্তাকে কেউ কেউ খোদার সাথে সাক্ষাতকার বলে ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। খোদার সাথে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথাবার্তা হয়েছিলো স্পষ্টতই একটি পর্দার আড়াল থেকে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত থেকেও এর অকাট্য প্রমাণ মেলে।—সম্পাদক।

www.icsbook.info

এই ভ্রমণকালে হযরত মুহাম্মদ (স) স্বচক্ষে বেহেশত এবং দোযখও পরিদর্শন করেন। মৃত্যুর পর আপন কৃতকর্মের দৃষ্টিতে মানুষকে যে সমস্ত পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, তার কয়েকটি দৃশ্যও তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয়।

মহাকাশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আবার বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে দেখেন যে, অন্যান্য নবীগণ সেখানে সমবেত হয়েছেন। তিনি নামায পড়লেন এবং সবাই তাঁর পেছনে নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি নিজের জায়গায় ফিরে আসেন এবং ভোর বেলা সেখান থেকে সজাগ হন।

মি'রাজের গুরুত্ব এবং ভবিষ্যতের জন্যে ইঙ্গিত

সকাল বেলা হযরত মুহাম্মদ (স) মহাকাশ ভ্রমণের এই ঘটনার কথা জনসমক্ষে বিবৃত করলেন। বিরুদ্ধবাদী কাফির কুরাইশরা তাঁকে মিথ্যাবাদী (নাউযুবিল্লাহ) বলে অভিহিত করলো। পক্ষান্তরে যাদের হৃদয়ে তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে আস্থা ছিলো, তারা এর প্রতিটি হরফকেই সত্য বলে মেনে নিলো।[২৯] তারা বললো ঃ 'হযরত যখন নিজেই এ ঘটনার কথা বলেছেন, তখন এর সবটাই সত্য।' এভাবে মি'রাজের ঘটনা একদিকে ছিলো লোকদের ঈমান ও নবুয়্যাত স্বীকারের পরীক্ষাস্বরূপ, অন্যদিকে ছিলো খোদ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পক্ষে অসংখ্য গায়েবী রহস্য প্রত্যক্ষ করার উপায়। সেই সঙ্গে এ ছিলো সেই অনাগত বিপ্লবের প্রতিও এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যা ইসলামী আন্দোলনকে অনতিকালের মধ্যেই সংঘটিত করতে হয়েছিলো। এই ইঙ্গিতের বিস্তৃত বিবরণ কুরআন পাকের সূরা বনী ইসরাঈলে (মি'রাজ সম্পর্কিত আলোচনায়) বিবৃত হয়েছে। এই সূরার বিষয়বস্তুতে যেসব সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ

নেতৃত্ব থেকে ইহুদীদের অপসারণ

বনী ইসরাঈলীগণ এই পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দ্বীনের উত্তরাধিকার এবং আল্লাহ্‌র বাণীর সাথে বিশ্ববাসীকে পরিচিত করানোর মহান দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু তারা এ খেদমত আঞ্জাম দেয়া তো দূরের কথা, বরং নিজেরাই অসংখ্য প্রকার পাপাচারে লিপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দ্বীনের খেদমত করার অযোগ্য হয়ে পড়েছিলো। সুতরাং এ খেদমতের দায়িত্ব এবার বনী ইসমাঈলের ওপর ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-কে এই খান্দানের মধ্যেই প্রেরণ করা হলো। ইতঃপূর্বে বনী ইসরাঈলকে সরাসরি উদ্দেশ করে কিছু বলা হয়নি; কিন্তু এবার সূরা বনী ইসরাঈলে তাদেরকে বলে দেয়া

২৯. মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছেন যে, এটা কি শারীরিকভাবে ঘটেছিলো না স্বপ্নযোগে? এ প্রশ্নটা নিতান্তই অবান্তর এবং স্থূলদৃষ্টির পরিচায়ক। প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত বিবরণ থেকে দেখা যায়, মি'রাজ শরীরিকভাবেই সংঘটিত হয়েছিলো। হযরত মুহাম্মদ (স) নিজে এটা স্বপ্নযোগে ঘটার ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত দেননি; কাজেই এ ধরনের প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই।—সম্পাদক

www.icsbook.info

হলো যে, এ পর্যন্ত তোমরা যে ভুলভ্রান্তি করেছো তাতো করেছোই। এর আগে তোমাদেরকে দু'দুবার যাচাই করা হয়েছে; কিন্তু তোমরা আপন দোষ-ত্রুটি সংশোধন করোনি। এবার বনী ইসমাঈলের এই নবীকে পাঠানোর পর তোমাদেরকে শেষ বারের মতো সুযোগ দেয়া হচ্ছে। যদি তোমরা এর আনুগত্য করো, তাহলে আবার তোমরা উন্নতির পথে এগিয়ে চলতে পারবে।

বস্তুত মক্কার চরম উৎপীড়ন ও পেরেশানীময় জীবনে এই ইঙ্গিত ছিলো একটি মস্তবড়ো সুসংবাদ, যা পরবর্তীকালে হুবহু সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো।

মক্কার কাফিরদের প্রতি সর্তকবাণী

মক্কার কাফিরদের জুলুম-পীড়ন এবং হঠকারিতা ইতোমধ্যে চরমে পৌঁছেছিলো। তারা বারবার চ্যালেঞ্জ দিতে লাগলো ঃ 'মুহাম্মদ (স) যদি আল্লাহ্‌র রাসূলই হবে, তাহলে আমাদের অবিশ্বাসের কারণে আমাদের ওপর কেন আযাব নাযিল হয় না? তাহলে তো সে আমাদেরকে ভয় দেখাতো পারতো।' এর জবাবে তাদেরকে বলা হলো ঃ 'আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত নীতি এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল আসেন, ততক্ষণ তার ওপর কোন আযাব নাযিল হয় না। যখন রাসূল আগমন করেন, তখন জাতির বিত্তবান ও প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর সত্য প্রচারের পথ রোধ করার জন্যে কোমর বেঁধে লেগে যায়। অন্যদিকে সাধারণ নির্যাতিত লোকেরা তাঁর সহযোগিতা করার জন্যে এগিয়ে আসে। অবশ্য প্রথমোক্তদের মধ্যে সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে যোগ্যতাসম্পন্ন কিছু লোকও বর্তমান থাকে এবং তারা এগিয়ে এসে সত্যকে গ্রহণও করে। এরপর এই দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায় এবং পরিণামে মজলুমের জন্যে আল্লাহ্‌র সাহায্য আসে। এই সাহায্যের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। কিন্তু মানুষ স্বভাবতই তাড়াহুড়াপ্রবণ বলে কখনো কখনো সে অকল্যাণকর জিনিসকেও ভালো মনে করে দাবি করতে থাকে। তার এটা খেয়ালই হয় না যে, আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেকটি কাজই তার নিজস্ব সময়ের জন্যে নির্ধারিত। দিন-রাতের আবর্তনের বিষয়টির প্রতিই লক্ষ্য করো ঃ এর ভিতর আল্লাহ তা'আলার কতো নিদর্শন রয়েছে এবং একটি বাঁধাধরা নিয়ম অনুযায়ী কিরূপ একের পর এক দিন-রাত ঘুরে আসছে। অতীত ইতিহাস লক্ষ্য করে দেখো ঃ নূহ (আ)-এর পর থেকে এ পর্যন্ত কতো জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অবস্থা পুরাপুরি অবগত রয়েছেন। তিনি প্রত্যেকের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দিয়ে থাকেন। সুতরাং মক্কার কাফিরদেরও জানা উচিত যে, তারা প্রথম আল্লাহ্‌র রাসূলের দাওয়াতের মুকাবিলায় যে ভূমিকা গ্রহণ করবে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হবে। আর চূড়ান্ত ফয়সালার সময় এখন খুবই সন্নিকটবর্তী।'

www.icsbook.info

ইসলামী সমাজের বুনিয়াদ

এবার মুসলমানদের জীবন থেকে দুঃখ-রজনীর অবসান ঘটার এবং ইসলামী নীতির ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ একটি সমাজ গঠিত হবার সময় ঘনিয়ে এলো। মি'রাজের ঘটনা থেকে এই ইসলামী সমাজের বুনিয়াদী নীতিসমূহও উপহার পাওয়া গেলো। যে নীতিসমূহ ভবিষ্যতে ইসলামী জীবন পদ্ধতির জন্যে নির্দেশক নীতিমালা হিসেবে কাজ করবে, তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে ঃ

১. আল্লাহ্‌র সাথে আর কাউকে প্রভু ও মা'বুদ বানানো যাবে না। ইবাদত-বন্দেগী (গোলামী বা দাসত্ব), আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতায়ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা চলবে না।

২. পিতামাতাকে সম্মান এবং তাঁদের আনুগত্য করে চলতে হবে। কোথাও তাঁদের আনুগত্য খোদার আনুগত্যের প্রতিকূল হলে সেখানে তাঁদের আনুগত্য বর্জন করতে হবে।

৩. আত্মীয়-কুটুম্ব, মিসকীন ও মুসাফিরদের হক আদায় করতে হবে। সমাজের নাগরিকদের পরস্পরের ওপর যে অধিকার রয়েছে, তার প্রতি উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য দেখানো যাবে না। সমস্ত অধিকার সঠিকভাবে আদায় করতে হবে। নচেত কোনো সামাজিক ব্যবস্থা শোধরানো যেতে পারে না।

৪. অপব্যয় ও অপচয় করা যাবে না; কেননা, খোদার দেয়া সম্পদকে অনর্থক ব্যয় করা শয়তানের কাজ। যে সমাজের লোকেরা নির্বিচারে অর্থ ব্যয় করে অথবা অর্থের মায়ায় সম্পূর্ণরূপে হাত গুটিয়ে বসে, তা কখনো সুস্থ বা সমৃদ্ধ হতে পারে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

৫. দারিদ্র্য ও অনটনের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না; কেননা জীবিকার ব্যবস্থা করা খোদার কাজ এবং তিনি তার ইন্তেজাম করেই থাকেন। কাজেই খাদ্যাভাবের আশংকায় ভবিষ্যত বংশধরদের ধ্বংস করো না। এটা অত্যন্ত গোনাহ্‌র কাজ এবং সামাজিক আত্মহত্যার নামান্তর।

৬. ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হয়ো না। এই নোংরা কাজটি থেকে শুধু বেঁচে থাকাই নয়, বরং এই ঘৃণ্য কাজে উৎসাহজনক প্রত্যেকটি তৎপরতাই খতম করে দাও। যে সমাজ এই লা'নত থেকে মুক্ত না হবে, সে নিজেই নিজের মূলোচ্ছেদ করবে এবং শীগ্‌গীরই ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হবে।

৭. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করো না। যে সমাজে লোকদের জীবন-প্রাণ নিরাপদ নয়, তা কখনো সমৃদ্ধ হতে পারে না। শান্তিপূর্ণ অবস্থা ছাড়া কোনো সমাজেরই উন্নতি

www.icsbook.info

লাভ করা সম্ভবপর নয়। কাজেই সর্বপ্রথম লোকদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা আবশ্যক।

৮. ইয়াতিমের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। অক্ষম, দুর্বল ও অসহায় (অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজেই নিজের অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে না) লোকদের সাহায্য করো। যে সমাজে দুর্বল ও অক্ষম লোকদের অধিকার সংরক্ষণ না করা হবে, তা কখনো প্রগতি অর্জন করতে পারবে না।

৯. আপন অঙ্গীকার পূর্ণ করো। কারণ অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অঙ্গীকার বলতে লোকদের পারস্পরিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি যেমন বুঝায়, তেমনি ঈমান আনার সময় খোদার সাথে মুমিন বান্দাহ্‌র কৃত ওয়াদাকেও বুঝায়।

১০. ওজন ও মাপ-জোখের সময় দাঁড়িপাল্লা ও মাপকাঠি ঠিক রেখো। লেন-দেনের ব্যাপারে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখা এবং পরের অধিকার সংরক্ষণ করা সমাজের শান্তি ও শৃংখলার জন্যে অতীব প্রয়োজন। যেখানে লোকদের পরস্পরের প্রতি আস্থা না থাকবে এবং সাধারণভাবে লোকেরা পরের হক মেরে খাবার ফিকিরে থাকবে, সেখানে কোনো সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে না।

১১. যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পেছনে ছুটো না। অজানা ও অজ্ঞাত বিষয়ের পেছনে ছুটা এবং আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই লোকদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কাজেই এইসব দোষ-ত্রুটি থেকে প্রত্যেকটি উত্তম সমাজেরই মুক্ত হওয়া উচিত। লোকদের জেনে রাখা দরকার যে, তাদের কান, চোখ এবং মন সম্পর্কেই সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

১২. জমিনের ওপর অহংকারের সাথে চলো না; কেননা গর্ব ও অহংকার মানুষকে নিকৃষ্ট চরিত্রের দিকে ঠেলে দেয়। এই দোষের ফলেই মানুষ সমাজের পক্ষে অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই নিজের মুকাবিলায় অন্য কাউকে হেয় মনে না করা এবং কারো সঙ্গে অমানুষিক আচরণ না করা পারস্পরিক সম্পর্কের সুস্থতা বিধানের জন্যে একান্ত অপরিহার্য।

হিজরতের জন্য ইঙ্গিত

আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতির মধ্যে তাঁর রাসূল প্রেরণ করেন, তখন সে জাতির লোকেরা যাতে সেই রাসূলের দাওয়াত শুনতে, বুঝতে এবং গ্রহণ করতে পারে, তজ্জন্যে তিনি কিছুকাল সুযোগ প্রদান করেন। এই সুযোগের ফলে কিছু লোক তো আপনাতেই সেই দাওয়াত কবুল করে নেয়, কিন্তু বেশির ভাগ লোকই পার্থিব স্বার্থ, বাপ-দাদার অন্ধ অনুসৃতি ও প্রবৃত্তির গোলামীতে লিপ্ত থাকে বলে সেই দাওয়াতকে বর্জন করে এবং তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে লেগে যায়। অবশেষে এমন এক সময় আসে,

www.icsbook.info

যখন স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, জাতির মধ্যকার যোগ্য লোকেরা আন্দোলনকে কবুল করে নিয়েছে; এখন আর এ আন্দোলনের প্রতি কর্ণপাত করতে কিংবা এ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তা করতে আগ্রহী কোনো লোক বাকী নেই।

বস্তুত এমনি পর্যায়ে এসেই জাতির লোকেরা নবীর কাছে মু'জিযা দাবি করে বসে এবং প্রায়শ সে জাতির সামনে মু'জিযা উপস্থাপন করা হয়। তাই এ পর্যায়ে এসে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছেও মু'জিযা দাবি করা হলো এবং তিনি বিভিন্ন রূপ মু'জিযা প্রদর্শনও করলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অবিশ্বাসের ওপর অটল হয়ে রইলো, তখন স্থির করা হলো যে, এখন এ জাতির মধ্য থেকে নবীর চলে যাওয়াই উচিত। কেননা এখন যে কোন মুহূর্তে এদের ওপর আযাব আসতে পারে। এই আযাব কখনো আসমান বা জমিনের কোনো প্রাকৃতিক শক্তির (যেমন ঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি) মাধ্যমে আসে আবার কখনো তা মুমিনদের দ্বারাও সংঘটিত হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এই সূরা বনী ইসরাঈলেই তাঁর এ নিয়মের কথা উল্লেখ করে নবীকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, 'এই লোকগুলো হঠকারিতার চরমে পৌঁছে খুব শীগ্‌গীরই তোমাকে এই জনপদ (মক্কা) ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করবে। যদি তা-ই হয়, তাহলে তোমার বিদায়ের পরে এরা এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে না। তোমার পূর্বে আমি যতো রাসূল পাঠিয়েছি, সবার ক্ষেত্রেই এ নিয়ম চলে এসেছে। আর এখনো এতে কোন পরিবর্তন সূচিত হবে না।'

তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব

এই সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতির মুকাবিলায় আত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে ফরয নামায ছাড়াও তাহাজ্জুদ নামাযের আয়োজন করার নির্দেশ দেয়া হলো। এ ছাড়া হিজরতের জন্যে নবীকে নিম্নোক্ত দো'আ শিখিয়ে দেয়া হলো ঃ 'হে প্রভু! আমাকে ভালো জায়গা চিনে নেবার তওফীক দিও এবং এখান থেকে সহি-সালামতে বের করে নিও আর নিজের তরফ থেকে সাহায্য পাঠিয়ে দুশমনদের ওপর বিজয় দান করো।' অতঃপর এই সুসংবাদও প্রদান করা হলো যে, সত্যের বিজয় এবং মিথ্যার পতন অবশ্যম্ভাবী; কারণ পতনের জন্যেই মিথ্যার উত্থান। এর জন্যে শুধু শর্ত এই যে, সত্যকে ময়দানে উপস্থিত থাকতে হবে।

এরপর হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে মক্কার কাফিররা যে সব প্রশ্ন ও আপত্তি উত্থাপন করেছিলো, তারও জবাব দেয়া হলো। এভাবে যুক্তি-প্রমাণ কানায় কানায় পূর্ণ করে দেয়ার পর শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হলো।

www.icsbook.info

এ যুগের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

এ পর্যায়ে কুরআনের যে সব অংশ নাযিল হচ্ছিলো, সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ

১. আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভরতা

মানুষের প্রকৃতি এই যে, যখন সে কোনো কাজের জন্যে চেষ্টা-সাধনা করে এবং তার আশানুরূপ ফলাফল লাভে ব্যর্থ হয়, তখন তার ওপর একটা নৈরাশ্যের অন্ধকার নেমে আসতে থাকে। সত্যের আন্দোলনের নিশানবাহীদের জন্যে এই পর্যায়টিই সবচেয়ে বেশি কঠিন হয়ে থাকে। খোদা না করুন, তারা যদি এরূপ নৈরাশ্যের শিকারে পরিণত হয়, তাহলে তাদের এবং গোটা আন্দোলনের পক্ষে তা এক বিরাট ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এমনি পর্যায়ে সঠিক পথে থাকা এবং ফলাফলকে সম্পূর্ণ খোদার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্যে অত্যন্ত মজবুত ঈমানের প্রয়োজন। তাই এই কঠিন পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে এ সম্বন্ধেই পথ-নির্দেশ নাযিল করেন। দীর্ঘ বারো বছরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা-সাধনার যে ফলাফল সামনে ছিলো, তা একজন সাধারণ লোকের পক্ষে ছিলো নিরুৎসাহব্যঞ্জক। তাছাড়া এতো দীর্ঘদিন পরও মুমিনদের যে সব উৎপীড়নের সম্মুখীন হতে হচ্ছিলো, তাও নেহাত কম তিতিক্ষার ব্যাপার ছিলো না। এজন্যে মুমিনদের হৃদয়কে মজবুত করা এবং তাদেরকে সঠিক পথে চালিত করার জন্যে এ পর্যায়ে বিশেষভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

এ ব্যাপারে সূরা আনকাবুতের প্রতিপাদ্য বিষয় একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। এতে মুমিনদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হলো যে, তোমরা যে পথে চলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছো, যাচাই-পরীক্ষা হচ্ছে সে পথের অপরিহার্য মঞ্জিল। এই নিরিখ দ্বারা যাচাই করেই ঈমানের প্রশ্নে সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদীদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। কিন্তু মুমিনদের এই যাচাই-পরীক্ষা করার অর্থ এই নয় যে, কাফিররা প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রাধান্য অর্জন করেছে, বরং তাদেরও জেনে নেয়া উচিত যে, খোদার মুকাবিলায় তারা কখনোই বিজয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত হতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত সত্যের আওয়াজ বুলন্দ হবেই। এজন্যে শুধু শর্ত এই যে, সত্যের অগ্রসেনাদেরকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার দ্বারা আল্লাহ্‌র সাহায্যের যোগ্য প্রতিপন্ন হতে হবে। এ প্রসঙ্গে মুমিনদেরকে আরো বলা হলো ঃ এ পথে তো স্বভাবতঃই বাধা-বিপত্তি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এসে থাকে, কিন্তু তাদের কিছুতেই নিরাশ হওয়া উচিত নয়। এর আগেও আল্লাহ্‌র যে সমস্ত বান্দাহ ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ করেছেন, তাঁদেরকেও এমনি অবস্থাই অতিক্রম করতে হয়েছে। হযরত নূহ (আ)-এর কথা উল্লেখ করে বলা হলো যে, তিনি দীর্ঘ সাড়ে ন'শ বছর পর্যন্ত কতো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে আপন জাতির বিরোধিতা সহ্য করেছেন। অনুরূপভাবে হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত লূত (আ), হযরত শুআইব (আ), হযরত

www.icsbook.info

সালেহ (আ) প্রমুখকেও এমনি পরিস্থিতিরই মুকাবিলা করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যেরই বিজয় হয়েছে এবং মিথ্যাকে ময়দান ছেড়ে পালাতে হয়েছে।

এর আগে বলা হয়েছে যে,কাফিরদের মুজিযা দাবির ফলে হযরত মুহাম্মদ (স) এবং অন্যান্য মুমিনদের হৃদয়ে কখনো কখনো এই মর্মে আগ্রহ জাগ তো ঃ হায়! এমন কোনো মু'জিযা যদি প্রকাশ পেতো, যা দেখে এই লোকগুলো ঈমান আনতো। এই আগ্রহের জবাবে আল্লাহ তা'আলা যে পথনির্দেশ পাঠিয়েছেন, তাও ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযার প্রতি লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তোমরা তো মুজিযা দাবি করছো; কিন্তু তার পূর্বে যে মু'জিযা দুনিয়ার শেষ দিন পর্যন্ত মানব জাতির জন্যে এক স্থায়ী নিদর্শন রূপে বিরাজ করবে এবং যাতে রয়েছে প্রতিটি জ্ঞানী ও সমঝদার মানুষের জন্যে নির্ভুল পথনির্দেশ, সেই কুরআন মজীদের ওপর সর্বপ্রথম তোমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত।

এই পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে ঃ 'নবুয়্যাতের আগে হযরত মুহাম্মদ (স) যে কোনো প্রকার পুঁথিগত জ্ঞান অর্জন করেননি এবং কোনোরূপ লেখাপড়া পর্যন্ত শেখেননি, তা ঐ বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে কে না জানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পেশকৃত কালাম এতো উন্নত এবং জ্ঞানগর্ভ যে একজন উম্মী (নিরক্ষর) লোক যে এমন অপূর্ব কালাম পেশ করতে পারে, তাদের বড়ো বড়ো আলেমরা পর্যন্ত তার কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে না। এতৎসত্ত্বেও এই লোকগুলো অবিরত মু'জিযা দাবি করে চলেছে। এদেরকে বলে দিন, মু'জিযা প্রকাশ পাওয়া বা না পাওয়া তো আমার প্রভুর ইচ্ছাধীন বিষয়। আমি শুধু তোমাদের পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনকারী মাত্র। অবশ্য আমি তোমাদেরকে যে আল্লাহ্‌র বাণী শুনাই, তা আমার নবুয়্যাতের দাবি প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট কিনা তা তোমাদের একটু ভেবে দেখা দরকার। তোমরা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, যে সব লোকের ভেতর হৃদয়কে ঈমানের সম্পদে সমৃদ্ধ করার মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা রয়েছে, এ বাণীসমূহ কেবল তাদেরই জন্যে রহমত ও নসিহত স্বরূপ।

২. কুরআন শ্রেষ্ঠ মু'জিযা

বস্তুত হযরত মুহাম্মদ (স)-কে যতো মু'জিযাই দান করা হয়েছে, তন্মধ্যে কুরআন নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ মু'জিযা।

হযরত মুহাম্মদ (স) নিজেও কুরআন পাককে তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মু'জিযা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক পয়গাম্বরকেই আল্লাহ তা'আলা প্রচুর মু'জিযা দান করেছেন এবং তা দেখেই লোকেরা ঈমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যে মু'জিযা দান করা হয়েছে, তা হচ্ছে আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহী (কুরআন)। এজন্যে আমি

www.icsbook.info

প্রত্যাশা করি, কিয়ামতের দিন আমার অনুগামীদের সংখ্যাই হবে সবচেয়ে বেশি।' বস্তুত কুরআন হচ্ছে এক স্থায়ী মু'জিযা আর অন্যান্য মু'জিযা হচ্ছে সাময়িক। সে সব মু'জিযা বিলীন হয়ে গেছে; কিন্তু এ মু'জিযা কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে থাকবে এবং লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকবে। কুরআন পাকের ছন্দোময় ভাষা, এর মাধুর্য ও লালিত্য, এতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-বহির্ভূত অদৃশ্য খবরাখবর ও ভবিষ্যৎবাণীর উল্লেখ , এর অপূর্ব প্রভাব বিস্তারকারী ক্ষমতা, এর বিধি-বিধান ও শিক্ষাসমূহের অতুলনীয় কল্যাণকর ভূমিকা, আজ পর্যন্ত কুরআন উপস্থাপিত জীবন পদ্ধতির মতো কার্যকর আর কোনো জীবন পদ্ধতি উদ্ভাবনে মানব সমাজের ব্যর্থতা, এর বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও সকল প্রকার অসংগতি ও বৈপরিত্য থেকে তার মুক্ত থাকা, সর্বোপরি এক নিরক্ষর ব্যক্তির জবান থেকে এই সমস্ত বাণী নিঃসৃত হওয়া—এসব কিছুই কুরআন পাকের মু'জিযা হবার জন্যে অকাট্য প্রমাণ। এই সমস্ত দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে আজো হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়্যাত সম্পর্কে মানুষের মন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত ও নিঃসন্দেহ হতে পারে এবং তা হয়েও থাকে।

৩. চূড়ান্ত কথা

এ পর্যায়ে অবতীর্ণ কালামের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এবার থেকে কাফিরদের সাথে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও চূড়ান্তভাবে কথা বলা শুরু হলো। এর ধরনটা ছিলো এই যে, এবার বুঝানো এবং বাতলানোর পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। মানবার যদি ইচ্ছা থাকে তো এখনো সময় আছে, মেনে নাও। নচেত অবিশ্বাস ও হঠকারিতার পরিণাম ভোগ করার জন্যে তৈরি হও।

তাই হযরত মুহাম্মদ (স) তাদেরকে স্পষ্টত বলে দিলেন ঃ 'আমি তো আমার প্রভুর তরফ থেকে অবতীর্ণ একটি উজ্জ্বল প্রমাণের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আর তোমরা তাকে এই বলে অস্বীকার করছো যে, এই অবিশ্বাসের ফলে যে আযাব আসবার তা আসুক। কিন্তু তোমাদেরকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, যে বস্তুটির জন্যে তোমরা তাড়াহুড়া করছো, তা আমার হাতে নেই। এ সম্পর্কিত ফয়সালা সম্পূর্ণ খোদার হাতে। এটা যদি আমার ইখতিয়ারের বিষয় হতো, তাহলে কবে এর মীমাংসা হয়ে যেতো! গায়েবের খবর তো শুধু আল্লাহ তা'আলাই জানেন। কোন্ কাজের জন্যে কোন্ সময় উপযুক্ত, তা তিনিই ভালো বুঝেন। তিনি যখন ইচ্ছা তখন তোমাদের ওপর আযাব নাযিল করতে পারেন।' এ প্রসঙ্গে আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে নির্দেশ করা হলো ঃ 'যে সব লোক দ্বীনের ব্যাপারটিকে একটি খেল-তামাসা মনে করে নিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবনেই মোহগ্রস্ত হয়ে আছে, তাদেরকে নিজস্ব অবস্থার ওপরই ছেড়ে দাও। অবশ্য তাদেরকে যথারীতি কুরআন শুনাতে থাকো। এরপরও যদি তারা সত্যকে মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে তাদেরকে বলে দাও ঃ লোক সকল! তোমরা যা করতে চাও তা নিজের জায়গায় করতে

www.icsbook.info

থাকো আর আমিও আমার জায়গায় কাজ করতে থাকি। এর পরিণামে কে সঠিক পথে আছে, তা শীগ্‌গীরই তোমরা জানতে পারবে।'[৩০]

এই ধরনের কালামের এ একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। এ ছাড়াও এই পর্যায়ের ওহীতে এ ধরনটি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং প্রায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয় যে, এবার বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রত্যাসন্ন হয়ে উঠেছে।

৪. হিজরতের প্রস্তুতি

এতৎভিন্ন এ পর্যায়ের কালামে হিজরতের জন্যেও বারবার ইশারা আসতে লাগলো। এই সূরা আন্‌কাবুতেই নির্দেশ করা হলো ঃ 'হে আমার বান্দাহগণ! তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী করতে থাকো। আমার বন্দেগীর কারণে যদি স্বদেশের জমিন তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে সেজন্যে কোনো পরোয়া করো না। আমার জমিন অত্যন্ত প্রশস্ত; অর্থাৎ এজন্যে যদি ঘরবাড়িও ছেড়ে দিতে হয় তো দাও, কিন্তু আমার বন্দেগীর সম্পর্ক ছিন্ন করো না। কোনো জানদারের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো ভয় যা হতে পারে, তাহলো মৃত্যুভয়। নিশ্চয় জেনে রাখো, প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তারপর সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। কাজেই সেই মৃত্যু যদি আমার পথেই আসে, তাহলে আর চিন্তা কিসের? যে কেউ ঈমান ও সৎকর্মের পুঁজি নিয়ে আসবে, তাকে এমন আরামদায়ক বাগিচায় স্থান দেয়া হবে যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণধারা প্রবাহিত। সেখানে চিরকাল সে অবস্থান করবে। যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল, যারা কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্‌র দ্বীনের পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং যারা নিজেদের প্রতিটি ক্রিয়াকর্মে শুধু আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের ওপরই ভরসা রাখে, তাদের জন্যে এ কতো উত্তম বিনিময়!' এরপর বলা হলো যে, আল্লাহ্‌র পথে ঘর-বাড়ি ছাড়বার দ্বিতীয় ভয় হচ্ছে আর্থিক দুর্গতি। এ সম্পর্কে তাদের এই প্রত্যয়কে আরো মজবুত করা হলো যে, প্রকৃতপক্ষে রিযিক দেবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হাতে নিবদ্ধ। দুনিয়ায় বিচরণশীল কত প্রাণী রয়েছে; তাদের কেউই আপন রিযিক সঙ্গে নিয়ে বেড়ায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের রিযিক যুগিয়ে থাকেন। কাজেই রিযিকদাতা হিসাবে তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে তোমরা কেন নিরাশ হও এবং তিনি তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন না বলে কেন ভয় পাও? এছাড়া এ পর্যায়ের অপর সূরা বনী ইসরাঈলে হিজরতের জন্যে দো'আও শিক্ষাদান করা হলো। বলা হলো ঃ 'দো'আ প্রার্থনা করো ঃ 'প্রভু হে! আমায় উত্তম জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও, (মক্কা থেকে) ভালভাবে বের করে নাও এবং শত্রুর ওপর নিজের পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্য দান করো।' আর হে নবী! ঘোষণা করে দাও ঃ সত্য এসে পড়েছে, মিথ্যা অপসৃত হয়েছে। মিথ্যাকে অপসৃত হতেই হয়েছে।'

৩০. সূরা আন'আম ঃ ৬-৭ এবং ১৩৪-১৩৫ আয়াত অবলম্বনে।

www.icsbook.info

মোটকথা, এ পর্যায়ের কালামে এগুলো ছাড়াও এ ধরনের আরো বহুতর ইঙ্গিত রয়েছে। এতে একদিকে যেমন সেই প্রত্যাসন্ন বিপ্লবের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছিলো, অন্যদিকে তেমনি এরূপ পরিস্থিতির মুকাবিলায় যে প্রস্তুতির দরকার, তার প্রতিও বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছিলো। আখিরাতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করা, অন্তর থেকে পার্থিব সম্পদের বাসনা মুছে ফেলা, খালেস তওহীদ এবং তার দাবিগুলোকে মনের ভেতর বদ্ধমূল করে নেয়া, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো অবলম্বনকে মনের মধ্যে স্থান না দেয়া, কেবল তাঁরই সত্ত্বার ওপর পুরোপুরি ভরসা করা, তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশাবলীকে কিছুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি না করে যথারীতি পেশ করতে থাকা এবং এসব কাজের জন্যে প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনের নিমিত্ত নামায কায়েম করা ও তার প্রতি পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া ইত্যাকার উপায়-উপকরণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো। সেই সঙ্গে এই কঠিনতর পরিস্থিতিতেও দ্বীনের প্রচার অব্যাহত রাখার জন্যে তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছিলো।

www.icsbook.info

৭
হিজরত

হিজরত শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে পরিত্যাগ কিংবা পরিবর্জন। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় হিজরত বলতে বুঝায় ঃ দ্বীন-ইসলামের খাতিরে নিজের দেশ ছেড়ে এমন স্থানে গমন করা যেখানে দ্বীনের প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ হতে পারে। কারণ ইসলামী ধারায় জীবন যাপন করার এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানোর আজাদী যে দেশে নেই, সে দেশকে শুধু আয়-উপার্জন, ঘর-বাড়ি, ধন-সম্পত্তি কিংবা আত্মীয়-স্বজনের খাতিরে আঁকড়ে থাকা মুসলমানদের পক্ষে আদৌ জায়েয নয়।

প্রসঙ্গত একটি কথা জেনে রাখা দরকার যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের প্রতি ঈমান পোষণকারীর পক্ষে কোনো কুফরী রাষ্ট্র[৩১] ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করা কেবল দুটি অবস্থায়ই সঙ্গত হতে পারে। এক ঃ সংশ্লিষ্ট দেশে ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কুফরী ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করার জন্যে সে ক্রমাগত চেষ্টা-সাধনা করতে থাকবে—এ যাবত মক্কায় থেকে মুসলমানরা যেরূপ চেষ্টা-সাধনা করে আসছিলো এবং সে জন্যে সর্বপ্রকার দুঃখ-মুসিবত সহ্য করছিলো। দুই ঃ সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে তার বেরোবার কোনো পথ যদি সত্যই না থাকে কিংবা ইসলামী ধারায় জীবন যাপন ও ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত চেষ্টা-সাধনা করার উপযোগী কোনো জায়গা যদি সে খুঁজে না পায়।[৩২] কিন্তু দ্বীনের প্রয়োজন পূর্ণ হবার উপযোগী কোনো জায়গা যখনি পাওয়া যাবে—এবার মদীনা থেকে যেমন প্রত্যাশা করা গিয়েছিলো—তখন অবশ্যই তাদের হিজরত করে সেখানে চলে যেতে হবে। তবে এক্ষেত্রে যারা নিতান্তই অক্ষম ও পঙ্গু এবং যারা অসুস্থতা কিংবা দারিদ্র্যের কারণে কোনো প্রকারেই হিজরতের জন্যে সফর করতে সক্ষম নয়, কেবল তারাই ক্ষমা পাবার যোগ্য।

৩১. কুফরী রাষ্ট্র বলতে শুধু কাফির, মুশরিক ও নাস্তিকদের দ্বারা চালিত রাষ্ট্রকেই বুঝায় না, বরং আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার করে এবং মানবীয় প্রভুত্বের প্রতি আস্থা রাখে এমন যে কোনো রাষ্ট্রকেই কুফরী রাষ্ট্র বলা হয়। সে রাষ্ট্রের অধিবাসী শাসকবৃন্দ 'মুসলিম' নামে পরিচিত হলেও কার্যত তাতে কিছু যায় আসে না।—সম্পাদক

৩২. মনে রাখতে হবে যে, হিজরতের জন্যে কোনো দারুল ইসলাম বর্তমান থাকা অপরিহার্য নয়। মুসলমান প্রয়োজন হলে যেন কোন জঙ্গল বা পাহাড়ে গিয়ে অবাধে জীবন যাপন করতে পারে, তার পক্ষে কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আনুগত্য থেকে বাঁচবার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। কারণ মুসলমানদের দৃষ্টিতে যে কোনো জিনিসের চেয়ে তার দ্বীনের মর্যাদা রক্ষার গুরুত্ব বেশি।

www.icsbook.info

মদীনায় সাধারণ মুসলমানদের হিজরত

মদীনায় ইতোমধ্যেই ইসলাম বেশ কিছুটা প্রচারিত হয়েছিলো। এই অবস্থায় মক্কায় যে সব মুসলমান কাফিরদের হাতে উৎপীড়িত হচ্ছিলো, হযরত মুহাম্মদ (স) তাদেরকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। এটা টের পেয়েই কাফিররা মুসলমানদেরকে বিরত রাখার জন্যে জুলুমের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো এবং তারা যাতে মুঠো থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে, সেজন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু মুসলমানরা তাদের ধন-প্রাণ ও সন্তান-সন্ততির জীবন বিপন্ন করেও নিছক দ্বীনের খাতিরে দেশত্যাগ করাকেই পসন্দ করলো। কোনো প্রলোভন বা ভয়-ভীতিই তাদেরকে এই সংকল্প থেকে বিরত রাখতে পারলো না। ক্রমান্বয়ে বহু সাহাবী মদীনায় চলে গেলেন। এখন হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গে থেকে গেলেন শুধু হযরত আবুবকর (রা) এবং হযরত আলী (রা)। আর থাকলো দারিদ্র্য ও শারীরিক অক্ষমতা হেতু সফর করতে অসমর্থ এমন কিছু সংখ্যক মুসলমান।

হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করার সলা-পরামর্শ

এভাবে নবুয়্যাতের ত্রয়োদশ বছরের সূচনা পর্যন্ত বহু সাহাবী মদীনায় হিজরত করলেন। কুরাইশরা দেখতে পেলো, মুসলমানরা একে একে মদীনায় গিয়ে শক্তি সঞ্চয় করছে এবং সেখানে ইসলাম ক্রমশ প্রসার লাভ করছে। এর ফলে তারা অত্যন্ত শংকিত হয়ে উঠলো এবং ইসলামকে চিরতরে খতম করে ফেলার পন্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলো। সাধারণ জাতীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও সলা-পরামর্শ করার জন্যে 'দারুন্নদ্‌ওয়া' নামে তাদের একটি জায়গা নির্দিষ্ট ছিলো। সেখানে প্রত্যেক গোত্রের প্রধান ব্যক্তিগণ জমায়েত হলো এবং এই আন্দোলনেক পর্যুদস্ত করার জন্যে কি পন্থা অবলম্বন করা যায়, সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলো। কেউ কেউ পরামর্শ দিলো ঃ মুহাম্মদ (স)-কে শৃংখলিত করে কোনো ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখা উচিত। কিন্তু কেউ কেউ মত প্রকাশ করলো যে, মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গী-সাথীগণ হয়তো আমাদের কাছ থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে এবং তার ফলে আমাদের পরাজয়ও ঘটতে পারে; এজন্যে উক্ত পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করা হলো। কেউ কেউ আবার পরামর্শ দিলো যে, তাঁকে নির্বাসিত করা উচিত। কিন্তু মুহাম্মদ (স) যেখানে যাবেন সেখানেই তাঁর অনুগামী বাড়তে থাকবে এবং তাঁর আন্দোলনও যথারীতি সামনে অগ্রসর হবে; এ আশংকায় উক্ত পরামর্শও নাকচ করা হলো। অবশেষে আবু জেহেল পরামর্শ দিলো ঃ 'প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক মনোনীত করা হবে; এরা সবাই এক সঙ্গে মুহাম্মদ (স)-এর ওপর হামলা করবে এবং তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এর ফলে তাঁর রক্ত সকল গোত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে। আর সমস্ত গোত্রের সঙ্গে একাকী লড়াই করা হাশিমী খান্দানের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হবে না।' এ অভিমতটি সবাই পসন্দ

www.icsbook.info

করলো এবং শেষ পর্যন্ত এ কাজের জন্যে একটি রাতও নির্দিষ্ট করা হলো। সিদ্ধান্ত করা হলো যে, নির্দিষ্ট রাতে মনোনীত ব্যক্তিগণ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাসভবন ঘেরাও করে থাকবে। ভোরে তিনি যখন বাইরে বেরোবেন, তখন তারা আপন কর্তব্য সমাধা করবে। এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ এই যে, আরবরা রাতের বেলায় অন্য কারো ঘরে প্রবেশ করাকে পসন্দ করতো না।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কৃপায় দুশমনদের এইসব গোপন অভিসন্ধির কথা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে যথারীতি পৌঁছতে থাকে। অতঃপর সেই প্রতীক্ষিত সময়টি এলো, যখন তিনি মক্কা ছেড়ে মদীনায় গমন করার জন্যে ওহীযোগে নির্দেশ পেলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হিজরতের দুদিন আগে থেকেই তিনি আবুবকর সিদ্দীক (রা)-এর সঙ্গে এ সম্পর্কে পরামর্শ করেন এবং এই মর্মে সিদ্ধান্ত করেন যে, তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রা)ও গমন করবেন। সফরের জন্যে দুটি উষ্ট্রী ঠিক করা হলো এবং কিছু পাথেয়ও তৈরী করে নেয়া হলো।

মক্কা থেকে রওয়ানা

কাফির কুরাইশগণ হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করার জন্যে যে রাতটি নির্দিষ্ট করেছিলো, সেই রাতেই তিনি আলী (রা)-কে ডেকে বললেন ঃ 'আমি হিজরতের নির্দেশ পেয়েছি এবং আজ রাতেই মদীনা রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে বহু লোকের আমানত জমা রয়েছে। এগুলো তুমি প্রত্যুষে লোকদের কাছে প্রত্যর্পণ করে দিয়ো। আর আজ রাতে তুমি আমার বিছানায় থেকো, যেন আমি ঘরে আছি ভেবে লোকেরা নিশ্চিন্ত থাকে।'

কুরাইশরা ইসলাম বৈরিতার কারণে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রক্তের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো; কিন্তু এ অবস্থায়ও তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে এতোখানি আমানতদার ও বিশ্বাসভাজন বলে মনে করতো যে, তাদের নিজ নিজ আমানত ও মাল-মাত্তা এনে তাঁর কাছে জমা রাখতো।

নির্দিষ্ট রাতে কাফিররা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর গৃহ ঘেরাও করলো। রাত যখন গভীর হলো, হযরত মুহাম্মদ (স) নীরবে ও নিশ্চিন্তে ঘর থেকে বেরোলেন। সে সময় তিনি সূরা ইয়াসীনের একটি আয়াত[৩৩] পাঠ করছিলেন। তিনি এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে "শাহাতিল ওজুহ" (মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে যাক) কথাটি বলে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারলেন এবং তাদের ব্যূহ ভেদ করে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলেন। সে সময় আল্লাহ্‌র কুদরতে অবরোধকারীগণ যেন তন্দ্রাছন্ন হয়ে পড়েছিলো; ফলে তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে বেরিয়ে যেতেই দেখতে পেলো না। প্রথমে তিনি হযরত আবু বকর (রা)-এর

৩৩. ..... فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَايُبْصِرُوْنَ - (اية : ٩)

www.icsbook.info

গৃহে গমন করলেন এবং সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে মক্কার বাইরে গিয়ে 'সওর' পবর্ত গুহায় আশ্রয় নিলেন।

ভোর বেলা কাফিরগণ দেখতে পেলো, হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন। তারা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লো এবং তাঁর সন্ধানে চারদিকে ছুটাছুটি শুরু করলো। একবার তারা খুঁজতে খুঁজতে 'সওর' পর্বত গুহায় (হযরত মুহাম্মদ (স) ও সিদ্দীক (রা) যে গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন) মুখ পর্যন্ত পৌছলো। তাদের পদধ্বনি শুনে হযরত আবু বকর (রা) কিছুটা বিচলিতও হয়ে উঠলেন। তার কারণ, তাঁর নিজের জীবন সম্পর্কে কোন ভয় ছিলো না; বরং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর না জানি কোনো বিপদ এসে যায় এই ছিলো তাঁর আশংকা। তাঁর এই অস্থিরতা লক্ষ্য করে হযরত মুহাম্মদ (স) অত্যন্ত প্রশান্ত চিত্তে বললেন ঃ 'লা তাহ্‌যান ইন্নাল্লা-হা মাআনা'—'ঘাবড়িওনা, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।'

কার্যত তা-ই হলো। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে গুহামুখে এমন কতিপয় নিদর্শন ফুটে উঠলো[৩৪] যে, তা দেখে কাফিররা বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো। তাদের মনে ধারণা জন্মালো যে, এ গুহার ভিতরে কেউ প্রবেশ করেনি।

হযরত আবু বকর (রা)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ তখন বয়সে নবীন। তিনি রাতের বেলায় হযরত মুহাম্মদ (স) ও সিদ্দীক (রা)-এর কাছে থাকতেন এবং ভোরে মক্কায় এসে কাফিরদের সলা-পরামর্শ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে গুহায় ফিরে গিয়ে বুযর্গদ্বয়কে অবহিত করতেন। কয়েক রাত যাবত হযরত আবু বকর (রা)-এর গোলাম বকরীর দুধ নিয়ে যেতো, কখনো বা ঘর থেকে কিছু খাবার নিয়ে পৌছাতো। এভাবে তিন রাত পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (স) ও সিদ্দীক (রা) সেখানে অবস্থান করেন।

চতুর্থ দিন হযরত মুহাম্মদ (স) সওর পর্বত গুহা থেকে বেরোলেন এবং পুরো এক রাত একদিন তাঁরা সমানে পথ চললেন। সফরের জন্যে আবু বকর (রা) আগে থেকেই দুটি উষ্ট্রী ঠিক করে রেখেছিলেন। পথ বাতলানোর জন্যে একজন জানাশোনা লোকও নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো। পরদিন দুপুর বেলা রোদের তেজ প্রখর হয়ে উঠলে বিশ্রামের জন্যে একটি বৃহদাকার পাথরের ছায়ায় তাঁরা কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। অদূরেই একটি গোয়ালা ছিলো; তার বকরী থেকে হযরত মুহাম্মদ (স) দুধ পান করলেন। অতঃপর সেখান থেকে আবার তিনি যাত্রা শুরু করলেন। তিনি সামনে পা বাড়াতেই সোরাকা বিন জা'শিম নামক জনৈক কুরাইশ হঠাৎ তাঁকে দেখে ফেললো। এই লোকটি পুরস্কারের লোভে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সন্ধানে বেরিয়েছিলো। সে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে

৩৪. কথিত আছে যে, গুহা মুখে মাকড়সা জাল বুনেছিলো এবং কবুতর বাসা বেঁধেছিলো। এগুলো দেখে কাফিরদের মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, বহুদিন আগে থেকে এ গুহার মধ্যে কেউ প্রবেশ করনি।

www.icsbook.info

দেখতে পেয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। কিন্তু ঘোড়াটি হোচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। সে আবার নিজেকে সামলে নিলো এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর হামলা করার জন্যে তৈরি হলো। কিন্তু এবারও সামনে এগুতেই তার ঘোড়া হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে বসে গেলো। এবার সোরাকা শংকিত হয়ে উঠলো এবং বুঝতে পারলো ঃ ব্যাপারটা মোটেই সুবিধাজনক নয়। তার পক্ষে মুহাম্মদ (স)-এর ওপর হামলা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সে অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লো এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলো। হযরত মুহাম্মদ (স) থাকে ক্ষমা করে দিলেন। এও ছিলো হযরত মুহাম্মদ (স)-এর একটি মু'জিযা।

মদীনায় শুভাগমন

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমন-বার্তা পূর্বেই মদীনায় পৌঁছেছিলো এবং গোটা শহরই তাঁর শুভাগমনের জন্যে প্রতীক্ষমান ছিলো। ছোটো-বড়ো সবাই প্রতিদিন সকালে শহরের বাইরে গিয়ে জমায়েত হতো এবং দুপুর পর্যন্ত ইন্তেজার করে ফিরে আসতো। অবশেষে একদিন তাদের সেই প্রতীক্ষিত শুভ মুহূর্তটি এসেই পড়লো। দূর থেকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আসবার আলামত দেখে গোটা শহরটি তকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। প্রতিটি প্রতীক্ষাকারী হৃদয় উজাড় করে তাঁকে স্বাগত জানালো। মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে 'কুবা' নামক স্থানে আনসারদের অনেকগুলো খান্দান বসবাস করতো।[৩৫] এদের মধ্যে আমর ইবনে আওফের খান্দানটি ছিলো সবচেয়ে শীর্ষ স্থানীয়। কুলসুম বিন্ আল-হাদাম ছিলেন এদের প্রধান ব্যক্তি। এঁর পরম সৌভাগ্য যে, দো-জাহানের নেতা সবার আগে এঁরই আতিথ্য কবুল করেন এবং কুবায় এঁর গৃহেই অবস্থান করেন। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রওয়ানার তিনদিন পর হযরত আলী (রা) মক্কা থেকে যাত্রা করেছিলেন; তিনিও এখানে এসে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গে মিলিত হন।

কুবায় হযরত মুহাম্মদ (স) শুভাগমন করেন নবুয়্যাতের ত্রয়োদশ বছরের ৮ রবিউল আউয়াল (মুতাবেক ২০ সেপ্টেম্বর, ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ)। এখানে অবস্থানকালে তাঁর পয়লা কাজ ছিলো একটি মসজিদ নির্মাণ করা। তিনি তাঁর পবিত্র হস্ত দ্বারা এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং অন্য সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন। কয়েকদিন কুবায় অবস্থান করে তিনি শহরের (মদীনা) দিকে রওয়ানা করলেন। দিনটি ছিলো শুক্রবার। পথে বনী সালেমের মহল্লা পর্যন্ত পৌঁছলে জুহর নামাযের সময় হলো। এখানে তিনি সর্বপ্রথম জুম'আর খুতবা প্রদান করলেন এবং প্রথম বার জুম'আর নামায পড়ালেন।

---

৩৫. বর্তমানে কুবা মদীনার শহরতলীর অন্তর্ভুক্ত একটি মহল্লা। —সম্পাদক

www.icsbook.info

মদীনায় প্রবেশকালে প্রতিটি আত্মোৎসর্গী মুসলিমের হৃদয়েই তাঁর মেহমানদারীর সৌভাগ্য লাভের আকাংখা জাগলো। তাই প্রত্যেক গোত্রের লোকই তাঁর সামনে এসে আবেদন জানাতে লাগলো ঃ 'হুযুর, এই হচ্ছে আপনার ঘর, অনুগ্রহপূর্বক এখানে আপনি অবস্থান করুন।' লোকদের মধ্যে এতোখানি আগ্রহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হলো যে, প্রতিটি হৃদয়ই যেনো পথের ফরাশে পরিণত হলো; প্রতিটি জীবনই উৎসর্গীকৃত হবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো। এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত গৃহের ছাদে উঠে গাইতে লাগলো ঃ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا
مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا
مَا دَعَى لِلّٰهِ دَاعِ

চন্দ্র উদিত হয়েছে,
বিদা' পর্বতের ঘাঁটি থেকে,
খোদার শোকর আদায় আমাদের কর্তব্য,
যতক্ষণ প্রার্থনাকারীরা প্রার্থনা করে।

কিশোরী বালিকারা 'দফ' বাজিয়ে বাজিয়ে গাইতে লাগলো ঃ

نَحْنُ جَوَارٍ مِّنْ بَنِىْ النَّجَّارِ
يَا حَبَّذَا مُحَمَّدًا مِّنْ جَارِ

আমরা নাজ্জার খান্দানের বালিকা
(আর) মুহম্মাদ (স) আমাদের কতো উত্তম পড়োশী!

হযরত মুহাম্মদ (স) বালিকাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন 'তোমরা কি আমায় ভালবাসো?' তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ 'আমিও তোমাদের ভালবাসি।'

মদীনায় অবস্থান

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মেহমানদারীর সৌভাগ্য কে লাভ করবে? এ এমন একটি প্রশ্ন যে, এর মীমাংসা মোটেই সহজসাধ্য ছিলো না। হযরত বললেন যে, 'আমার উষ্ট্রী যার গৃহের সামনে দাঁড়াবে, এ খেদমত সে-ই আঞ্জাম দিবে।' ঘটনাক্রমে এ সৌভাগ্যটুকু হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)-এর ভাগ্যে পড়লো। বর্তমানে যেখানে মসজিদে

www.icsbook.info

নববী অবস্থিত, তার নিকটেই ছিল তাঁর গৃহ। গৃহটি ছিলো দ্বিতল বিশিষ্ট। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর থাকবার জন্যে ওপরের তলাটি পেশ করেন। কিন্তু লোকদের আসা-যাওয়ার সুবিধার্থে হযরত মুহাম্মদ (স) নীচের তলায় থাকাই পসন্দ করলেন। হযরত আবু আইয়ুব এবং তাঁর স্ত্রী নীচতলা ছেড়ে ওপর তলায় চলে গেলেন।

এখানে হযরত মুহাম্মদ (স) সাত মাসকাল অবস্থান করলেন। এরপর তাঁর বসবাসের জন্যে মসজিদে নববীর নিকটে একটি কোঠা নির্মিত হলো এবং সেখানেই তিনি স্থানান্তরিত হলেন। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর খান্দানের অন্যান্য লোকও মদীনায় চলে এলো।

মসজিদে নববীর নির্মাণ

মদীনায় আগমনের পর সবচেয়ে প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলো একটি মসজিদ নির্মাণ করা। হযরত মুহাম্মদ (স) যেখানে অবস্থান করছিলেন, তার নিকটেই দুই ইয়াতীমের কিছু অনাবাদী জমি ছিলো। নগদ মূল্যে এই জমিটি তাদের কাছ থেকে খরিদ করা হলো। তারই ওপর মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হলো। এবারও হযরত মুহাম্মদ (স) সাধারণ মজুরের ন্যায় সবার সাথে মিলে কাজ করলেন। স্বহস্তে তিনি ইট-পাথর বয়ে আনলেন। মসজিদটি অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে নির্মিত হলো। কাঁচা ইটের দেয়াল, খেজুর গাছের খুটি এবং খেজুর পাতার ছাদ—এই ছিলো এর উপকরণ। মসজিদের কিবলা হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে। কেননা, তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের কিবলা ছিলো ঐ দিকে। অতঃপর কিবলা কা'বামুখী হলে তদনুযায়ী মসজিদের সংস্কার করে নেয়া হলো। মসজিদের মেঝেও ছিলো কাঁচা। বৃষ্টিপাত হলে মসজিদের ভেতর কাদা জমে যেতো। তাই কিছুদিন পর পাথর বিছিয়ে মেঝে পাকা করে নেয়া হলো। মসজিদের এক পাশে একটি উঁচু চত্বর নির্মিত হলো। এর নাম রাখা হলো 'সুফ্‌ফা'। যে সব নও-মুসলিমের কোনো বাড়ি-ঘর ছিলো না, এটি ছিলো তাদের থাকবার জায়গা।

মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে তার নিকটেই হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর স্ত্রীদের জন্যে কয়েকটি কোঠা তৈরী করে নিলেন। এগুলো কাঁচা ইট এবং খেজুর গাছ দ্বারা নির্মিত হলো। এই ঘরগুলো ছয়-সাত হাত করে চওড়া এবং দশ হাত করে লম্বা ছিলো। এর ছাদ এতোটা উঁচু ছিলো যে, একজন লোক দাঁড়ালে তা স্পর্শ করতে পারতো। দরজায় ঝুলানো ছিলো কম্বলের পর্দা।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর গৃহের নিকটে যে সব আনসার বাস করতো, তাদের ভেতরকার স্বচ্ছল লোকেরা তাঁর খেদমতে কখনো তরকারি, কখনো-বা অন্য কিছু পাঠাতো। এর দ্বারাই তাঁর দিন গুজরান হতো; অর্থাৎ সংকটের ভেতর দিয়েই তাঁর জীবন-যাত্রা নির্বাহ হতো।

www.icsbook.info

ভাই ভাই সম্বন্ধ

মক্কা থেকে যে সব মুসলমান ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে মদীনায় চলে এসেছিলো, তাদের প্রায় সবাই ছিলো সহায় সম্বলহীন। তাদের মধ্যে যারা স্বচ্ছল ছিলো, তারাও নিজেদের মালপত্র মক্কা থেকে আনতে পারেনি। তাদের সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে একদম রিক্ত হস্তেই আসতে হয়েছিলো। এই সব মুহাজির যদিও মদীনার মুসলমানদের (আনসার) মেহমান ছিলো, তথাপি এদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিলো। তাছাড়া এরা নিজেরাও স্বহস্তে পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে ভালোবাসতো। তাই মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে একদিন হযরত মুহাম্মদ (স) আনসারদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এবং মুহাজিরদের ভেতর থেকে এক ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, 'আজ থেকে তোমরা পরস্পর ভাই।' এভাবে সমস্ত মুহাজিরকে তিনি আনসারদের ভাই বানিয়ে দিলেন। তার ফলে আল্লাহ্‌র এই খাঁটি বান্দাহগণ শুধু ভাই-ই নয়, পরস্পরে ভাইয়ের চেয়েও ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হলো। আনসারগণ মুহাজিরদেরকে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে গেলো এবং তাদের সামনে নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি ও সামানপত্রের হিসাব পেশ করে বললো ঃ 'এর অর্ধেক তোমাদের আর অর্ধেক আমাদের।' এভাবে বাগানের ফল, ক্ষেত্রের ফসল, ঘরের সামান, বাসগৃহ, সম্পত্তি—মোটকথা প্রতিটি জিনিসই সহোদর ভাইদের মতো বিভক্ত হলো।[৩৬] ফলে আশ্রয়হীন মুহাজিরগণ সব দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো। তারা যথারীতি ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করলো, দোকান-পাট খুললো এবং অন্যান্য কাজেও লিপ্ত হলো। এভাবে মুহাজির পুনর্বাসনের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলো এবং এদিক দিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত হলো।

---

৩৬. ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, কোনো কোন আনসার তার মুহাজির ভাইর নিঃসঙ্গতা ঘুচাবার জন্যে নিজের একাধিক স্ত্রীর ভেতর থেকে একজনকে দান করতে পর্যন্ত প্রস্তুত হয়েছিলো। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক রচিত হলে তা কতো নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হতে পারে, এ ছিলো তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।—সম্পাদক।

www.icsbook.info

৮
নবপর্যায়ে ইসলামী আন্দোলন

হিজরতের আগে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হচ্ছিলো মক্কার মুশরিকদের কাছে। তাদের কাছে এটা ছিলো একটি অভিনব জিনিস। কিন্তু হিজরতের পর সমস্যা দেখা দিলো মদীনার ইহুদীদের নিয়ে। এরা তওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, ফেরেশতা, ওহী ইত্যাদি বিশ্বাস করতো এবং একজন পয়গম্বরের (হযরত মূসার) উম্মত হিসেবে খোদার তরফ থেকে আগত একটি শরীয়তের অনুগামী হবারও দাবিদার ছিলো। নীতিগতভাবে হযরত মুহাম্মদ (স) যে দ্বীন-ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তাদেরও প্রকৃত দ্বীন ছিলো তা-ই। কিন্তু শতাব্দী কালের অনাচার ও বেপরোয়া আচরণের ফলে তাদের ভেতর নানা রকমের দোষ-ত্রুটি দেখা দিয়েছিলো। তাদের জীবন প্রকৃত খোদায়ী শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো এবং তাদের ভেতর অসংখ্য প্রকার কুসংস্কার, বিদ'আত ও কুপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো। তাদের কাছে তওরাত কিতাব ছিলো বটে, কিন্তু তার মধ্যে তারা বহু মানবীয় কালাম শামিল করে নিয়েছিলো। তবুও তার ভেতর খোদায়ী বিধি-বিধান যা কিছু বাকী ছিলো, তাও মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ছাঁচে ফেলে তারা ওলট-পালট করে দিয়েছিলো। এভাবে খোদার দ্বীনের সাথে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। সামাজিক দিক দিয়ে তাদের ভেতর মারাত্মক সব দোষ-ত্রুটি শিকড় গেড়ে বসেছিলো। আল্লাহ্‌র কোনো বান্দাহ যদি তাদেরকে সঠিক পথ দেখাতে চাইতো, তার কোনো কথা পর্যন্ত তারা শুনতে প্রস্তুত ছিলো না, বরং তাঁকে তারা ঘোরতর দুশমন বলে মনে করতো এবং তাঁর কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাত। যদিও তারা মীলতগভাবে 'মুসলিমই' ছিলো, তবু তাদের এতোখানি পতন ঘটেছিলো যে, তাদের আসল দ্বীন কি ছিলো, তা তাদের নিজেদেরই স্মরণ ছিলো না।

এদিক দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের সামনে শুধু দ্বীন-ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচারের কাজই ছিলো না, বরং ঐসব 'বিভ্রান্ত মুসলমানের' ভেতর পুনরায় দ্বীনী ভাবাদর্শ জাগ্রত করার দায়িত্বও বর্তমান ছিলো। তাছাড়া হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনের পর মুসলমানরা ক্রমান্বয়ে চারদিক থেকে এসে মদীনায় জমায়েত হচ্ছিলো এবং এই সব মুহাজির ও মদীনার আনসারগণ মিলে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির ইসলামী রাষ্ট্রেরও ভিত্তি পত্তন করেছিলো।[৩৭] এ কারণে আন্দোলনকে এ যাবত শুধু আদর্শ প্রচার,

৩৭. মদীনায় আসার পর রাসূলে করীম (স) সর্বপ্রথম আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে এক অটুট ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন করলেন। এরপর তিনি মদীনায় বসবাসকারী মুসলিম, ইহুদী ও খৃষ্টান এই তিন জাতির মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সম্প্রীতি ও একাত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করে একটি মহাজাতি গঠনের উদ্দেশ্যে এদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে রচনা করলেন

www.icsbook.info

আকীদা-বিশ্বাসের সংস্কার এবং কিছু নৈতিক শিক্ষা সংক্রান্ত নির্দেশ প্রদান করতে হলেও, এখন সামাজিক জীবনধারার সংস্কার, প্রশাসনিক আইন-কানুন প্রণয়ন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থা জারির প্রয়োজন দেখা দিলো। সুতরাং এবার এদিকে পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া হলো।

এ সময় আরো একটি বিরাট পরিবর্তন সাধিত হলো। এই পর্যন্ত কুফরী পরিবেশেই ইসলামী দাওয়াত পেশ করা হচ্ছিলো এবং এরই ভেতর থেকে মুসলমানরা কাফিরদের জুলম-পীড়ন বরদাশত করছিলো। কিন্তু এবার তারা ক্ষুদ্রাকৃতির হলেও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করলো যা চারদিকে দিয়েই ছিলো কাফিরদের দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাই ব্যাপারটি এখন আর শুধু উৎপীড়ন আর হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না, বরং গোটা আরব উপদ্বীপই এবার সংকল্প গ্রহণ করলো যে, এই নগণ্য দলটিকে যতো শীঘ্র

একটি মহাসনদ। তিন জাতির নেতৃবৃন্দের যৌথভাবে স্বাক্ষরিত এই আন্তর্জাতিক সনদটিই ঐতিহাসিক 'মদীনা সনদ' নামে খ্যাত এবং এটিই দুনিয়ার প্রথম লিখিত সংবিধান। এর মাধ্যমেই জন্ম নিলো মদীনার ক্ষুদ্রাকার ইসলামী রাষ্ট্র। পরম দয়াময় ও মেহেরবান আল্লাহ্‌র নামে সম্পাদিত এই সনদের পূর্ণ বিবরণ সুরক্ষিত রয়েছে ইবনে হিশামের পৃষ্ঠায়। এতে মদীনায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির লোকদের যে অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়, তার সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

'রাসূল মুহাম্মদ কর্তৃক প্রদত্ত বিশ্ববাসীর জন্যে—হোক তারা কুরাইশ অথবা মদীনার অধিবাসী এবং—যে কোন জন্ম-গোত্রের সকল মানুষের জন্যে যাদের মধ্যে রয়েছে অভিন্ন স্বার্থ, তারা সকলেই গঠন করেছে এক মহাজাতি।'

'শান্তিও যুদ্ধের অবস্থা হবে সকল মুসলমানের জন্যে অভিন্ন; তাদের মধ্যে এককভাবে কারো অধিকার থাকবে না তার স্বধর্মী শত্রুর সঙ্গে শান্তিপত্র সম্পন্ন করতে অথবা সে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে।'

'যে সব ইহুদী আমাদের সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত, তারা রক্ষিত হবে সকল প্রকার অপমান ও উপদ্রব থেকে, আমাদের সাহায্য ও কর্তব্যের ওপর আমাদের লোকের সঙ্গে তাদেরও থাকবে সমান অধিকার।'

'মদীনায় বসতি স্থাপনকারী অন্য সকলেই মুসলমানদের সঙ্গে গঠন করবে একটি মহাজাতি। মুসলমানদের মতোই তারা মুক্তভাবে পালন করবে নিজ নিজ ধর্ম। ইহুদীদের আশ্রিত ও মিত্রগণ ভোগ করবে একই রকম নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা। অপরাধীগণকে সন্ধান করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে। সকল শত্রুর বিরুদ্ধে মদীনার প্রতিরক্ষায় ইহুদীরা মুসলমানদের সঙ্গে যোগদান করবে।'

'যারা এই সনদ গ্রহণ করবে, তাদের সবার জন্যে মদীনার অভ্যন্তর হবে একটি পবিত্র স্থান। সকল মুসলমানই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত প্রতিটি লোককে, অবিচারকে অথবা বিশৃংখলাকে করবে তীব্র ঘৃণা। কেউ সমর্থন করবে না নিন্দনীয় ব্যক্তিকে যদিও সে হয় তার নিকটতম আত্মীয়।'

'এই সনদ যারা গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যকার সকল ভবিষ্যত বিবাদ মীমাংসার জন্যে প্রেরিত হবে আল্লাহ্‌র অধীন রাসূলের কাছে।'—সম্পাদক

www.icsbook.info

সম্ভব খতম করে দিতে হবে: নচেত ইসলামের এই কেন্দ্রটি শক্তি অর্জন করতে শুরু করলে তাদের জন্যে দাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত থাকবে না। তাই নিজেদের এবং আন্দোলনের নিরাপত্তার তাগিদে এই নয়া ইসলামী দলের সামনে জরুরী কর্তব্য হয়ে দেখা দিলো ঃ

১. পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে নিজেদের আদর্শ প্রচার করা, দলীল-প্রমাণ দ্বারা তার সত্যতা প্রতিপন্ন করা এবং যতো বেশি সম্ভব লোকদেরকে এর সমর্থক বানানোর চেষ্টা করা;

২. বিরুদ্ধবাদীগণ যে সব আকীদা-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছিলো, যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে তার অসারতা প্রমাণ করা, যেনো বিবেকের আলোয় কেউ কিছু বুঝতে চাইলে প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌঁছতে তাকে কোনো বেগ পেতে না হয়;

৩. ঘরবাড়ি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নষ্ট করে যারা এই নতুন রাষ্ট্রে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদের জন্যে শুধু বসবাসের ব্যবস্থাই নয়, বরং তাদেরকে উন্নত মানের নৈতিক ও ঈমানী শিক্ষা দান করা, যেনো চরম দুঃখ-দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তার মধ্যেও তারা পূর্ণ ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারে এবং কোনো কঠিনতর অবস্থায়ও তাদের পা কেঁপে না ওঠে;

৪. মুসলমানদেরকে চরম প্রতিকূল অবস্থার মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত করা, যাতে করে তাদের নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে বিরুদ্ধবাদীগণ কোনো সশস্ত্র হামলা চালালে নিজেদের দুর্বলতা ও অস্ত্রপাতির দৈন্য সত্ত্বেও তারা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে শত্রুর মুকাবিলা করতে পারে এবং আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সত্যতা সম্পর্কে গভীরতর প্রত্যয় ও খোদার প্রতি ঐকান্তিক নির্ভরতার কারণে ময়দান থেকে কখনো পশ্চাদপসারণ না করে;

৫. যে সব লোক নানাভাবে বুঝানো সত্ত্বেও ইসলামের কাঙ্ক্ষিত জীবন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠার পথে বাদ সাধবে, তাদেরকে প্রয়োজন হলে শক্তি প্রয়োগ করে ময়দান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে আন্দোলনের অনুবর্তীদের মধ্যে পূর্ণ হিম্মত ও সৎসাহস পয়দা করা।

ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি

মদীনার প্রায় চারদিকেই ইহুদীদের বসতি ছিলো।[৩৮] এদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণেরও প্রয়োজন

৩৮.প্রসঙ্গত তৎকালীন আরব উপদ্বীপে বসবাসরত ইহুদী জনগোষ্ঠীর ওপর কিছুটা বিস্তৃত আলোকপাত করা দরকার। ইতিহাস থেকে জানা যায়, নববী যুগের সূচনা-পর্বে আরবের প্রায় সর্বত্রই কম-বেশি ইহুদী বসতি ছিলো। কোথাও কোথাও তারা ঘন বসতি আকারে বাস করতো, আবার কোথাও কোথাও তাদের দু-একটি বিচ্ছিন্ন ও পরিবার দেখা যেতো। বিশেষত ঈলা (আকাবা) মাকনা, খাইবার, আল-কুরা, ইয়াতামা, ফিদাক, মদীনা (ইয়াসরিব) তায়েফ ও জারাশ থেকে শুরু করে ইয়েমেন ওমান ও বাহরাইন পর্যন্ত বিস্তৃত

www.icsbook.info

ছিলো। কারণ মুসলমানদের মক্কা ত্যাগের কথা জানতে পেরে কাফির কুরাইশগণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেনি, বরং মুসলমানদের একটি সংঘবদ্ধ দলকে মদীনায় একত্রিত হতে দেখেই তারা ইসলামের এই নয়া কেন্দ্রকে আপন শক্তি ও প্রভাবে মিটিয়ে দেবার পন্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছিলো। এ কারণেই মদীনার চার দিককার ইহুদী বাসিন্দাদের সাথে একটা স্পষ্টতর রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিলো, যেনো মক্কার মুশরিকগণ কোনো হামলা চালালে ইহুদীদের ভূমিকাটা অনুমান করা যেতে পারে। তাই মদীনা ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্রগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। এদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (স) নিরপেক্ষতার চুক্তি সম্পাদন করলেন। অর্থাৎ কুরাইশ বা অন্য কেউ যদি মদীনার মুসলমানদের ওপর হামলা করে, তাহলে এরা না মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করবে আর না তাদের শত্রুপক্ষকে সমর্থন করবে; আর কারো সঙ্গে এই মর্মে চুক্তি করা হলো যে, যদি মুসলমানদের ওপর কেউ হামলা করে, তাহলে তারা মুসলমানদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহয্য করবে।

আরব উপদ্বীপের উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ইহুদী বসতির এক সুদীর্ঘ শিকল গড়ে উঠেছিলো। মক্কা ও তার সন্নিহিত এলাকায় ইহুদী বসতি ছিলো খুবই কম। তবে মক্কার আশপাশে (যেমন ওকাজ, মিনা, জুল মিজাজ ইত্যাদি স্থানে) যেসব মেলা বসতো, সেখানে তারা অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে নানারূপ কৌশলের আশ্রয় নিত। ভবিষ্যদ্বক্তা, ভাগ্য গণনাকারী ইত্যাদির ভেক ধারণ করা ছাড়াও তারা সাধারণ মানুষের জন্যে নানাবিধ খেল-তামাসার আয়োজন করতো। তাছাড়া অশিক্ষিত বেদুঈনদের কাছে তারা শিক্ষিত (কিতাবধারী) জনগোষ্ঠী হিসেবে খুব সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলো।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এটা সর্বজনবিদিত যে, নববী যুগের অব্যবহিত পূর্বে কিতাবধারী জনগোষ্ঠীসমূহ এক মহামানব এবং এক সর্বশেষ ত্রাণকর্তার জন্যে অপেক্ষমান ছিলো। কিন্তু এই ব্যাপারে কয়েকটি অদ্ভুত, জটিল ও সাংঘর্ষিক তথ্য অবলোকন করে নবী চরিতের কৌতূহলী শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত হতবাক হয়ে যেতে হয়। নবুয়্যাতের আগে মদীনার ইহুদীরা প্রতিবেশী আরবদের এই বলে শাসাতো যে, 'প্রতিশ্রুত নবীর আগমন মুহূর্ত সমাসন্ন। আমরা তাঁর সহযোগী হয়ে শত্রুদের মস্তক চূর্ণ করে দেবো।' অথচ ইতিহাসে এমন ঘটনাও প্রচুর দেখা যায়, যাতে প্রতিশ্রুত নবীকে হত্যা করার ব্যাপারে ইহুদীদেরই বেশি উদ্যোগী মনে হয়।

একদা শিশু নবীকে কোলে নিয়ে তাঁর ধাত্রী মা হালীমা এক মেলায় যাচ্ছিলেন। এক ইহুদী গণক তাঁকে দেখামাত্র চীৎকার জুড়ে দিলো ঃ 'ওহে ইহুদীরা! তোমরা শীঘ্র ছুটে এস এবং এই শিশুটিকে মেরে ফেল। এ শিশু তোমাদের উৎখাত করে ছাড়বে।' অনুরূপভাবে কিশোর বয়সে নবীজী একবার তাঁর চাচার সাথে বাণিজ্যিক কাফেলায় শামিল হয়ে ফিলিস্তিন যাচ্ছিলেন। সেখানে এক খ্রিস্টান ধর্মবেত্তা তাঁর চাচাকে পরামর্শ দিলেন, 'সামনে আর অগ্রসর হয়োনা। ইহুদীরা এই শিশুর ঘোরতর শত্রু। এঁকে দেখতে পেলে এবং চিনতে পারলে প্রাণে মেরে ফেলবে। (রাসূল আকরাম (স) কী সিয়াসী জিন্দেগী, অধ্যাপক মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ্)—সম্পাদক

www.icsbook.info

মুনাফিক

এসময় মদীনায় ইসলামী আন্দোলনকে কতকগুলো নতুন সমস্যার মুকাবিলা করতে হলো। এর মধ্যে মুনাফিকদের সমস্যাটি ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মক্কায় শেষ পর্যায়ে এমন কিছু লোক ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো, যারা ইসলামী দাওয়াতকে সম্পূর্ণ সত্য বলে জানতো বটে, কিন্তু ঈমানের দুর্বলতাবশত ইসলামের খাতিরে পার্থিব স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলো না। চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মীয়তা ইত্যাদি প্রায়শ ইসলামের দাবি পূরণের পথে তাদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু মদীনায় আসার পর এমন কিছু লোকও ইসলামী সংগঠনে অনুপ্রবেশ করলো, যারা আদতেই ইসলামে বিশ্বাসী ছিলো না। এরা নিছক ফিত্‌না সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ইসলামী সংগঠনে শামিল হয়েছিলো। আবার কিছু লোক অক্ষমতা হেতু নিজেদেরকে মুসলমান বলে জাহির করতো। এদের হৃদয় যদিও ইসলাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলো না, কিন্তু নিজ গোত্র বা খান্দানের বহু লোক মুসলমান হবার ফলে এরাও বাধ্য হয়ে মুসলমানদের দলে শামিল হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আরো কিছু সুযোগ-সন্ধানী লোকও ইসলামী সংগঠনে ঢুকে পড়েছিলো। এরা একদিকে মুসলমানদের সঙ্গী হয়ে পার্থিব ফায়দা হাসিলের চিন্তা করতো, অন্যদিকে কাফিরদের সাথেও নিয়মিত যোগাযোগ রাখতো। এদের চেষ্টা ছিলো ইসলাম ও কুফরের সংঘর্ষে যদি ইসলাম বিজয়ী হয়, তাহলে এরা যেনো ইসলামের মধ্যে আশ্রয় পেতে পারে আর যদি কুফর জয়লাভ করে, তবুও যেনো এদের স্বার্থ নিরাপদ থাকে।

ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে এই মিত্রবেশী শত্রুরাই ছিলো সবচেয়ে বেশি অসুবিধার কারণ। এদের সঙ্গে কাজ-কারবার করা মোটেই সহজতর ছিলো না। মদীনার গোটা জীবনে এই শ্রেণীর লোকদের সৃষ্ট ফিত্‌নার কিভাবে মুকাবিলা করা হয়, যথাস্থানে তা আলোচিত হবে। এখানে শুধু ঐ শ্রেণীর মুনাফিক আর সাচ্চা মুমিনদের (যারা বুঝে-শুনে ইসলামের পথে পা বাড়িয়েছে) তুলনামূলক পরিচয়টা জেনে রাখারই প্রয়োজন বেশি। কারণ এই সময় ইসলামী আন্দোলনকে এক সংকটজনক পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হয় এবং এ কারণেই যেসব লোক পুরানো বিদ্বেষ এবং ইসলাম-বিমুখ চিন্তাধারা আঁকড়ে ধরে ছিলো অথবা যাদের ঈমান কোনো দিক দিয়ে দুর্বল ছিলো, আন্দোলন থেকে তাদের সরে পড়বার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিলো।

কিবলা পরিবর্তন

এ যাবত ইসলামের কিবলা ছিলো বায়তুল মুকাদ্দাস। এদ্দিন ঐদিকে মুখ করেই মুসলমানরা নামায পড়তো। বায়তুল মুকাদ্দাসের সাথে ইহুদীদের সম্পর্ক ছিলো খুব ঘনিষ্ঠতর। এরাও ঐদিকে মুখ করে উপাসনা করতো। দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে একদিন ঠিক নামাযের মধ্যে কিবলা পরিবর্তন করার নির্দেশ এলো এবং তখন থেকে

www.icsbook.info

বায়তুল মুকাদ্দাসের বদলে কা'বাকে মুসলমানদের কিবলা বলে ঘোষণা করা হলো। তাই হযরত মুহাম্মদ (স) নামাযের মধ্যেই তাঁর মুখ বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কা'বার দিকে ঘুরিয়ে নিলেন। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। খোদ আল্লাহ তা'আলা এর গুরুত্ব নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ -

আমরা কা'বাকে তোমাদের কিবলা নির্ধারণ করে দিয়েছি। এর কারণ হচ্ছে, কে পয়গাম্বরের অনুবর্তী আর কে পশ্চাদপসরণকারী, তা যাচাই করে নেয়া।

(সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)

এর দ্বারা এ সত্য ঘোষিত হলো যে, এ যাবত দুনিয়ার নৈতিক এবং ঈমানী নেতৃত্বের যে দায়িত্ব ইহুদীদের ওপর ন্যস্ত ছিলো, তা থেকে তাদেরকে অপসারণ করা হয়েছে। কারণ তারা এ দায়িত্ব পালন করেনি এবং এ নিয়ামতটির কদরও বুঝতে পারেনি। তাই তাদের বদলে এ খেদমতের দায়িত্ব এখন উম্মতে মুসলিমার ওপর ন্যস্ত করা হলো। তারা এই কর্তব্য পালন করে যাবে।

এই ঘটনার প্রভাবে বহু কপট মুসলমানেরই—যাদের হৃদয়ে ঈমানের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি—মুখোশ খসে পড়লো। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই কার্যের তীব্র সমালোচনা করলো। এর ফলে ইসলামী আন্দোলনে এই সব লোকের ভূমিকা কি,তাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। এভাবে বহু 'দো-দিল বান্দাহ' ইসলামী সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং এই শ্রেণীর মিত্ররূপী শত্রুদের দুষ্ট প্রভাব থেকে আন্দোলনও বহুলাংশে মুক্ত হলো।

www.icsbook.info

৯
ইসলামী আন্দোলনের প্রতিরক্ষা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কার অদূরবর্তী আকাবা নামক স্থানে মদীনার কিছু লোক হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলো। তারা হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের মদীনায় চলে আসবার জন্যে তাঁর খেদমতে একটি প্রস্তাবও পেশ করেছিলো। তখনই এ আশংকা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিলো যে, এই শপথ ও প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে তামাম আরব উপদ্বীপের প্রতি মদীনাবাসীদের একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এ ব্যাপারে শপথ গ্রহণকারীদের অন্যতম পুরোধা হযরত আব্বাস বিন উবাদাহ (রা) তাঁর সাথীদের উদ্দেশ করে যা বলেছিলেন, আজো তা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে ঃ 'তোমরা কি জানো, এই ব্যক্তির কাছে তোমরা কি জিনিসের শপথ গ্রহণ করছো? তোমরা এঁর কাছে শপথ গ্রহণ করে প্রকৃতপক্ষে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করছো।[৩৯] সুতরাং তোমরা যদি ধারণা করে থাকো যে, তোমাদের জান-মাল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিপন্ন হয়ে পড়লে এঁকে দুশমনদের হাতে সোপর্দ করে দিবে, তাহলে আজই এঁকে পরিত্যাগ করা তোমাদের পক্ষে উত্তম। কেননা খোদার কসম, দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ের পক্ষেই এটা চরম অবমাননাকর। পক্ষান্তরে তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এ-ই হয় যে, তোমাদের জান-মাল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিপন্ন হলেও তোমরা তাঁকে রক্ষা করবে, তাহলে নিঃসন্দেহে এঁর হাত তোমরা আঁকড়ে ধরো। খোদার কসম, এটা দুনিয়া এবং আখিরাত উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর।' এ সময় গোটা প্রতিনিধিদলই সম্মিলিতভাবে বলেছিলো ঃ 'আমরা এঁকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের জান-মাল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতেও প্রস্তুতি আছি।' এবার মদীনাবাসীদের সেই প্রতিশ্রুতিরই সত্যতা যাচাইয়ের সময় এলো।

কুরাইশদের বিপদ

মদীনায় মুসলমান এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর স্থানান্তরিত হবার অর্থ ছিলো এই যে, এবার ইসলাম অন্তত দাঁড়াবার মতো একটি জায়গা পেলো এবং মুসলমানরাও বারবার ধৈর্যের পরীক্ষা দেবার পরিবর্তে একটি সুসংহত সমাজ সংগঠনে পরিণত হলো। কুরাইশদের পক্ষে এ ছিলো একটি কঠিন বিপদের ইঙ্গিত। তারা স্পষ্টভাবে দেখতে

৩৯. এখানে এরূপ সন্দেহ করা সমীচীন নয় যে, ইসলাম শুধু প্রতিরক্ষার জন্যেই যুদ্ধ করে থাকে, বরং দ্বীন-ইসলামের যখন প্রয়োজন হয়, তখন সত্যকে অগ্রসর হয়েই মিথ্যার জারি-জুরি ভেঙে দিতে হয়। ইসলামী আন্দোলনকে এ ধরনের যে সব যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল, তার পর্যালোচনা সামনে আসবে।

www.icsbook.info

পেলো, এভাবে ইসলামী সংগঠনের শক্তি সঞ্চয় প্রকৃতপক্ষে তাদের জাহিলী ব্যবস্থারই মৃত্যু ঘটার শামিল। এছাড়া আরো একটি কঠিন আশংকা তাদেরকে অস্থির করে তুলেছিলো। তাহলো এই যে, মক্কাবাসীদের জীবিকার একটি বড়ো উপায় ছিলো ইয়েমেন ও সিরিয়ায় বাণিজ্য। আর লোহিত সাগরের তীর দিয়ে সিরিয়া পর্যন্ত যে ব্যাণিজ্য-পথ ছিলো, মদীনা ঠিক তারই ওপর অবস্থিত। সুতরাং মদীনায় মুসলমানদের শক্তি অর্জনের অর্থ ছিলো ঃ মুসলমানদের সঙ্গে সুষ্ঠু সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে কুরাইশদেরকে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করতে হবে। নতুবা মুসলিম শক্তিকে চিরতরে খতম করে দিয়ে ঐ পথে তাদের ব্যবসায়ের পণ্য চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ কারণেই হিজরতের আগে মুসলমানরা যাতে মদীনায় গিয়ে জমায়েত হতে না পারে, সেজন্যে কুরাইশরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় তারা এই ক্রমবর্ধমান বিপদকে যেভাবেই হোক, চিরতরে মিটিয়ে ফেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

কুরাইশদের চক্রান্ত

আবদুল্লাহ বিন্ উবাই ছিলো মদীনার একজন প্রভাবশালী ইহুদী সর্দার। হিজরতের আগে মদীনাবাসীগণ তাকে নিজেদের বাদশা নিযুক্ত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। কিন্তু বিপুল সংখ্যক মদীনাবাসীর ইসলাম গ্রহণ এবং মক্কা থেকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদীনায় আগমনের ফলে এই পরিকল্পনাটি বানচাল হয়ে যায়। সেই সঙ্গে আবদুল্লাহ বিন্ উবাইর আশা-আকাঙ্ক্ষাও পণ্ড হয়ে যায়। এমনি সময় মক্কাবাসীগণ তাকে এই মর্মে একটি চিঠি লিখলো ঃ 'তোমরা আমাদের লোকদেরকে আশ্রয় দান করেছো। আমরা খোদার কসম করে বলছি, হয় তোমরা নিজেরা লড়াই করে ওখান থেকে তাদের তাড়িয়ে দাও, নচেত আমরা সবাই মিলে তোমাদের ওপর হামলা চালাবো; তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো এবং মেয়েদেরকে বাঁদী বানিয়ে রাখবো।' এই চিঠিখানা আবদুল্লাহ বিন্ উবাইর হতাশ মনে কিছুটা আশার সঞ্চার করলো। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) যথাসময়ে তার নষ্টামি প্রতিরোধ করার জন্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলেন। তিনি তাকে এই বলে বুঝালেন, 'তুমি কি আপন পুত্র এবং ভাইদের সঙ্গে লড়াই করতে চাও?' যেহেতু মদীনাবাসীদের (আনসার) অধিকাংশই ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, এজন্যে আবদুল্লাহ বিন্ উবাইও শেষ পর্যন্ত তার উচ্চাভিলাস থেকে বিরত হলো।

এ সময়েই একবার মদীনার নেতা সা'দ বিন্ মা'আজ উমরা উপলক্ষে মক্কা গমন করলেন। কা'বার দরজায় আবু জেহেলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো। আবু জেহেল তাঁকে বললো ঃ 'তোমরা আমাদের ধর্মত্যাগীদের (মুসলমান) আশ্রয়দান করেছো আর আমরা তোমাদেরকে নিশ্চিন্তে কা'বা তাওয়াফ করতে দিবো? তুমি যদি উমাইয়া বিন্ খালফের মেহমানই না হতে তাহলে এখান থেকে জিন্দা যেতে পারতে না।' একথা শুনে সা'দ

www.icsbook.info

বললেন ঃ 'খোদার কসম, তুমি যদি আমায় এতে বাধা দান করো, তাহলে তোমাদের পক্ষে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে (অর্থাৎ মদীনার ওপর দিয়ে বাণিজ্য যাত্রায়) আমি তোমাদেরকে বাধা দেবো।' বস্তুত কুরাইশরা কোনোরূপ নষ্টামি করলে মদীনার ওপর দিয়ে তাদের বাণিজ্য-পথ বন্ধ হয়ে যাবে, এ ছিলো তারই সুস্পষ্ট ঘোষণা।

কুরাইশদের ওপর চাপ প্রদান

বস্তুত এ সময় কুরাইশরা মুসলমান এবং ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে যে পরিকল্পনা আঁটছিলো, তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে জব্দ করতে হলে তাদের ঐ বাণিজ্য-পথটি দখল করে সিরিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে দেয়ার চেয়ে উত্তম পন্থা মুসলমানদের সামনে আর কিছুই ছিলো না। একমাত্র এহেন চাপের দ্বারাই মক্কাবাসী কুরাইশদের জব্দ করা সম্ভব ছিলো। তাই হযরত মুহাম্মদ (স) এ বাণিজ্য-পথের নিকটবর্তী ইহুদী বাসিন্দাদের সঙ্গে বিভিন্নরূপ চুক্তি সম্পাদন করে যেমন নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তেমনি কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাকে শাঁসানোর জন্যে মাঝে মাঝে মুসলমানদের ছোটো ছোটো প্রহরী দলও পাঠানো শুরু করলেন। অবশ্য এইসব প্রহরী দলের দ্বারা না কখনো কোনো খুন-খারাবি হয়েছে আর না কোনো কাফেলার ওপর লুটতরাজ চলেছে। এদের প্রেরণ করে শুধু কুরাইশদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো যে, তারা যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক না কেন, হাওয়ার গতি কোন্ দিকে তা বুঝে-শুনেই যেনো গ্রহণ করে। তারা যদি এখনো মুসলমানদের উত্তক্ত করতে চায়, তাহলে তাদেরকেও আপন ব্যবসায় থেকে হাত গুটাতে হবে।

হাযরামীর হত্যা

এরই মধ্যে কুরাইশগণ কখন কি পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তা জানবার জন্যে হযরত মুহাম্মদ (স) সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যথারীতি অবহিত থাকার চেষ্টা করতে লাগলেন। দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে তিনি বারোজন লোক দিয়ে আবদুল্লাহ বিন্ হাজারকে নাখলার দিকে পাঠালেন। জায়গাটি মক্কা ও তায়েফের মাঝখানে অবস্থিত। হযরত মুহাম্মদ (স) আবদুল্লাহ্‌র হাতে একটি চিঠি দিয়ে বললেন ঃ 'এটি দু'টিন পরে খুলবে।' আবদুল্লাহ যথাসময়ে চিঠিখানা খুলে দেখলেন, 'নাখলা নামক স্থানে অবস্থান করো এবং কুরাইশদের অবস্থান জেনে নিয়ে খবর দাও।' ঘটনাক্রমে কুরাইশদের কতিপয় লোক সিরিয়া থেকে ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে ঐ পথ দিয়ে আসছিলো। হযরত আবদুল্লাহ তাদের মুকাবিলা করলেন। ফলে আমর বিন্ হাযরামী নামক এক ব্যক্তি নিহত হলো। এছাড়া আরো দুই ব্যক্তিকে বন্দী করা হলো এবং গনীমতের মাল ও যুদ্ধের পরিত্যক্ত সম্পদ সংগ্রহ করা হলো।

www.icsbook.info

হযরত আবদুল্লাহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে এই ঘটনার কথা বিবৃত করে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খেদমতে গনীমতের মাল উপস্থাপন করলেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) এতে বেজায় অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন ঃ 'আমি তো তোমাকে এর অনুমতি দেইনি।' তিনি গনীমতের মাল গ্রহণেও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

এই দুর্ঘটনায় নিহত ও ধৃত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলো। তার ফলে এ ঘটনায় কুরাইশরা অত্যন্ত উত্তেজিত হলো। তারা মুসলমানদের কাছ থেকে রক্তের বদলা নেবারও একটি অজুহাত খুঁজে পেলো।

বদর যুদ্ধের পটভূমি

এমনি অবস্থায় দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে (৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী কিংবা মার্চ) কুরাইশদের এক বিরাট কাফেলা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুসলিম অধিকৃত এলাকার কাছাকাছি এসে পৌঁছলো। কাফেলাটির সঙ্গে প্রায় ৫০ হাজার আশরাফী মূল্যের ধন-মাল এবং ৩০/৪০ জনের মতো তত্ত্বাবধায়ক (মুহাফেজ) ছিলো। তাদের ভয় ছিলো, মদীনার নিকটে পৌঁছলে মুসলমানরা হয়ত তাদের ওপর হামলা করে বসতে পারে। কাফেলার নেতা ছিলো আবু সুফিয়ান। সে এই বিপদাশংকা উপলব্ধি করেই এক ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্যে মক্কায় পাঠিয়ে দিলো। ঐ লোকটি মক্কায় পৌঁছেই এই বলে শোরগোল শুরু করলো যে, 'তাদের কাফেলার ওপর মুসলমানরা লুটতরাজ চালাচ্ছে। সুতরাং সাহায্যের জন্যে সবাই ছুটে চলো।'

কাফেলার সঙ্গে যে ধন-মাল ছিলো, তার সাথে বহু লোকের স্বার্থ জড়িত ছিলো। ফলে এ একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হলো। তাই সাহায্যের ডাকে সাড়া দিয়ে কুরাইশদের সমস্ত বড়ো বড়ো সর্দারই যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে পড়লো। এভাবে প্রায় এক হাজার যোদ্ধার এক বিরাট বাহিনী তৈরী হয়ে গেলো। এই বাহিনী অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শান-শওকতের সঙ্গে মক্কা থেকে যাত্রা করলো। এদের হৃদয়ে একমাত্র সংকল্প ঃ মুসলমানদের অস্তিত্ব এবার নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে, যেনো নিত্যকার এই ঝঞ্ঝাট চিরতরে মিটে যায়। বস্তুত, একদিকে তাদের ধনমাল রক্ষার আগ্রহ, অন্যদিকে পুরনো দুশমনি ও বিদ্বেষের তাড়না—এই দ্বিবিধ ক্রোধ ও উন্মাদনার সঙ্গে কুরাইশ বাহিনী মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো।

কুরাইশদের হামলা

এদিকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছেও এই পরিস্থিতি সম্পর্কে যথারীতি খবর পৌঁছতে লাগলো। তিনি বুঝতে পারলেন, এবার সত্যসত্যই মুসলমানদের সামনে এক কঠিন সংকটকাল উপস্থিত হয়েছে। এবার যদি কুরাইশরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয় এবং মুসলমানদের এই নয়া সমাজ-সংগঠনটিকে পরাজিত করতে পারে, তাহলে

www.icsbook.info

ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে সামনে এগোনো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। এমন কি, এর ফলে ইসলামের আওয়াজও হয়তো চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। মদীনায় হিজরতের পর এ যাবত দুটি বছরও অতিক্রান্ত হয়নি। মুহাজিরগণ তাদের সবকিছুই মক্কায় ফেলে এসেছে এবং এখনো তারা রিক্তহস্ত। আনসারগণ যুদ্ধ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। অন্যদিকে ইহুদীদেরও অনেকগুলো গোত্র বিরুদ্ধতার জন্যে প্রস্তুত। খোদ মদীনায় মুনাফিক এবং মুশরিকদের অবস্থিতি এক বিরাট সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে। এমনি অবস্থায় কুরাইশরা যদি মদীনা আক্রমণ করে, তাহলে মুসলমানদের এই মুষ্টিমেয় দলটি হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়েও যেতে পারে। আর হামলা যদি নাও করে বরং আপন শক্তি বলে শুধু কাফেলাকে মুক্ত করে নিয়ে যায়, তবুও মুসলমানরা নিবীর্য হয়ে পড়বে। অতঃপর তাদেরকে জব্দ করতে আশ-পাশের গোত্রগুলোকে আর কোনো বেগ পেতে হবে না। কুরাইশদের ইঙ্গিতে তারা মুসলমানদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে শুরু করবে। এদিকে মদীনার ইহুদী, মুনাফিক এবং মুশরিকগণও মাথা তুলে দাঁড়াবে। ফলে মুসলমানদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে। এসব কারণেই হযরত মুহাম্মদ (স) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বর্তমানে যতোটুকু শক্তিই সঞ্চয় করা সম্ভব, তা নিয়েই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং মুসলমানদেরকে আপন বাহুবল দ্বারা টিকে থাকার অধিকার প্রমাণ করতে হবে।

মুসলমানদের প্রস্তুতি

এই সিদ্ধান্তের পর নবী করীম (স) মুহাজির ও আনসারগণকে জমায়েত করে তাদের সামনে সমগ্র পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরে বললেন ঃ 'একদিকে মদীনার উত্তর প্রান্তে রয়েছে ব্যবসায়ী কাফেলা আর অন্য দিকে দক্ষিণ দিক থেকে আসছে কুরাইশদের সৈন্য-সামন্ত। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, এর যে-কোন একটি তোমরা লাভ করবে। বলো, তোমরা এর কোন্‌টির মুকাবিলা করতে চাও? জবাবে বহু সাহাবী কাফেলার ওপর আক্রমণ চালানোর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কিন্তু নবী করীম (স)-এর দৃষ্টি ছিলো সুদূরপ্রসারী। তাই তিনি তাঁর প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলেন। এরপর মুহাজিরদের ভেতর থেকে মিকদাদ বিন্ আমর (না) নামক জনৈক সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! প্রভু আপনাকে যেদিকে আদেশ করেছেন, সেদিকেই চলুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আমরা বনী ইসরাঈলের মতো বলতে চাই না—যাও, তুমি এবং তোমার খোদা গিয়ে লড়াই করো, আমরা এখানে বসে থাকবো।'[৪০]

কিন্তু এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আনসারদের থেকেও মতামত গ্রহণের প্রয়োজন ছিলো। এজন্যে হযরত মুহাম্মদ (স) তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে উল্লিখিত প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলেন। এরপর হযরত সা'দ বিন্ মা'আজ (রা) দাঁড়িয়ে

৪০. বনী ইসরাইলীগণ এ কথা মূসা (আ)-কে বলেছিলো।

www.icsbook.info

বললেন ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি। আপনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছি এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সবই সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছি। সর্বোপরি, আমরা আপনার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছি। অতএব হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা-ই কার্যে পরিণত করুন। যে মহান সত্ত্বা আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে গিয়েও ঝাঁপ দেন, তবু আমরা আপনার সাথে থাকবো এবং এ ব্যাপারে আমাদের একটি লোকও পিছু হটবে না। আমরা যে শপথ নিয়েছি, যুদ্ধকালে তা হরফে হরফে পালন করবো। সাচ্চা আত্মোৎসর্গীর ন্যায় আমরা শত্রুদের মুকাবিলা করবো। কাজেই আল্লাহ খুবই শীগ্‌গীরই আমাদের দ্বারা আপনাকে এমন জিনিস দেখাবেন, যা দেখে আপনার চক্ষু শীতল হয়ে যাবে। অতএব, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতের ওপর ভরসা করে আপনি আমাদের নিয়ে এগিয়ে চলুন।'

এই বক্তৃতার-পর স্থির করা হলো যে, কাফেলার পরিবর্তে সৈন্যদরই মুকাবিলা করা হবে। কিন্তু এটা কোনো মামুলি সিদ্ধান্ত ছিলো না। কারণ কুরাইশদের তুলনায় মুসলমানদের সংগঠন ছিলো নেহাত দুর্বল। এর মধ্যে যুদ্ধ করার মতো যোগ্য লোকের সংখ্যা ছিলো তিনশ'র চেয়ে কিছু বেশি। তারও মধ্যে ঘোড়া ছিলো মাত্র দু'-তিন জনের কাছে। উট ছিল মাত্র সত্তরটির মতো। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামও ছিলো অপ্রতুল। মাত্র ষাট ব্যক্তির কাছে ছিলো লৌহবর্ম। এ কারণে মাত্র কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাদবাকী সবারই মনে ভীতির সঞ্চার হলো। তাদের অবস্থা দেখে মনে হতে লাগলো, যেনো জেনে-শুনে তারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতে এই দৃশ্যই ফুটে উঠেছে ঃ

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ - يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَاتَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ - وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَالْكٰفِرِيْنَ - لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ - (انفال - ٥-٨)

(হে নবী!) এই লোকগুলোর তো আপন বাড়ি-ঘর থেকে তেমনি বের হওয়া উচিত ছিলো, তোমার প্রভু যেমন তোমায় সত্য সহকারে তোমার গৃহ থেকে বের করে এনেছেন; কিন্তু মুমিনদের একটি দলের কাছে এ ছিলো অত্যন্ত অপসন্দনীয়। তারা সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হওয়ার পরও সে সম্পর্কে তোমার সঙ্গে তর্ক করছিলো;

www.icsbook.info

তাদেরকে যেনো দৃশ্যমান মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। (সেই সময়ের কথা) স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন, (আবু সুফিয়ান ও আবু জেহেলের) দুই দলের মধ্য থেকে যে কোন একটি তোমাদের করায়ত্ত হবে আর তোমরা চেয়েছিলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল (অর্থাৎ নিরস্ত্র) দলটিকে বশীভূত করতে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিলো তিনি আপন বিধানের দ্বারা সত্যকে অজেয় করে রাখবেন এবং কাফিরদের মূলোচ্ছেদ করে দেবেন, যেনো সত্য সত্য হয়েই থাকে এবং মিথ্যা মিথ্যাই থেকে যায়—অপরাধীদের কাছে এটা যতোই অপসন্দনীয় হোক না কেন।

মদীনা থেকে মুসলমানদের যাত্রা

যুদ্ধ-সম্ভার ও রসদ-পত্রের এই দৈন্য সত্ত্বেও দ্বিতীয় হিজরীর ১২ রমযান নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে মাত্র তিনশ'র মতো মুসলমান নিয়ে মদীনা থেকে যাত্রা করেন। তাঁরা সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পা বাড়ালেন; কারণ কুরাইশদের বাহিনীটি ঐদিক থেকে আসছিলো। ১৬ রমযান তাঁরা বদরের নিকটে পৌঁছলেন। এটি মদীনা থেকে কিঞ্চিদধিক ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রান্তর। এখানে পৌঁছার পর জানা গেলো যে, কুরাইশ বাহিনী প্রান্তরের অপর সীমান্তে এসে পৌঁছেছে। তাই হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নির্দেশে এখানে ছাউনি ফেলা হলো।

কুরাইশদের বাহিনীটি অত্যন্ত জাঁকালো সাজ-সজ্জা সহকারে বের হয়েছিলো। এদের দলে এক সহস্রাধিক সৈন্য ছিলো, সর্দার ছিলো প্রায় এক শ'র মতো। সৈন্যদের জন্যে রসদ-পত্রেরও খুব উত্তম আয়োজন ছিলো। উত্‌বা বিন রাবিয়া ছিলো সিপাহ্‌সালার।

বদরের কাছাকাছি পৌঁছে কুরাইশ সৈন্যরাও জানতে পারলো যে, তাদের বাণিজ্য কাফেলা মুসলমানদের আয়ত্ত্বের বাইরে রয়েছে। এতে জাহ্‌রাহ ও আদী গোত্রের প্রধানগণ বললো যে, এখন আর আমাদের যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আবু জেহেল তাতে সায় দিলো না। ফলে জাহ্‌রাহ ও আদী গোত্রের লোকেরা মক্কায় ফিরে গেলো এবং বাকী সৈন্যরা সামনে অগ্রসর হলো।

যুদ্ধক্ষেত্রের যে অংশটি কুরাইশদের দখলে ছিলো, উপযোগিতার দিক দিয়ে তা ছিলো খুবই উত্তম। তাদের জমিন ছিলো অত্যন্ত মজবুত। পক্ষান্তরে মুসলমানরা যেখানে ছাউনি ফেলেছিলো, তা ছিলো লবণাক্ত ভূমি। সৈন্যদের পা তাতে দেবে যাচ্ছিলো। অন্যান্য দিক দিয়েও তাদের অসুবিধা ছিলো প্রচুর। এই পরিস্থিতিতে রাতভর সমস্ত সৈন্য বিশ্রাম গ্রহণ করলো; কিন্তু নবী করীম (স) সারা রাত ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল রইলেন। ১৭ রমযান ফজরের পর তিনি মুসলিম সৈন্যদের সামনে জিহাদ সম্পর্কে এক উদ্দীপনাময় ভাষণ দিলেন। অতঃপর যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করা হলো। এ বছরই মুসলমানদের প্রতি রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিলো। আশ্চর্যের

www.icsbook.info

বিষয়, এই পয়লা রোযার মধ্যেই মুসলমানদের তিনগুণ বেশি শত্রু সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুত হতে হলো। কি কঠোর পরীক্ষা!

সে রাতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত স্বরূপ দুটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। প্রথমত, মুসলিম সৈন্যগণ অত্যন্ত প্রশান্তি ও সুনিদ্রার ভেতর দিয়ে রাত যাপন করলো। প্রত্যুষে তারা সতেজ বল-বীর্য নিয়ে ঘুম থেকে জাগলো। দ্বিতীয়ত, রাতে খুব বৃষ্টিপাত হলো। তার ফলে লবণাক্ত জমি শক্ত হয়ে গেলো। এবং মুসলমানদের পক্ষে ময়দান খুব উপযোগী হলো। পক্ষান্তরে এই বৃষ্টির ফলে কুরাইশদের অধিকৃত অংশ কর্দমাক্ত হয়ে গেলো এবং তাতে সৈন্যদের পা দেবে যেতে লাগলো পরন্তু মুসলমানদের অধিকৃত অংশের নীচু ভূমিতে পানি জমে গেলো এবং তাতে তাদের অযু-গোসল ইত্যাদির প্রচুর সুযোগ হলো। এসব কারণে মুসলমানদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি ও শংকাবোধ দূর হয়ে গেলো। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত মনে তারা শত্রু সৈন্যদের মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত হলো।

ময়দানে যখন উভয় পক্ষের সৈন্যদল মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো, তখন এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা হলো। একদিকে ছিলো আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং তাঁরই বন্দেগী ও আনুগত্য স্বীকারকারী মাত্র ৩১৩ জন মুসলমান, যাদের কাছে সাধারণ যুদ্ধ-সরঞ্জাম পর্যন্ত যথেষ্ট ছিলো না। অন্যদিকে ছিলো অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদ-পত্রে সুসজ্জিত এক সহস্রাধিক কাফির সৈন্য, যারা এসেছে তওহীদের আওয়াজকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে। যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে নবী করীম (স) খোদার দরবারে হাত তুললেন এবং অতীব বিনয় ও নম্রতার সাথে বললেন ঃ 'হে খোদা! এই কুরাইশরা চরম ঔদ্ধত্য ও অহমিকা নিয়ে এসেছে তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে। অতএব আমায় যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তুমি দিয়েছিলে, এখন সে সাহায্য প্রেরণ করো। হে খোদা! আজ এই মুষ্টিমেয় দলটি যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়ায় তোমার বন্দেগী করার আর কেউ থাকবে না।'

এই যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিলো মুহাজিরদেরকে। এদের প্রতিপক্ষে ছিলো আপন ভাই, পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। কারো, বাপ, কারো চাচা, কারো মামা আর কারো ভাই ছিলো তার তলোয়ারের লক্ষ্যবস্তু এবং নিজ হাতে তাদের হত্যা করতে হয়েছিলো এইসব কলিজার টুকরাকে। এই কঠিন পরীক্ষায় কেবল তারাই টিকে থাকতে পেরেছিলো, যারা সাচ্চা দিলে আল্লাহ্‌র সঙ্গে ওয়াদা করেছিলো ঃ যে সব সম্বন্ধকে তিনি বজায় রাখতে বলেছেন, তারা শুধু তা-ই বজায় রাখবে আর যেগুলোকে তিনি ছিন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন—তা যতোই প্রিয় হোক না কেন—তারা ছিন্ন করে ফেলবে।

কিন্তু সেই সঙ্গে আনসারদের পরীক্ষাও কোনো দিকে দিয়ে সহজ ছিলো না। এ যাবত আরবের কাফির এবং মক্কার মুশরিকদের চোখে তাদের 'অপরাধ' ছিলো এটুকু

www.icsbook.info

যে, তারা তাদের দুশমন অর্থাৎ মুসলমানদেরকে আশ্রয় দান করেছে। কিন্তু এবার তারা প্রকাশ্যভাবেই ইসলামের সমর্থনে কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তারা তাদের জনপদটির (মদীনা) বিরুদ্ধে গোটা আরবদেরকেই দুশমন বানিয়ে নিয়েছে। অথচ মদীনার জনসংখ্যা তখন সাকুল্যে এক হাজারের বেশি ছিলো না। এতো বড়ো দুঃসাহস তারা এজন্যেই করতে পেরেছিলো যে, তাদের হৃদয় আল্লাহ ও রাসূলের মুহাব্বত এবং আখিরাতের প্রতি অবিচল ঈমানে পরিপূর্ণ হয়েছিলো। নতুবা আপন ধন-দৌলত এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে এভাবে সমগ্র আরব ভূমির শত্রুতার ন্যায় কঠিন বিপদের মুখে কে নিক্ষেপ করতে পারে?

কুরাইশদের পরাজয়

বস্তুত ঈমানের এই স্তরে উন্নীত হবার পরই বান্দার জন্যে আল্লাহ্‌র সাহায্য অবতীর্ণ হয়ে থাকে। বদর যুদ্ধেও তাই আল্লাহ তা'আলা এই সহায়-সম্বলহীন ৩১৩ জন মুসলমানকে সাহায্য দান করেন। এর ফলে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এক সহস্রাধিক সুসজ্জিত সৈন্য অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো এবং তাদের সমস্ত শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলো। এই যুদ্ধে কুরাইশ পক্ষের প্রায় ৭০ ব্যক্তি নিহত হলো এবং সমসংখ্যক লোক বন্দী হলো। নিহতদের মধ্যে তাদের বড়ো বড়ো নামজাদা সর্দারগণ প্রায় সবাই ছিলো। এদের মধ্যে শায়বা, উত্‌বা, আবু জেহেল, জামআহ, আস, উমাইয়া প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব নামজাদা সর্দারের মৃত্যুর ফলে কুরাইশদের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে পড়লো। মুসলমানদের পক্ষে মাত্র ৬ জন মুহাজির এবং ৮ জন আনসার শহীদ হলেন।

যুদ্ধে যারা বন্দী হলো, তাদেরকে দু'-দু' চার-চারজন করে সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হলো এবং নবী করীম (স) তাদের সঙ্গে সদাচরণ করার নির্দেশ দান করলেন। ফলে সাহাবীগণ তাদেরকে এমনি আরামে রাখলেন যে, বহুতর ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরা কষ্ট স্বীকার করলেও বন্দীদের কষ্ট দেননি। এই সদাচরণের ফলে তাদের হৃদয়ে ইসলামের জন্যে অনেক নম্রতার সৃষ্টি হলো। আর এটাই ছিলো আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। পরে এইসব বন্দীর অনেকেই ফিদ্‌য়ার (মুক্তিপণ) বিনিময়ে মুক্তি লাভ করে। যারা গরীব অথচ শিক্ষিত ছিলো, তাদেরকে দশ-দশটি শিশুকে লেখাপড়া শিখানোর বিনিময়ে মুক্তি দেয়া হয়।

বদর যুদ্ধের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া

ফলাফল ও প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে বদর যুদ্ধ ছিলো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের দাওয়াত অগ্রাহ্য করার দরুণ মক্কার কাফিরদের জন্যে যে খোদায়ী আযাব নির্ধারিত হয়েছিলো, এ যুদ্ধ ছিলো তারই প্রথম নিদর্শন। তাছাড়া ইসলাম ও কুফরের

www.icsbook.info

মধ্যে মূলত কার টিকে থাকবার অধিকার রয়েছে এবং ভবিষ্যতে হাওয়ার গতিই বা কোন্ দিকে মোড় নেবে, এ যুদ্ধ তা স্পষ্টত জানিয়ে দিলো। এ কারণেই একে ইসলামী ইতিহাসের পয়লা যুদ্ধ বলা হয়। কুরআন পাকের সূরা আনফালে এই যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়েছে। তবে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ বা জেনারেলগণ কোনো যুদ্ধ জয়ের পর যে ধরনের পর্যালোচনা করে থাকে, এ পর্যালোচনা তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এ পর্যালোচনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর ওপর একটু বিস্তৃতভাবে দৃষ্টিপাত করলে ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি এবং মুসলমানদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

বদর যুদ্ধের পর্যালোচনা এবং মুসলমানদের প্রশিক্ষণ

১. পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামের আগে যুদ্ধ ছিলো আরবদের একটি প্রিয় 'হবি'। যুদ্ধে যে মালপত্র (গনীমত) তাদের হস্তগত হতো, তার প্রতি ছিলো তাদের দুর্নিবার মোহ। এমনকি, কখনো কখনো ঐ মাল-পত্রের আকর্ষণই তাদের যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিলো ধন-সম্পদের চেয়ে অনেক উন্নত এবং সে উদ্দেশ্যকে মুসলমানদের হৃদয়-মনে বদ্ধমূল করে নেয়া অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। এ দিক দিয়ে বদর যুদ্ধ ছিলো মুসলমানদের পক্ষে একটি পরীক্ষামূলক যুদ্ধ। মুসলমানদের হৃদয়-মনে ইসলামী যুদ্ধের নিয়ম-নীতি ও নৈতিক আদর্শ পুরোপুরি বদ্ধমূল হয়েছে, না অনৈসলামী যুদ্ধের ধ্যান-ধারণা তাদের হৃদয়ে এখনো প্রভাব বিস্তার করে আছে , এই যুদ্ধ ছিলো তারই পরীক্ষামাত্র।

বদর যুদ্ধে কাফিরদের মালমাত্তা যাদের হস্তগত হয়েছিলো, তারা পুরনো রীতি অনুযায়ী তাকে আপন সম্পদ বলেই মনে করে বসলো। ফলে যারা কাফিরদের পিছন ধাওয়া করা কিংবা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নিরাপত্তার কাজে ব্যস্ত ছিলো, তারা কিছুই পেলো না। এভাবে তাদের পরস্পরের মধ্যে কিছুটা তিক্ততার সৃষ্টি হলো। ইসলামী আন্দোলনের ধারক ও বাহকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার এটাই ছিলো উপযুক্ত সময়। তাই সর্বপ্রথম তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলা হলো যে, গনীমতের মাল প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের কোনো পারিশ্রমিক নয়। এ হচ্ছে আপন পারিশ্রমিকের বাইরে মালিকের তরফ থেকে দেয়া একটি বাড়তি অবদান বা পুরস্কার বিশেষ (আনফাল)। আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করার যথার্থ বদলা তো তিনি আখিরাতেই দান করবেন। এখানে যা কিছু পাওয়া যায়, তা কারো ব্যক্তিগত স্বত্ত্ব (হক) নয়, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার একটি বাড়তি অবদান মাত্র। কাজেই এই অবদান সম্পর্কে কারোর স্বত্ত্বাধিকার দাবির প্রশ্নই উঠে না। এর স্বত্ত্বাধিকার হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের। তাঁরা যেভাবে চান, সেভাবেই এর বিলি-বন্টন করা হবে।

www.icsbook.info

এরপর সামনে অগ্রসর হয়ে এই বিলি-বন্টনের নীতিমালাও বাত্‌লে দেয়া হলো। এভাবে যুদ্ধ সংক্রান্ত এক বিরাট প্রশ্নের নিষ্পত্তি করা হলো। মুসলমানদেরকে চূড়ান্তভাবে বলে দেয়া হলো যে, তারা দুনিয়ার ফায়দা হাসিলের জন্যে কখনো অস্ত্র ধারণ করতে পারে না, বরং দুনিয়ার নৈতিক বিকৃতিকে সংশোধন করা এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে গায়রুল্লাহ্‌র গোলামী থেকে মুক্ত করার অপরিহার্য প্রয়োজনেই তাদের শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। তারা যখন দেখবে যে, বিরুদ্ধ শক্তি তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সংশোধন প্রচেষ্টাকে অসম্ভব করে তুলেছে, ঠিক তখনি এরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। কাজেই তারা যে সংস্কার সংকল্প নিয়েছে, তাদের দৃষ্টি শুধু সেদিকেই নিবদ্ধ থাকা উচিত এবং এই লক্ষ্য অর্জনের পথে কোনোরূপ অন্তরায় হতে পারে, এমন কোনো পার্থিব স্বার্থের দিকেই তাদের ফিরে তাকানো অনুচিত।

২. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আমীর বা নেতার আনুগত্য হচ্ছে দেহের ভিতর রূহের সমতুল্য। তাই নেতৃ-আদেশের পরিপূর্ণ ও নির্ভেজাল আনুগত্যের জন্যে মনকে প্রস্তুত করার নিমিত্ত বারবার মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।[৪১] আলোচ্য যুদ্ধের গনীমতের মাল সম্পর্কেও তাই সর্বপ্রথম লোকদের কাছে পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের দাবি জানানো হলো এবং তাদেরকে বলে দেয়া হলো যে, এসব কিছুই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের স্বত্ত্ব। এ ব্যাপারে তাঁরা যা ফয়সালা করেন, তাতেই সবার রাযী থাকতে হবে।

৩. সাধারণ আন্দোলনগুলোর প্রকৃতি এই যে, সেগুলো আপন কর্মী ও অনুবর্তীদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্যে তাদের কৃতিত্বের কথা নানাভাবে উল্লেখ করে থাকে। এভাবে খ্যাতি-যশ লাভের আকাংক্ষাকে উস্কিয়ে দিয়ে লোকদেরকে ত্যাগ ও তিতিক্ষার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়। বস্তুত এ কারণেই বড় বড় যুদ্ধ বা বিজয় অভিযানের পর এইসব আন্দোলন তার আত্মোৎসর্গী কর্মীদের মধ্যে বড়ো বড়ো খেতাব, পদক, ইনাম ইত্যাদি বিতরণ এবং নানাভাবে তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করে থাকে। ফলে একদিকে তারা আপন কৃতিত্বের বদলা পেয়ে সন্তোষ লাভ করে এবং ভবিষ্যতে আরো অধিক ত্যাগ স্বীকারের জন্যে উদ্বুদ্ধ হয়, অন্যদিকে অপর লোকদের মনেও তাদেরই মতো উন্নত মর্যাদা লাভের আকাংক্ষা জাগ্রত হয়। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মাত্র ৩১৩ জন মুসলিম সৈন্য কর্তৃক এক সহস্রাধিক কাফির সৈন্যকে পরাজিত করা এবং এক প্রকার বিনা সাজ-সরঞ্জামে কয়েকগুণ বেশি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে নির্মূল করা সত্ত্বেও তাদেরকে বলে দেয়া হলো ঃ তারা যেনো এ ঘটনাকে নিজেদের বাহাদুরি বা কৃতিত্ব বলে মনে না করে। কারণ তাদের এ বিজয় শুধু আল্লাহ্‌র করুণা ও অনুগ্রহ মাত্র।

৪১. ইসলামে নেতৃ আদেশের আনুগত্য হচ্ছে যে কোনো সামষ্টিক কাজে সাফল্যের পূর্বশর্ত। তাই নেতৃ-আদেশ লংঘন একটি গুরুতর অপরাধ। অবশ্য আদেশটি যদি আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানি হয়, তাহলে ভিন্ন কথা। — সম্পাদক

www.icsbook.info

কেবল তাঁরই দয়া ও করুণার ফলে এতো বড়ো শত্রু বাহিনীকে তারা পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছে। কাজেই তাদের কখনো আপন শক্তি-সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করা উচিত নয়; বরং সর্বদা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করা এবং তাঁরই করুণা ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে ময়দানে অবতরণ করার ভেতরে নিহত রয়েছে তাদের আসল শক্তি।

যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে হযরত মুহাম্মদ (স) এক মুঠো বালু হাতে নিয়ে 'শাহাতুল ওজুহ' (চেহারা আচ্ছন্ন হয়ে যাক) বলে কাফিরদের দিকে ছুঁড়ে মারেন। এরপরই মুসলমান সেনারা এক যোগে কাফিরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদেরকে ধরাশায়ী করে। অন্য লোক হলে এই ঘটনাকে নিজের 'কেরামত' বা অলৌকিক কীর্তি বলে ইচ্ছামত গর্ব করতে পারতো এবং একে ভিত্তি করে তার অনুগামীরাও নানারূপ কিস্‌সা-কাহিনীর সৃষ্টি করতো। কিন্তু কুরআন পাকে খোদ আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বলে দিলেন ঃ 'তাদেরকে (কাফিরদের) তোমরা হত্যা করোনি, বরং তাদের হত্যা করেছেন আল্লাহ।' এমন কি, তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-কে পর্যন্ত বলে দিলেন যে, '(বালু) তুমি ছুঁড়োনি, বরং ছুঁড়েছেন আল্লাহ এবং মুমিনদেরকে একটি উত্তম পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ করার জন্যেই এসব কিছু করা হয়েছে।' (সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ১৮)। এভাবে মুসলমানদেরকে বলে দেয়া হলো যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত কাজের চাবিকাঠি রয়েছে আল্লাহ্‌র হাতে এবং যা কিছু ঘটে তাঁর নির্দেশ ও ইচ্ছানুক্রমেই ঘটে থাকে। মুমিনদের কাজ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র ও রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা। এরই ভেতর নিহিত রয়েছে তাদের জন্যে সাফল্য।

৪. ইসলামী আন্দোলনে জিহাদ হচ্ছে চূড়ান্ত পরীক্ষা, যার মাধ্যমে আন্দোলনের অনুবর্তীদের পূর্ণ যাচাই হয়ে যায়। যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয় এবং মুমিনদের পক্ষে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রাখার জন্যে ময়দানে অবতরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না, তখন সেখান থেকে তাদের পাশ্চাদপসরণ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করতে নেমে ময়দান থেকে পলায়ন করার অর্থ এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে,

ক. মুমিন যে উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করতে নেমেছে, তার চেয়ে তার নিজের প্রাণ অধিকতর প্রিয় কিংবা

খ. জীবন ও মৃত্যু যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র হাতে নিবদ্ধ এবং তাঁর হুকুম না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু আসতেই পারে না আর হুকুম যখন এসে যায়, তখন মৃত্যু এক মুহূর্তও বিলম্বিত হতে পারে না—তার এই ঈমানই অত্যন্ত দুর্বল অথবা

গ. তার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সাফল্য ছাড়াও অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা লালিত হচ্ছে এবং প্রকৃতপক্ষে সে খোদার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করতে পারেনি।

www.icsbook.info

বস্তুত যে ঈমানের ভেতর এর কোনো একটি জিনিসও ঠাঁই নিয়েছে, তাকে কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ ঈমান বলা যায় না। এ কারণেই ইসলামের এই প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধোপলক্ষে মুসলমানদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হলো যে, যুদ্ধ থেকে পশ্চাদপসরণ করা মুমিনদের কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (স) ইরশাদ করেন, তিনটি গোনাহ্‌র মুকাবিলায় মানুষের কোনো নেকীই কল্যাণপ্রসূ হতে পারে না ঃ এক, খোদার সাথে শিরক, দুই, পিতামাতার অধিকার হরণ এবং তিন, আল্লাহর পথে চালিত যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা।

৫. যখন পার্থিব সম্পর্ক-সম্বন্ধের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সঙ্গত সীমা অতিক্রম করে যায়, তখন আল্লাহ্‌র পথে অগ্রসর হতেও তার শৈথিল্য এসে যায়। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হচ্ছে এ পথেরই প্রধান প্রতিবন্ধক। তাই এই উপলক্ষে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির সঠিক মর্যাদা সম্পর্কেও মুসলমানদেরকে অবহিত করলেন। তিনি বললেন ঃ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ -

জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের পরীক্ষার উপকরণ মাত্র; আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিফল দেবার জন্যে অনেক কিছুই রয়েছে।'

(সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ২৮)

বস্তুতু, মুমিন তার ধন-সম্পদের সদ্ব্যবহার করে কিনা এবং সম্পদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ হেতু আল্লাহ্‌র পথে জীবন পণ করতে তার হৃদয়ে কিছুমাত্র সংকীর্ণতা আসে কিনা অথবা সম্পদের মোহে সত্যের জিহাদে সে শৈথিল্য দেখায় কিনা, ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ শুধু তা-ই পরীক্ষা করে থাকেন। অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততি হচ্ছে মানুষের পরীক্ষার দ্বিতীয় পত্র। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে—প্রথমত, সন্তান-সন্ততিকে আল্লাহ্‌র বন্দেগী এবং তাঁর আনুগত্যের পথে নিয়োজিত করার পূর্ণ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুমিনকে তাদের প্রতি সঠিক কর্তব্য পালন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ যে স্বাভাবিক মমত্ববোধ জাগিয়ে দিয়েছেন, তার আধিক্যহেতু আল্লাহ্‌র পথে পা বাড়াতে গিয়ে যাতে বাধার সৃষ্টি না হয়, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে এই মহাপরীক্ষার জন্যে প্রতিটি মুমিনের তৈরী থাকা উচিত।

৬. ধৈর্য যে কোনো আন্দোলনেরই প্রাণবস্তু। দেহের জন্যে আত্মা যতোখানি প্রয়োজনীয়, ইসলামী আন্দোলনের জন্যে এই গুণটি ততোখানিই অত্যাবশ্যক। মক্কার মুসলমানরা যে দুরবস্থার মধ্যে কালাতিপাত করছিলো, সেখানেও এই গুণটি বেশি করে অর্জন করার জন্যে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিলো। কিন্তু সেখানে শুধু একতরফা জুলুম-পীড়ন সহ্য করা ছাড়া মুসলমানদের আর কিছুই করণীয় ছিলো না। কিন্তু এখন

www.icsbook.info

আন্দোলন দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করার দরুণ খোদ মুসলমানদের দ্বারাই অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ হবার আশংকা দেখা দিল। কাজেই এই পরিবর্তিত অবস্থায়ও এ গুণটি বেশি পরিমাণে অর্জন করার জন্যে তাগিদ দেয়া হলো। বলা হলো ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُ وَاللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - وَاَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ -

হে ঈমানদারগণ! যখন কোনো দলের সঙ্গে তোমাদের মুকাবিলা হয়, তখন তোমরা সঠিক পথে থেকো এবং আল্লাহ্‌কে বেশি পরিমাণে স্মরণ করো। আশা করা যায়, তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পরে বিবাদ করো না। তাহলে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের অবস্থার অবনতি ঘটবে। সবর বা ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করো; নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্য অবলম্বনকারীদের সাথে রয়েছেন' (সূরা আনফাল, আয়াত ঃ ৪৫ ও ৪৬)।

এখানে ধৈর্যের (সবরের) তাৎপর্য হচ্ছে এই ঃ

১. আপন প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগকে সংযত রাখতে হবে।

২. তাড়াহুড়া, ভয়-ভীতি ও উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে হবে।

৩. কোনো প্রলোভন বা অসঙ্গত উৎসাহকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

৪. শান্ত মন ও সুচিন্তিত ফয়সালার ভিত্তিতে সকল কাজ সম্পাদন করতে হবে।

৫. বিপদ-মুসিবত সামনে এলে দৃঢ় পদে তার মুকাবিলা করতে হবে।

৬. উত্তেজনা ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোনো অন্যায় কাজ করা যাবে না।

৭. বিপদ-মুসিবতের কারণে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে আতঙ্ক বা অস্থিরতার কারণে মনোবল হারানো যাবে না।

৮. লক্ষ্য অর্জনের আগ্রহাতিশয্যে কোনো অসঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা যাবে না।

৯. পার্থিব স্বার্থ ও প্রবৃত্তির তাড়নায় নিজের কামনা-বাসনাকে আচ্ছন্ন করা এবং সে সবের মুকাবিলায় দুর্বলতা প্রদর্শন করে কোনো স্বার্থের হাতছানিতে আকৃষ্ট হওয়া যাবে না।

এখন এই পরিবর্তিত অবস্থায় মুমিনদের আপন ধৈর্যের পরীক্ষা অন্যভাবেও দেয়ার প্রয়োজন ছিলো।

www.icsbook.info

মানুষের ওপর উদ্দেশ্য-প্রীতির প্রাধান্য কখনো কখনো এতোটা চেপে বসে যে, তার মুকাবিলায় সে হক ও ইনসাফের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখতে পারে না। সে মনে করে যে, উদ্দেশ্যের খাতিরে এরূপ করায় কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ইসলামী আন্দোলন সর্বতোভাবে একটি সত্যভিত্তিক আন্দোলন বিধায় স্বীয় অনুগামীকে সে কখনো হক ও ইনসাফের সীমা অতিক্রম করতে অনুমতি দেয় না। তাই কুফর ও ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বের সময় অন্যান্য নৈতিক ও শিক্ষামূলক নির্দেশাবলীর সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে রাজনৈতিক চুক্তির ব্যাপারেও মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ হক ও ইনসাফভিত্তিক নির্দেশাবলী প্রদান করা হলো। এই সব নির্দেশাবলীর সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেনো কখনো জয়-পরাজয় কিংবা পার্থিব স্বার্থের হাতছানিতে চুক্তিভঙ্গ না করে, বরং আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে যেনো চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে। এর ফলে তার আপন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য থেকেও যদি বঞ্চিত হতে হয়, তবুও যেনো সে পিছপা না হয়।

বদর যুদ্ধের পর কুরআন পাকে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে যে পর্যালোচনা করা হয়, এ হচ্ছে তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার অন্যান্য আন্দোলনের তুলনায় ইসলামী আন্দোলন যে কতোখানি উন্নত ও শ্রেষ্ঠ এবং অনুবর্তীদেরকে সে কি ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, এ থেকে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

ওহুদ যুদ্ধ

পটভূমি

বদর যুদ্ধে মুসলমানরা জয়লাভ করলো বটে, কিন্তু যুদ্ধের মাধ্যমে তারা যেনো ভীমরুলের চাকে ঢিল ছুঁড়লো। এই প্রথম যুদ্ধেই তারা দৃঢ়তার সঙ্গে কাফিরদের মুকাবিলা করেছিলো এবং কাফিরদেরকেও শোচনীয়রূপে পরাজিত হয়ে পিছু হটতে হয়েছিলো। এ ঘটনা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমগ্র আরব জনগোষ্ঠীকে প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত করে দিলো। যারা এই নয়া আন্দোলনের দুশমন ছিলো, তারা এ ঘটনার পর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তদুপরি মক্কার যে সব কুরাইশ সর্দার এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো, তাদের রক্তের বদলা নেবার জন্যে অসংখ্য-চিত্ত অস্থির হয়ে উঠলো। আরবে যে কোনো এক ব্যক্তির রক্তই পুরুষানুক্রমে যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। আর এখানে তো এমন অনেক ব্যক্তিই নিহত হয়েছিলো, যাদের রক্ত-মূল্য অসংখ্য যুদ্ধে ও আদায় হতে পারতো না। তাই চারদিকে ঝড়ের আলামত দেখা যেতে লাগলো। ইহুদীদের যেসব গোত্র ইতঃপূর্বে মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেছিলো, তারা চুক্তির কোনো মর্যাদা রক্ষা করলো না। এমন কি তারা খোদা, নবুয়্যাত, আখিরাত এবং কিতাবের প্রতি ঈমান পোষণের দাবি করার ফলে যেখানে মুসলমানদের সাথে অধিকতর নৈকট্য থাকা

www.icsbook.info

উচিত ছিলো, সেখানে মুশরিক কুরাইশদের প্রতিই তাদের সমস্ত সহানুভূতি উপচে পড়তে লাগলো। তারা খোলাখুলিভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে কুরাইশদেরকে উত্তেজিত করতে শুরু করলো। বিশেষত কা'ব বিন আশরাফ নামক বনী নাযীর গোত্রের জনৈক সর্দার এব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও অন্ধ শত্রুতায় লিপ্ত হলো। এ থেকে স্পষ্টত অনুমিত হলো যে, ইহুদীরা না পড়োশী হিসেবে কোনো কর্তব্য পালন করবে আর না হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে।

এর ফলে মদীনার এই ক্ষুদ্র জনপদটি চারদিক দিয়েই বিপদ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লো। অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা ছিলো এমনিতেই দুর্বল, তদুপরি যুদ্ধের ফলে তাদেরকে আরো বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো।

মক্কার মুশরিকদের অন্তরে এমনিতেই মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিলো। তাদের বড়ো বড়ো সর্দারগণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে ইতোমধ্যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলো। প্রত্যেক গোত্রের মনেই ক্রোধ ও উত্তেজনা কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছিলো। এমনি অবস্থায় ইহুদীগণ কর্তৃক মক্কাবাসীকে যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা আগুনে তেল ছিটানোর কাজ করলো। ফলে বদর যুদ্ধের পর একটি বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই মদীনায় এই মর্মে খবর পৌছলো যে, মক্কার মুশরিকগণ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কুরাইশদের অগ্রগতি

এই প্রেক্ষাপটে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসের প্রথম সপ্তাহে হযরত মুহাম্মদ (স) কয়েকজন লোককে সঠিক খবর সংগ্রহের জন্যে মদীনার বাইরে প্রেরণ করলেন। তারা ফিরে এসে খবর দিলো যে, কুরাইশ বাহিনী মদীনার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। এমনকি, তাদের ঘোড়াগুলো মদীনার একটি চারণভূমি পর্যন্ত সাফ করে ফেলেছে। এবার নবী করীম (স) সাহাবীদের কাছে পরামর্শ চাইলেন ঃ কুরাইশ বাহিনীর মুকাবিলা কি মদীনায় বসে করা হবে, না বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে? কোনো কোনো সাহাবী এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, মুকাবিলা মদীনায় বসেই করতে হবে। কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি অথচ শাহাদাতের আকাংক্ষায় উদ্বোলিত এমন কতিপয় যুবক দৃঢ়তার সাথে বললেন ঃ 'না, বাইরের ময়দানে গিয়েই তাদের মুকাবিলা করতে হবে।' অবশেষে তাদের এই দৃঢ়তা দেখে নবী করীম (স) মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

মুনাফিকদের ধোকাবাজি

কুরাইশগণ মদীনার একেবারে কাছাকাছি পৌছে ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে তাদের ছাউনি ফেললো। তার একদিন পর হযরত মুহাম্মদ (স) জুম'আর নামায বাদ এক

www.icsbook.info

হাজার সাহাবী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা করলেন। এদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক আবদুল্লাহ বিন্ উবাইও ছিলো। এ লোকটি দৃশ্যত মুসলমান হলেও কার্যত ছিলো মুনাফিক। এর প্রভাবাধীন আরো বহু মুনাফিক মুসলমানদের সঙ্গে যাত্রা করেছিলো। কিছুদূর গিয়ে আবদুল্লাহ বিন্ উবাই তিন শ' লোক নিয়ে হঠাৎ 'যুদ্ধ হবে না' বলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এখন শুধু সাত শ' সাহাবী বাকী রইলেন। এমনি নাজুক অবস্থায় মুনাফিকদের এই আচরণ ছিলো গুরুতর মনস্তাত্ত্বিক আঘাতের শামিল। কিন্তু যে সব মুসলমানের হৃদয় আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান, আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস এবং সত্যের পথে শহীদ হবার আকাঙক্ষায় পরিপূর্ণ ছিলো, এ ঘটনায় তাদের ওপর কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি হলো না। তাই তাঁরা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে সামনে অগ্রসর হলেন।

যুব সমাজের উদ্দীপনা

এ সময় হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর সঙ্গী-সাথীদের অবস্থা একবার যাচাই করে নিলেন এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণদের ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এদের মধ্যে রাফে' ও সামারাহ নামক দুটি কিশোর বালকও ছিলো। কিশোরদেরকে যখন সেনাবাহিনী থেকে আলাদা করে দেয়া হচ্ছিলো, তখন রাফে' তার পায়ের অগ্রভাগের ওপর ভর করে দাঁড়ালো। যেনো লম্বায় তাকে কিছু উঁচু দেখায় এবং তাকে সঙ্গে নেয়া হয়। তার এই কৌশল ফলপ্রসূও প্রমাণিত হলো। কিন্তু সামারাহ সেনাবাহিনীতে থাকবার অনুমতি না পেয়ে বললো ঃ 'রাফে'কে যখন রেখে দেয়া হয়েছে, তখন আমাকেও থাকবার অনুমতি দেয়া উচিত। কারণ আমি তাকে কুস্তি প্রতিযোগিতায় পরাজিত করতে পারি।' তার এ দাবির যথার্থতা প্রমাণের জন্যে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হলো। অবশেষে সে রাফে'কে পরাজিত করলো এবং তাঁকেও সেনাবাহিনীতে নিয়ে নেয়া হলো। এ একটি সামান্য ঘটনা মাত্র। কিন্তু এতেই আন্দাজ করা চলে যে, মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করার কতোখানি অদম্য আগ্রহ ছিলো।

সৈন্যদের প্রশিক্ষণ

ওহুদ পাহাড় মদীনা থেকে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত মুহাম্মদ (স) এমনভাবে তাঁর সৈন্যদের মোতায়েন করলেন যে, পাহাড় পিছন দিকে থাকলো আর কুরাইশ সৈন্যরা রইলো সামনের দিকে। পিছন দিকে পাহাড়ের মাঝ বরাবর একটি সুড়ঙ্গ পথ ছিলো এবং সে দিক থেকেও হামলার কিছুটা আশংকা ছিলো। হযরত মুহাম্মদ (স) সেখানে আবদুল্লাহ বিন্ জুবাইরকে পঞ্চাশ জন তীরন্দাজসহ মোতায়েন করলেন। তাঁকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যে, এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে কাউতে আসতে দেয়া যাবে না এবং তুমিও এখান থেকে কোন অবস্থায় নড়বে না। এমন কি যদি দেখো যে, পাখিরা আমাদের গোশ্‌ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে খাচ্ছে, তবুও তুমি নিজের স্থান ত্যাগ করবে না।

www.icsbook.info

কুরাইশদের সাজ-সজ্জা

এবার কুরাইশরা অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ সাজ-সজ্জা করে এসেছিলো। প্রায় তিন হাজার সৈন্য ও প্রচুর সামান-পত্র তাদের সঙ্গে ছিলো। তখনকার দিনে যে যুদ্ধে মেয়েরা যোগদান করতো, তাতে আরবরা জীবনপণ করে লড়াই করতো। তারা মনে করতো, যুদ্ধে যদি পরাজয় হয় তো মেয়েদের বেইজ্জত হবে। এ যুদ্ধেও কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে অনেক মহিলা এসেছিলো। এদের মধ্যে আপন পুত্র ও প্রিয়জন মারা গেছে, এমন অনেকেই ছিলো। এতে কেউ কেউ প্রিয়জনদের হত্যাকারীদের রক্তপান করে তবেই নিশ্বাস ফেলবে—এমন প্রতিজ্ঞা পর্যন্ত করেছিলো।

যুদ্ধের সূচনা

কুরাইশরা তাদের সৈন্যদেরকে খুব ভালোমতো প্রশিক্ষণ দিয়েছিলো। যুদ্ধের সূচনা-পর্বে কুরাইশ মহিলারা দফ বাজিয়ে আবেগ ও উদ্দীপনাময় কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। তারা যোদ্ধাদেরকে বদর যুদ্ধে নিহতদের রক্তের বদলা নেবার জন্যে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় উৎসাহ যোগালো। এরপর শুরু হলো যুদ্ধ। প্রথম পর্যায়ে মুসলমানদের দিকেই পাল্লা ভারী রইলো এবং কুরাইশ পক্ষের বহু সৈন্য নিহত হলো। তাদের সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ও বিশৃংখলা দেখা দিলো। এতে মুসলমানরা মনে করলো, যুদ্ধে তারা জিতে গেছে। তাই তারা এই প্রাথমিক বিজয়কে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছানোর আগেই গনীমতের মাল সংগ্রহ শুরু করে দিলো। এদিকে সুড়ঙ্গ পথের প্রহরায় নিযুক্ত সৈন্যরা যখন দেখলো যে, মুসলমানরা মাল সংগ্রহে লিপ্ত হয়েছে এবং দুশমনরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, তখন তারাও গনীমতের মাল সংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের নেতা হযরত আবদুল্লাহ বিন্ জুবাইর বারবার তাদেরকে বিরত রাখতে চাইলেন এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। কিন্তু কতিপয় লোক ছাড়া কেউ তাঁর কথা শুনলো না।

পশ্চাদ্দিক থেকে কুরাইশদের হামলা

খালিদ বিন্ অলীদ তখন কাফির সৈন্যদের একজন অধিনায়ক। সে এই সুবর্ণ সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগালো এবং পাহাড়ের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে সুড়ংগ-পথে মুসলমানদের ওপর হামলা করলো। হযরত আবদুল্লাহ এবং তাঁর ক'জন সঙ্গী শেষ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ পথের প্রহরায় ছিলেন, তাদের অধিকাংশই এই হামলার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু কাফিরদের এই প্রচন্ড হামলাকে তাঁরা প্রতিহত করতে পারলেন না। তাঁরা শহীদ হয়ে গেলেন। অতঃপর দুশমনরা একে একে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওদিকে যেসব পলায়নপর কাফির দূর থেকে এই দৃশ্য দেখছিলো, তারাও আবার ফিরে এলো। এবার দু'দিক দিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলা শুরু হলো। এই

www.icsbook.info

অভাবিত পরিস্থিতিতে মুসলমানদের মধ্যে এমন আতংকের সঞ্চার হলো যে, যুদ্ধের মোড়ই সম্পূর্ণ ঘুরে গেলো। মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাতে লাগলো। এমন কি আতংকের মধ্যে খোদ মুসলমানের হাতে মুসলমান পর্যন্ত শহীদ হলো। এই আতংকের মধ্যেই গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, নবী করীম (স) শহীদ হয়ে গেছেন। এই খবরে সাহাবীদের বাকী উদ্যমটুকুও নষ্ট হয়ে গেলো এবং অনেকে সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেললো।

আল্লাহ্‌র সাহায্য এবং বিজয়

এ সময় দশ-বারো জন সাহাবী নবী করীম (স)-কে ঘিরে রেখেছিলেন। তিনি অবশ্য আহত হয়েছিলেন। সাহাবীরা তাঁকে একটি পাহাড়ের ওপর নিয়ে এলেন। অতঃপর অন্য মুসলমানরাও জানতে পারলেন যে, নবী করীম (স) সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। তাই তাঁরা আবার দলে দলে তাঁর কাছে একত্রিত হতে লাগলেন। কিন্তু এ সময় কি কারণে যেনো কাফিরদের মনোযোগ হঠাৎ অন্যদিকে নিবদ্ধ হলো এবং নিজেদের বিজয়কে পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত না পৌঁছিয়েই তারা ময়দান ছেড়ে চলে গেল।

তারা যখন কিছুটা দূরে চলে গেলো, তখন তাদের সম্বিত ফিরে এলো। তারা পরস্পরকে বললো ঃ এ আমরা কি ভুল করলাম! মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ খতম করে দেবার দুর্লভ সুযোগটাকে নষ্ট করে এমনিই চলে এলাম! এরপর তারা এক জায়গায় থেমে পরস্পর বলাবলি করলো ঃ এবার তাহলে মদীনার ওপর আর একবার হামলা করা উচিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তাদের সাহস হলো না। তারা মক্কায় ফিরে গেলো।

এদিকে নবী করীম (স) চিন্তিত ছিলেন যে, শত্রুরা না জানি ফিরে এসে আবার হামলা করে বসে। তাই তিনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুসলমানদেরকে দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দিলেন। এটা ছিলো অত্যন্ত নাজুক সময়। কিন্তু যারা সাচ্চা মুমিন ছিলো, তারা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে পুনরায় জান কুরবান করার জন্যে তৈরী হয়ে গেলো। নবী করীম (স) হামরা-উল-আসাদ নামক স্থান পর্যন্ত দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। এ জায়গাটি মদীনা থেকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে পৌঁছে জানা গেলো যে, কুরাইশরা মক্কায় ফিরে গেছে। তাই তিনিও মুসলমানদের নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন।

এ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবী শহীদ হলেন। এঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন আনসার। তাই মদীনার ঘরে ঘরে শোকের বন্যা নেমে এলো। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (স) মুসলমানদেরকে শোক প্রকাশের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বললেন ঃ 'মাতম করা এবং ছাতি পিটিয়ে কান্না-কাটি করা মুসলমানদের পক্ষে মর্যাদা হানিকর।'

www.icsbook.info

বিপর্যয়ের কারণ এবং মুসলমানদের প্রশিক্ষণ

ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটে, তার পিছনে মুনাফিকদের চালবাজি ও কলাকৌশলের প্রভাব ছিলো সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই সঙ্গে মুসলমানদের নিজস্ব দুর্বলতাও কম দায়ী ছিলো না। অবশ্য ইসলামী আন্দোলন যে ধরনের মেজাজ তৈরী করে এবং তার কর্মীদের যে রূপ প্রশিক্ষণ দিতে ইচ্ছুক, তার জন্যে তখনো পুরোপুরি সুযোগ পাওয়া যায়নি। আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করার এ ছিলো দ্বিতীয় সুযোগ মাত্র। তাই এক্ষেত্রে স্বভাবতই কিছু কিছু দুর্বলতা প্রকাশ পেলো। যেমন ঃ সম্পদের মোহে কর্তব্যে অবহেলা করা, নেতার হুকুম অমান্য করা, দুশমনকে পুরোপুরি খতম করার আগে গণীমতের মালের দিকে মনোযোগ দেয়া ইত্যাদি। এ কারণেই যুদ্ধ শেষ হবার পর আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করলেন। এ পর্যালোচনায় ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে যা কিছু দোষ-ত্রুটি বাকী ছিলো, তার প্রতিটি দিককেই তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন এবং সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলীও প্রদান করলেন। সূরা আলে-ইমরানের শেষাংশে এই নির্দেশাবলীর কথা বিবৃত হয়েছে। এখানে তার কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। এ থেকে ইসলামী আন্দোলনে যুদ্ধের স্থান কোথায় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর ওপর কিভাবে আলোকপাত করতে হয়, তা আর একবার উপলব্ধি করা যাবে।

খোদা-নির্ভরতা

মুসলমানরা যখন যুদ্ধের জন্যে যাত্রা করছিলো, তখন তাদের সংখ্যা ছিলো এক হাজারের মতো। পক্ষান্তরে দুশমনের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। এরপরও কিছু দূর গিয়ে তিন শ' মুনাফিক আলাদা হয়ে গেলো। এবার বাকী থাকলো শুধু সাত শ' মুসলমান। তদুপরি যুদ্ধের সামান-পত্র ছিলো কম এবং এক তৃতীয়াংশ সৈন্যও গেলো বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই নাজুক পরিস্থিতিতে কিছু লোকের মনোবল ভেঙে পড়তে লাগলো। এ সময় শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং তাঁর সাহায্যের ওপর ভরসাই মুসলমানদেরকে দুশমনের মুকাবিলায় এগিয়ে নিয়ে চললো। এ উপলক্ষে হযরত মুহাম্মদ (স) মুসলমানদেরকে যে সান্ত্বনা প্রদান করেন, আল্লাহ তা নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখ করেছেন ঃ

اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُوْنَ - وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -
اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ
بَلٰٓى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ

www.icsbook.info

الْمَلٰئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ - وَمَاجَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ -

স্মরণ করো, যখন তোমাদের মধ্যকার দুটি দল নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শনের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলো, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যের জন্যে বর্তমান ছিলেন। আর মুমিনদের তো আল্লাহ্‌র ওপরই ভরসা করা উচিত। এর আগে বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ (তখন) তোমরা খুবই দুর্বল ছিলে। কাজেই আল্লাহ্‌র না শোকরী থেকে তোমাদের বেঁচে থাকা উচিত। আশা করা যায়, এবার তোমরা কৃতজ্ঞ হবে। স্মরণ করো, যখন তুমি (হে নবী) মুমিনদেরকে বলেছিলে ঃ তোমাদের জন্যে এটা কি যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন। নিঃসন্দেহে তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং খোদাকে ভয় করে কাজ করো, তাহলে দুশমনরা তোমাদের ওপর হামলা করতে এলে তোমাদের প্রভু পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমরা যাতে খুশী হও এবং তোমাদের হৃদয় নিশ্চিন্ত হয়, সে জন্যেই আল্লাহ তোমাদের কাছে একথা প্রকাশ করলেন। বিজয় বা সাহায্য যা কিছুই হোক, আল্লাহ্‌র কাছ কাছ থেকেই আসে। তিনি অত্যন্ত শক্তিমান, বিচক্ষণ। (আলে-ইমরান আয়াত ঃ ১২২-১২৬)

এখানে মুসলমানদেরকে শেষ বারের মতো বুঝিয়ে দেয়া হলো যে, প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত শক্তির ওপর ভরসা করা মুসলমানদের কাজ নয়। তাদের শক্তির আসল উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং তাঁর সাহায্যের ওপর ভরসা

ধন-সম্পদের মোহ

ওহুদে মুসলমানদের বিপর্যয়ের আর একটি বড়ো কারণ হলো এই যে, মুসলমানরা যুদ্ধের ঠিক মাঝখানেই সম্পদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো এবং দুশমনকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার আগেই সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলো। এমন কি, যারা সুড়ঙ্গ-পথের প্রহরায় নিযুক্ত ছিলো, তাদের মধ্যে পর্যন্ত দুর্বলতা প্রকাশ পেলো। এভাবে যুদ্ধের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গেলো। তাই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের হৃদয় থেকে ধনের মোহ দূরীভূত করার জন্যে এ সময়ই মোহ সৃষ্টির একটি বড় কারণকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন। অর্থাৎ এ সময় সূদকে হারাম ঘোষণা করা হলো। যারা সূদী কারবার করে, তাদের হৃদয়ে ধনের মোহ এমনি বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তা আর কোনো মহৎ কাজের উপযোগী থাকে না। সূদের ফলেই এক শ্রেণীর লোকের মনে লালসা, কার্পণ্য, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ধনের মোহ সৃষ্টি হয়। আর এক শ্রেণীর মধ্যে জাগ্রত হয় হিংসা দ্বেষ ও ক্রোধ-বিক্ষোভ।

www.icsbook.info

সাফল্যের চাবিকাঠি

যদি মনোবলকে সমুন্নত রাখার জন্যে কোনো ক্রিয়াশীল শক্তি বর্তমান না থাকে, তাহলে পরাজয়ের পর তা হ্রাস পেতে থাকবেই। ওহুদে মুসলমানদের যে পরাজয় ঘটেছিলো, তাতে কিছু লোকের মনোবল ভেঙে পড়ার আশংকা ছিলো। কিন্তু এ সময় মুসলমানদেরকে এই বলে আশ্বাস দেয়া হলো যে,

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ - وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ - اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ -

তোমাদের না নিরুৎসাহ হওয়া উচিত আর না দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। বিজয় তোমাদেরই হবে, যদি তোমরা খাঁটি মুমিন হও, ঈমানের ওপর অবিচল থাকো এবং তার দাবিসমূহ পূর্ণ করতে থাকো। তোমাদের কাজ শুধু এটুকুই; এরপর তোমাদের সমুন্নত করা এবং দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র। এরপর রইলো তোমাদের এই সাময়িক দুঃখ-ক্লেশ ও পরাজয়ের প্রশ্ন। এটা শুধু তোমাদেরই ব্যাপার নয়, তোমাদের বিরুদ্ধ দলের ওপরও এ রকম দুঃখ-মুসিবত এসে থাকে। তারা যখন মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়েও নিরুৎসাহিত হয় না, তখন তোমরা কেন সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে চিন্তা-ভাবনা করো? তোমরা তো জান্নাতের প্রত্যাশী। তোমরা কি মনে করো, এমনিই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ তোমাদের ভেতর কে আল্লাহ্‌র পথে জীবন উৎসর্গ করেছে আর কে তাঁর জন্যে প্রতিকূল অবস্থায়ও ধৈর্য অবলম্বন করতে ইচ্ছুক, আল্লাহ তা এখন পর্যন্ত যাচাই-ই করেননি।

(আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৩৯—১৪২)।

ইসলামী আন্দোলনের প্রাণবস্তু

পৃথিবীর যে কোনো আন্দোলনেই তার প্রাণবস্তু কিংবা চালিকা-শক্তিরূপে একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব বর্তমান থাকে। কিন্তু আদর্শবাদী আন্দোলনের উন্নতি বা স্থায়িত্ব কোনো ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং যে নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে এ আন্দোলন উত্থিত হয়, তার দৃঢ়তা ও সত্যতার ওপরই এর সবকিছু নির্ভর করে। ইসলামী আন্দোলনের জন্যে নবীদের ব্যক্তিত্ব কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও

www.icsbook.info

এটি একটি আদর্শবাদী আন্দোলন এবং এর উন্নতি ও স্থায়িত্ব সম্পূর্ণত ইসলামের উপস্থাপিত নীতিমালার ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে মুসলমানদের এ কথা জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন হলো যে, নবীর মহান ব্যক্তিত্ব তাদের ভেতর বর্তমান থাকলেই কেবল তারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের ঝাণ্ডা সমুন্নত করবে এবং নবীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হলে অমনি তারা এ পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে, এরূপ ধারণা যেনো তাদের মনের কোণেও ঠাঁই পায় । ইতঃপূর্বে ওহুদের ময়দানে যখন এই মর্মে গুজব প্রচারিত হলো যে, হযরত মুহাম্মদ (স) শহীদ হয়ে গেছেন, তখন কিছু মুসলমানের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়েছিলো। তারা ভেবেছিলো ঃ হযরতের ছায়াই যখন চলে গেলো, তখন আর যুদ্ধ করে কি হবে! এই ভুল ধারণা দূর করার জন্যেই এই সময় মুসলমানদের বুঝিয়ে দেয়া হলো ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِئِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ -

দেখো, মুহাম্মদ (স) একজন রাসূল বৈ কিছু নন। তাঁর আগেও অনেক রাসূল চলে গেছেন। এখন তিনি যদি মরে যান কিংবা নিহত হন, তাহলে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করবে? মনে রেখো, যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করবে সে আল্লাহ্‌র কোনোই ক্ষতি করবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে জীবন যাপন করবে, তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন।'

(আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৪৪)।

আরো বলা হলো ঃ 'তোমরা যে দ্বীনকে বুঝে-শুনে গ্রহণ করেছো, তার ওপর অবিচল থাকার এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তোমাদের মধ্যে হামেশা নবীর উপস্থিত থাকার কোনোই প্রয়োজন নেই। এতো শুধু তোমাদেরই মঙ্গল এবং কল্যাণের সওদা মাত্র। এর ওপর অবিচল থাকলে তোমরা নিজেরাই সুফল পাবে। এ দ্বীনের আসল শক্তি হচ্ছে এর উপস্থাপিত সত্যতা। এর সমুন্নতি না তোমাদের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর আর না কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল'।

দুর্বলতার উৎস-১

মানুষের সমস্ত দুর্বলতার উৎস হচ্ছে মৃত্যু-ভয়। তাই এ সময় মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো যে, তোমাদের মৃত্যু-ভয়ে পলায়ন করা নিতান্তই অর্থহীন। কারণ মৃত্যুর জন্যে নির্ধারিত সময় না আসা পর্যন্ত কোনো প্রাণীরই মৃত্যু হতে পারে না। অন্য কথায়, আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময়ের আগে না কেউ মরতে পারে আর না তারপর এক মুহূর্তও কেউ বেঁচে থাকতে পারে। অতএব, তোমাদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার চিন্তা

www.icsbook.info

করার প্রয়োজন নেই; বরং জীবনের যেটুকু অবকাশ পাওয়া গেছে, তা কি দুনিয়াদারিতে ব্যয়িত হচ্ছে না আখিরাতের কাজে, তা-ই শুধু চিন্তা করা উচিত। কারণ যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়াদারির জন্যে তার শ্রম-মেহনত নিয়োজিত করে, তার যা কিছু প্রাপ্য তা দুনিয়ায়ই পেয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি আখিরাতের কল্যাণের জন্যে কাজ করে, আল্লাহ্ তাকে আখিরাতেই প্রতিফল দান করবেন। কাজেই, যারা আল্লাহ্‌র দ্বীন কবুল করার, এর ওপর কায়েম থাকার এবং একে কায়েম করবার চেষ্টা-সাধনার সুযোগ পেয়েছে, তাদের পক্ষে এই মহা মূল্যবান নিয়ামতটিরই কদর করা এবং এর জন্যেই নিজেদের সবকিছু নিয়োজিত করা উচিত। এর ফলাফল অবশ্যই তাদের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হবে; আখিরাতের স্থায়ী সাফল্য তারা অর্জন করবে। আর এই নিয়ামতের যারা শোকর আদায় করবে, আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম নিয়ামত দ্বারা কৃতার্থ করবেন। তারা আপন মালিকের কাছ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত হবে।

www.icsbook.info

১০
ওহুদের বিপর্যয়ের পর

আগেই বলা হয়েছে যে, আরবের দু-একটি গোত্র ছাড়া বাদবাকী সমস্ত গোত্রই এই নবোদ্ভিত ইসলামী আন্দোলনের বিরোধী ছিলো। কারণ, এ আন্দোলন তাদের পৈত্রিক ধর্ম ও রসম-রেওয়াজের ওপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানছিলো। সেই সঙ্গে মানুষ নৈতিক দিক থেকে উন্নত হোক এবং জুয়া, ব্যভিচার, মদ্যপান, লুটতরাজ ইত্যাকার প্রচলিত দুষ্কৃতি পরিত্যাগ করুক, এ-ও ছিলো এ আন্দোলনের দাবি। তাই বদর যুদ্ধের আগে এই নয়া আন্দোলনকে ধ্বংস করার বিষয়ে অনেক গোত্রই চিন্তা-ভাবনা করছিলো। কিন্তু বদরে কুরাইশরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার ফলে তারা কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়লো এবং এর পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দিলো। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধের পর পুনরায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। এবার আরবের বহু গোত্রই ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালো। এ ধরনের কয়েকটি গোত্রের ভূমিকা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

বিভিন্ন গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা

১. চতুর্থ হিজরীর মুহাররম মাসে কাতান এলাকার জুফায়দ নামক একটি গোত্র মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করলো। হযরত মুহাম্মদ (স) এদের মুকাবিলার জন্যে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে হযরত আবু সালামাকে প্রেরণ করলেন। শেষ পর্যন্ত আক্রমনকারীরা পালিয়ে গেলো।

২. এরপর ঐ মাসেই লেহ্‌ইয়ান নামক কুহিস্তান আ'রনার একটি গোত্র মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত করলো। তাদের মুকাবিলার জন্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন্ আনীস (রা)-কে প্রেরণ করা হলো। অবশেষে তাদের সর্দার সুফিয়ান নিহত হলো এবং আক্রমণকারীরা ফিরে গেলো।

৩. একই বছর সফর মাসে কালাব গোত্রের প্রধান আবু বারাআ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললো ঃ 'আমার সঙ্গে কতিপয় লোক পাঠিয়ে দিন; আমার কওমের লোকেরা ইসলামের দাওয়াত শুনতে চায়।' হযরত মুহাম্মদ (স) তার সঙ্গে সত্তর জন সাহাবী পাঠিয়ে দিলেন। এদের অনেকেই ছিলেন সুফ্‌ফার[৪২] সঙ্গে

৪২. আরবীতে উঁচু চত্বরকে সুফ্‌ফা বলা হয়। মসজিদে নববীর ভেতরে এইরূপ একটি চত্বর নির্মিত হয়েছিলো। যে সব সাহাবীর ঘর-বাড়ী কিছুই ছিলো না, তারা এই চত্বরের ওপর বাস করতেন। এঁরা জংগল থেকে জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অন্য সাহাবীরাও এঁদেরকে সাহায্য করতেন। এদের প্রধান কাজ ছিলো দ্বীনী ইল্‌ম চর্চা করা এবং ইবাদত-বন্দেগীতে মশ্‌গুল থাকা।

www.icsbook.info

সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ঐ গোত্রের শাসনকর্তা আ'মের বিন্ তুফাইল এদেরকে ঘেরাও করে হত্যা করলো। এই ঘটনায় হযরত মুহাম্মদ (স) যারপরনাই মনোকষ্ট পেলেন। তিনি সমগ্র মাসব্যাপী ফজরের নামাযের পর ঐ জালিমদের জন্য বদ্‌দো'আ করলেন। এই সত্তর জন সাহাবীর মধ্যে মাত্র হযরত আ'মর বিন উমাইয়া নামক একজন সাহাবীকে আ'মের এই বলে মুক্তি দিলো যে, 'আমার মা একটি গোলাম মুক্ত করার মান্নত করেছিলো; যা এই মান্নত হিসেবে তোকেই আমি মুক্তি দিলাম।'

হযরত আম'র বিন উমাইয়া যখন ফিরে আসছিলেন তখন আ'মের গোত্রের দুজন লোকের সঙ্গে তাঁর পথে দেখা হলো। তিনি তাদেরকে হত্যা করলেন। মনে মনে ভাবলেন, আ'মের গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতার কিছু প্রতিশোধ তো গ্রহণ করা হলো। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) এ ঘটনার কথা জানতে পেরে খুব অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কারণ এই গোত্রের লোকদেরকে তিনি ইতোমধ্যে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং এ ঘটনা ছিলো সেই প্রতিশ্রুতির খেলাফ। তাই হযরত মুহাম্মদ (স) এ দু'জন লোকের হত্যার ক্ষতিপূরণ দানের কথা ঘোষণা করলেন।

এভাবে আরো দুটি গোত্র বিশ্বাসঘাতকতা করলো। হযরত মুহাম্মদ (স) তাদের কথা অনুযায়ী দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের জন্যে দশজন সাহাবীকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু ঐ জালিমরা বিশ্বাসঘাতকতা করলো। এর মধ্যে সাতজন সাহাবী কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করে শহীদ হলেন। বাকী তিনজন বন্দী হলেন। এদের মধ্যে হযরত খুবাইব (রা) এবং হযরত জায়েদ (রা)ও ছিলেন। দুশমনরা এদেরকে মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দিলো। হযরত খুবাইব (রা) ওহুদের যুদ্ধে হারেস বিন আ'মের নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। হারেসের পুত্রগণ পিতৃহত্যার বদলা নেবার জন্যে হযরত খুবাইব (রা)-কে কিনে নিলো। কয়েকদিন পর কাফিরদের হাতে তিনি শহীদ হলেন। অনুরূপভাবে সুফিয়ান বিন্ উমাইয়া নামক এক ব্যক্তি হযরত জায়েদ (রা)-কে নিয়ে হত্যা করলো।

এভাবে আরবের বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে মুসলমানদের নিয়মিত সংঘর্ষ চলছিলো। এতে বিরুদ্ধবাদীরাই একতরফাভাবে নির্মমতার পরিচয় দিচ্ছিলো আর মুসলমানরা তাদের উৎপীড়ন সয়ে যাচ্ছিলো। এই সময় ইহুদীদের সঙ্গেও সম্পর্কের অবনতি মুসলমানদের জন্যে যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ালো।

ইহুদী আলেম ও পীরদের বিরোধিতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনায় আসার পর হযরত মুহাম্মদ (স) ইহুদী গোত্রগুলোর সঙ্গে নানারূপ চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন এবং তাদের জান-মালের কোনো ক্ষতি না করার ও তাদেরকে সর্বপ্রকার ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। তথাপি ইসলামী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান উন্নতিতে ইহুদী আলেম ও পীরগণ

www.icsbook.info

বিশেষভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলো। এর অবশ্য কতকগুলো কারণও ছিলো। নিম্নে তার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যাচ্ছে।

১. ধর্মীয় দিক থেকে এ পর্যন্ত ইহুদীদের এক প্রকার অহমিকা ছিলো। খোদাপরস্তি ও দ্বীনদারির দিক দিয়ে সবাই তাদেরকে শ্রদ্ধার পাত্র বলে গণ্য করতো। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের প্রসারের ফলে তাদের এই ভ্রান্ত ধার্মিকতা ও পেশাদারী খোদাপরস্তির মুখোশ খসে পড়লো। সত্যিকার ধার্মিকতা কাকে বলে এবং যথার্থ খোদাপরস্তির তাৎপর্য কি, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বক্তব্য শুনে লোকেরা তা জানতে পারলো। ফলে ইহুদী আলেম ও পীরদের 'ধর্ম ব্যবসায়ে' মন্দাভাব দেখা দিলো।

২. কুরআন শরীফে ইহুদী জনগোষ্ঠী, বিশেষভাবে তাদের আলেম ও ধার্মিক শ্রেণীর লোকদের নৈতিকতা ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে খোলাখুলি সমালোচনামূলক আয়াত নাযিল হচ্ছিলো। যেমন ঃ 'তারা মিথ্যা কথা শ্রবণকারী এবং হারাম মাল ভক্ষণকারী' (সূরা মায়েদা ঃ ৪২), 'তুমি এদের অধিকাংশকেই দেখবে পাপাচার ও সীমালংঘনের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছে' (সূরা মায়েদা ঃ ৬২), 'এরা সূদখোর, অথচ এদের জন্যে সূদ নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো', 'এরা লোকদের ধন-মাল খেয়ে ফেলে' (সূরা নিসা ঃ আয়াত ১৬১) ইত্যাদি। এছাড়া বাকারা, মায়েদা, আলে-ইমরান প্রভৃতি সূরায় এ ধরনের আরো বহু মন্তব্য বিধৃত হয়েছে। এসব মন্তব্য শুনে মাত্র কতিপয় সত্যসন্ধ লোক ছাড়া তাদের বেশির ভাগ লোকই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো এবং অন্ধভাবে ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতায় লেগে গেলো।

৩. ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে তারা স্পষ্টত আশংকাবোধ করছিলো যে, একদিন না একদিন এর সামনে তাদের মাথা নত করতে হবেই।

এসব কারণেই ইহুদীরা ইসলামী আন্দোলনের ঘোরতর দুশমন বনে গেলো।

বনী কায়নুকার যুদ্ধ

বদরে মুসলমানদের জয়লাভের পরই ইহুদীদের সর্বপ্রথম চৈতন্যোদয় হলো। তারা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করলো যে, ইসলাম একটি অপরাজেয় শক্তির রূপ পরিগ্রহ করে চলেছে। তাই বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরই—দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে—ইহুদীদের বনী কায়নুকা গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো এবং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভেঙে দিলো। এই যুদ্ধের একটি মুখ্য কারণ ছিলো এই ঃ এক ইহুদী জনৈক মুসলিম মহিলার শ্লীলতাহানি করে। এ ঘটনায় উক্ত মহিলার স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে একজন ইহুদীকে মেরে ফেলে। এরপর ইহুদীরা একজন মুসলমানকে হত্যা করে। হযরত মুহাম্মদ (স) বিষয়টির আপোষ-রফার চেষ্টা করলেন।

www.icsbook.info

কিন্তু ইহুদীরা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বললো ঃ 'আমরা বদরে পরাজিত কুরাইশ নই। আমাদের সঙ্গে যখন বেধে গেছেই, তখন যুদ্ধ কাকে বলে তা আমরা দেখিয়ে দেবো।'

এভাবে চুক্তির অমর্যাদা করে ইহুদীরা যখন যুদ্ধের হুংকার ছাড়লো, তখন হযরত মুহাম্মদ (স)-ও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিলেন। ইহুদীরা একটি কিল্লার মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করলো। কিল্লাটি পনেরো দিন অবরোধের পর স্থির করা হলো যে, ইহুদীদের নির্বাসিত করা হবে। ফলে সাত শ' ইহুদীকে নির্বাসিত করা হলো।

কা'ব বিন আশরাফের হত্যা

কা'ব বিন আশরাফ ছিলো ইহুদীদের একজন খ্যাতনামা কবি। সে যুগে কবিদের অত্যন্ত প্রভাব ছিলো। তাই বদর যুদ্ধের পর এই লোকটি এমন উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা রচনা করতে লাগলো যে, মক্কায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগুন জ্বলে উঠলো। বদর যুদ্ধে নিহতদের সম্পর্কে সে অত্যন্ত দরদপূর্ণ মর্সিয়া রচনা করলো এবং মক্কায় গিয়ে তা লোকদেরকে শোনাতে লাগলো। লোকেরা তা শুনে ছাতি পিটিয়ে কাঁদতে লাগলো। অতঃপর সে মদীনায় এসে হযরত মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে নানারূপ আপত্তিকর কবিতা রচনা করলো এবং তাঁর বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করতে লাগলো। এমন কি, একবার একটি নিমন্ত্রণের ভাব করে সে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করলো। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লোকটি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। অবশেষে তাঁর সম্মতিক্রমে তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে মুহাম্মদ বিন মুসলিমা (রা) কা'ব বিন্ আশরাফকে হত্যা করেন।[৪৩]

বনু নযীরের নির্বাসন

বনু নযীর গোত্রের ইহুদীগণ কয়েকটি ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। তারাও হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কয়েকবার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। এ উদ্দেশ্যে মক্কার কুরাইশরাও তাদেরকে উস্কানি দিলো। তাদের এই আচরণ যখন সীমা অতিক্রম করে গেলো, তখন হযরত মুহাম্মদ (স) তাদের কিল্লা অবরোধ করে ফেললেন। এই অবরোধ ১৫৫ দিন পর্যন্ত অব্যাহত রইলো। অবশেষে তারা এই মর্মে

৪৩. এখানে স্মর্তব্য যে, কা'ব বিন্ আশরাফকে হত্যার অনুমতি দান কোনো ব্যক্তি বা দল-বিশেষের খেয়ালখুশীর ব্যাপার ছিলো না। এ অনুমতির সময় রাসূল করীম (স) ছিলেন মদীনায় স্থাপিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান এবং সে রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ও সেনাবাহিনীরও সর্বোচ্চ ব্যক্তি। সুতরাং ইসলামী আইন অনুসারে অশান্তি ও রক্তপাতের উস্কানিদাতা একজন ঘৃণ্য অপরাধীকে হত্যার অনুমতি দান ছিলো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ বিধিসম্মত। কোনো ব্যক্তি বা দল-বিশেষের পক্ষে একে হত্যার লাইসেন্স হিসেবে গ্রহণ করা এবং ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রকেই হত্যার প্ররোচনা দান কোনোক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না।—সম্পাদক

www.icsbook.info

সন্ধি করলো যে, উটের পিঠে চাপিয়ে যতটুকু সম্ভব, ততোটুকু মাল-পত্র নিয়ে তারা মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। এই সন্ধি অনুযায়ী তাদের বহু সর্দার খায়বর চলে গেলো। তারা নিজেদের সঙ্গে বহু সামান-পত্র নিয়ে গেলো। যে সব সামান তারা নিতে পারেনি তা-ই শুধু ফেলে গেলো।

এবার মুসলমানদের উভয় দুশমন অর্থাৎ মুশরিক আরব (বিশেষত মক্কার কুরাইশ) এবং ইহুদীগণ মিলে ইসলামকে ধ্বংস করার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলো। অবশেষে তারা সবাই মিলে মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিল এবং এর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে দিলো। প্রথম দিকে হযরত মুহাম্মদ (স) এই প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে তাদের মুকাবিলার জন্যে মুসলমানদের একটি বাহিনী নিয়ে কিছু দূর অগ্রসরও হয়েছিলেন। কিন্তু দুশমনরা মুকাবিলা না করে পালিয়ে গেলো। এভাবে পঞ্চম হিজরীর মুহররম মাসে একবার তিনি 'জাতুরাকা' এবং রবিউল আউয়াল মাসে আর একবার 'দ্‌মমাতুল জুন্‌দল' পর্যন্ত অভিযান চালালেন।

www.icsbook.info

১১
খন্দকের যুদ্ধ

মদীনা থেকে বেরিয়ে খায়বর গিয়ে বনু নযীর গোত্রের লোকেরা ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তারা আশপাশের গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুললো। মক্কায় গিয়ে কুরাইশদেরকে তারা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করলো এবং এই মর্মে প্রস্তাব দিলো যে, সবাই মিলে এক সঙ্গে হামলা করলে এই নয়া আন্দোলনকে খুব সহজে ধ্বংস করে দেয়া যাবে। কুরাইশরা এরূপ প্রস্তাবের জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। অবশেষে ইহুদী ও কুরাইশদের সমবায়ে প্রায় দশ হাজার লোকের এক বিরাট বাহিনী গঠিত হলো।

হযরত মুহাম্মদ (স) মদীনা আক্রমণের এই বিপুল আয়োজন সম্পর্কে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারেসী (রা) পরামর্শ দিলেন যে, এতো বড়ো বাহিনীর সঙ্গে খোলা ময়দানে মুকাবিলা করা সমীচীন হবে না। আমাদের সৈন্যদেরকে মদীনার নিরাপদ স্থানেই থাকতে হবে এবং দুশমনরা যাতে সরাসরি হামলা করতে না পারে, সেজন্যে নগরীর চারদিকে পরিখা (খন্দক) খনন করতে হবে।৪৪ এই অভিমতটি সবার মনোপুত হলো এবং পরিখা খননের প্রস্তুতি চলতে লাগলো।

খন্দকের প্রস্তুতি

মদীনার তিন দিক ঘর-বাড়ি ও খেজুর বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত আর একদিক মাত্র উন্মুক্ত ছিলো। হযরত মুহাম্মদ (স) তিন হাজার সাহাবী নিয়ে সে উন্মুক্ত দিকেই পরিখা খননের আদেশ দিলেন। পঞ্চম হিজরীর ৮ জিলকদ এই খনন কার্য শুরু হলো। হযরত মুহাম্মদ (স) নিজে পরিখার খনন কাজ উদ্বোধন করলেন এবং প্রতি দশজন লোকের মধ্যে দশ গজ ভূমি বন্টন করে দিলেন। পরিখার প্রস্থ পাঁচ গজ এবং গভীরতা পাঁচ গজ। বিশ দিনে তিন হাজার মুসলমান এ বিরাট পরিখা খনন করে ফেললেন। পরিখা খননকালে হযরত মুহাম্মদ (স) সকল লোকের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত রইলেন। ঘটনাক্রমে এক জায়গায় একটি বিরাটাকার পাথর সামনে পড়লো। সেটাকে কোনো প্রকারেই ভাঙা যাচ্ছিলো না। হযরত মুহাম্মদ (স) সেখানে গিয়ে এরূপ জোরে কোদাল মারলেন যে, পাথরটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। এ ঘটনাও নবী করীম (স)-এর একটা বিশিষ্ট মু'জিযা।

---

৪৪. এ যুদ্ধকে পরিখা যুদ্ধও বলা হয়। এতে মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্যে পরিখা খনন করা হয়। এর অপর নাম হচ্ছে জঙ্গে আহযাব। আরবীতে আহযাব বলা হয় একাধিক বাহিনীকে। যেহেতু এতে কাফিরদের একাধিক বাহিনী সম্মিলিত হয়েছিলো, এ জন্যেই একে আহযাব বলা হয়।

www.icsbook.info

কাফিরদের হামলা

কাফিরদের সৈন্য বাহিনী তিন দলে বিভক্ত হয়ে তিন দিক থেকে মদীনার ওপর হামলা করলো। এই হামলা ছিলো অত্যন্ত প্রচণ্ড ও ভয়াবহ। কুরআন পাকে নিম্নোক্ত ভাষায় এই হামলার চিত্র আঁকা হয়েছে ঃ

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا- هُنَالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا -

যখন দুশমনরা ওপর (পূর্ব) ও নীচের (পশ্চিম) দিক থেকে তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, যখন চক্ষু ফেটে যাবার উপক্রম হলো এবং কলিজা মুখের কাছে আসতে লাগলো আর তোমরা খোদা সম্পর্কে নানারূপ সন্দেহ করতে লাগলে, ঠিক তখন মুমিনদের পরীক্ষার সময় এলো এবং তীব্রভাবে ভূ-কম্পন সৃষ্টি হলো।

(সূরা আহযাব ঃ আয়াত ১০-১১)

এটা ছিলো বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার সময়। একদিকে প্রচণ্ড শীতকাল, খাদ্য-দ্রব্যের অভাব, উপর্যুপরি কয়েক বেলা অনশন, রাতের নিদ্রা আর দিনের বিশ্রাম উধাও, প্রতিটি মুহূর্ত জীবনের ভয়, মালমাত্তা ও সন্তানাদি দুশমনের আঘাতের মুখে আর অন্যদিকে বেশুমার শত্রু সৈন্য। এমনিতরো সংকটাবস্থায় যাদের ঈমান ছিলো সাচ্চা ও সুদৃঢ়, কেবল তারাই সত্যের পথে অবিচল থাকতে পারছিলো। দুর্বল ঈমানদার ও মুনাফিকগণ এ পরিস্থিতির আদৌ মুকাবিলা করতে পারছিলো না; বরং মুসলমানদের সমাজ-সংগঠনে যে সব মুনাফিক অনুপ্রবেশ করেছিলো, তারা এ সময় খোলাখুলিভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। তারা বলতে শুরু করলো ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের কাছে বিজয় ও সাহায্যের যে ওয়াদা করেছিলেন, তা সম্পূর্ণ ধোকা।' (আহযাব ঃ আয়াত ১২)। এর পাশাপাশি তারা নিজেদের জান বাঁচানোর জন্যে নানারূপ বাহানা তালাশ করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো ঃ 'হে মদীনাবাসী! ফিরে চলো, আজ আর তোমাদের রক্ষা নেই।' তারা নবী করীম (স)-এর সামনে এসে বলতে শুরু করলো ঃ 'আমাদেরকে ঘর-বাড়িতে থেকে আত্মরক্ষা করার অনুমতি দিন; আমাদের বাড়ি-ঘর সম্পূর্ণ অরক্ষিত।' (আহযাব ঃ আয়াত ১৪)।

কিন্তু যাদের ভেতর যথার্থ ঈমান ছিলো এবং যারা ঈমানের দাবিতে ছিলো সত্যবাদী, এ সময় তাদের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা কাফিরদের সৈন্য-সামন্ত দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলো ঃ

www.icsbook.info

وَلَمَّا رَاَالْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَاوَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَازَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا - مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوااللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا -

আল্লাহ এবং রাসূল তো আমাদের সঙ্গে এরই (অবস্থার) ওয়াদা করেছিলেন। পরন্তু এ অবস্থা দেখে তাদের ভেতর ঈমানের ভাবধারা আরো সতেজ হয়ে উঠলো এবং অধিকতর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতার জন্যে তারা প্রস্তুত হলো। এই কঠিন অবস্থা তাদের ভেতরে অনু পরিমাণও পরিবর্তন ঘটাতে পারলো না।

(সূরা আহযাব ঃ ২২ ও ২৩ আয়াত)

দুশমনরা প্রায় এক মাসকাল মদীনা অবরোধ করে রইলো। এই অবরোধ এতো কঠিন ছিল যে, মুসলমানদেরকে একাধিক্রমে তিন-চার বেলা পর্যন্ত অনশনে কাটাতে হলো। এভাবে অবরোধ অত্যন্ত কঠিন ও বিপজ্জনক রূপ পরিগ্রহ করলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবরোধকারীরা কিছুতেই পরিখা পার হতে পারলো না। এ কারণে তারা অপর পারেই অবস্থান করতে লাগলো। হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর সৈন্যদেরকে পরিখার বিভিন্ন স্থানে মোতায়েতেন করলেন। কাফিররা বাহির থেকে পাথর ও তীর ছুঁড়তে লাগলো। এদিক থেকেও তার প্রত্যুত্তর দেয়া হলো। এরই ভেতর বিক্ষিপ্তভাবে দু-একটি হামলাও চলতে লাগলো। কখনো কখনো কাফিরদের আক্রমণ এতো তীব্রতর রূপ ধারণ করতে লাগলো যে, তাদেরকে পরিখার এপার থেকে প্রতিহত করার জন্যে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করতে হলো। এমন কি এর ফলে দু-একবার নামায পর্যন্ত কাযা হয়ে গেলো।

আল্লাহ্‌র সাহায্য

অবরোধ যতো দীর্ঘায়িত হলো, হানাদারদের উৎসাহও ততোটা হ্রাস পেতে লাগলো। দশ-বারো হাজার লোকের খানাপিনার ব্যবস্থা করা মোটেই সহজ কাজ ছিলো না। তদপুরি ছিলো প্রচন্ড শীত। এরই মধ্যে একদিন এমনি প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইলো যে, কাফিরদের সমস্ত ছাউনি উড়ে গেলো। তাদের সৈন্য-সামন্ত ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলো। তাদের ওপর যেন খোদার মূর্তিমান আযাব নেমে এলো। আর বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্যে রহমত এবং কাফিরদের জন্যে আযাব হিসেবেই এই ঝড় প্রেরণ করেছিলেন। এই ঘটনাকে আল্লাহ তাঁর একটি অনুগ্রহরূপে আখ্যায়িত করে বলেছেন ঃ

www.icsbook.info

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا -

হে মুমিনগণ! খোদার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের ওপর সম্মিলিত বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো আর আমি তাদের ওপর প্রচন্ড ঝঞ্ঝা বইয়ে দিলাম এবং এমন সৈন্য (ফেরেশতা) পাঠালাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি।

(সূরা আহযাব ঃ আয়াত ৯)।

তাই কাফিরগণ এ পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে পারলো না। তাদের মেরুদণ্ড অচিরেই ভেঙে পড়লো। অবস্থা বেগতিক দেখে ইহুদীরা আগেই কেটে পড়েছিলো। এখন বাকী রইলো শুধু কুরাইশরা। তাই তাদেরও ফিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। এভাবে শুধু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং তাঁর অদৃশ্য সাহায্যে মদীনার আকাশে ঘনীভূত ঘনঘটা আপনা-আপনি কেটে গেলো। কুরআন মজীদে এই যুদ্ধের কাহিনী যে ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে এবং তাতে মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্যে যে সব উপাদান রয়েছে, তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ওপর ভরসা

মুমিনের প্রত্যয় হচ্ছে এই যে, প্রকৃত শক্তি আল্লাহ্‌র হাতে নিবদ্ধ। বিশ্বজাহানে যা কিছু ঘটে, তা শুধু তাঁরই অভিপ্রায় ও হুকুম অনুসারে ঘটে থাকে। মুমিন তার কোনো সাফল্যকেই আপন চেষ্টা-সাধনা বা নিজস্ব শক্তির ফল মনে করে না; বরং তাকে মনে করে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ (ফযল)। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ঃ খন্দক যুদ্ধের সময় দশ-বারো হাজার কাফির সৈন্য তিন হাজার মুসলমানের কোনোই ক্ষতি করতে পারলো না; বরং তাদেরকে দিশেহারা হয়ে ফিরে যেতে হলো। এই পরিস্থিতিকে কিছু মুসলমান হয়তো নিজেদের চেষ্টা-তদবিরের (পরিখা খননের) ফল মনে করতে পারতো। আর চেষ্টা-তদবির নিয়ে বড়াই করার এ একটি মোক্ষম সুযোগও ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এই দুর্বলতা থেকে বাঁচানোর জন্যে পূর্বাহ্নে ইরশাদ করলেন ঃ 'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যখন তোমাদের ওপর সম্মিলিত বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এবং আমরা তাদের ওপর প্রচন্ড ঝড় বইয়ে দিলাম আর এমন সৈন্য পাঠালাম, যা তোমরা দেখত পাওনি'। (আহযাব ঃ ৯)।

বস্তুত ইসলামী আন্দোলনের অনুবর্তীদের জন্যে এরূপ নৈতিক প্রশিক্ষণই একান্ত প্রয়োজন। তাদের প্রতি মুহূর্ত এটা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যতো বড়োই হোক না কেন, তারা শুধু আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ওপরই ভরসা করবে এবং তাঁকেই সমস্ত কাজের নিয়ামক মনে করে দ্বীন-ইসলামের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকবে।

www.icsbook.info

ঈমানের দাবি যাচাই

মানুষের ঈমানের পরীক্ষা হয় দুঃখ-কষ্ট ও মুসিবতের সময়। তখন সে নিজে যেমন নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারে, তেমনি অপরেও আন্দাজ করতে পারে যে, এই পথে সে কতোখানি অবিচল থাকতে সক্ষম। স্বাভাবিক অবস্থায় বহু লোক সম্পর্কেই এটা অনুমান করা যায় না যে, উদ্দেশ্যের প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা ও জীবন পণ করার সংকল্পে তারা বাস্তবিকই কতোটা প্রস্তুত, বরং কখনো কখনো তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে একটা ধোকায় পড়ে থাকে। কিন্তু যখন কোনো সংকটকাল আসে, তখন আসল ও মেকীর পার্থক্যটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। খন্দক যুদ্ধ এই কাজটিই করেছে। মদীনার মুসলমানদের দলে এক বিরাট সংখ্যক মুনাফিক ও মেকী ঈমানদার ঢুকে পড়েছিলো। তাদের সত্যিকার পরিচয়টা সাধারণ মুসলমানদের সামনে উদ্ঘাটন করার প্রয়োজন ছিলো। তাই এই সংকটের মাধ্যমে তাদের মুখোসটি খসে পড়লো। ক্রমাগত পরিখা খনন করা, খানাপিনা ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে রাত-দিন একাকার করে দেয়া, একটি বিরাট বাহিনীর মুকাবিলার জন্যে জীবন হাতে নিয়ে তৈরী থাকা, সর্বোপরি কুড়ি-বাইশ দিন পর্যন্ত ক্রমাগত ভীতি ও শংকার মধ্যে রাতের ঘুম ও দিনের বিশ্রাম হারাম করে দেয়া কোনো সহজ কাজ ছিলো না। যাদের দিলে সাচ্চা ঈমানের অভাব ছিলো, তারা এই সংকটের মুকাবিলা করতে পারলো না। তাদের অনেকেই বরং বলতে লাগলো ঃ 'রাসূল আমাদের কাছে বিজয় ও সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন; কিন্তু এখন তো দেখছি হাওয়া ঘুরে যাচ্ছে। আমরা বুঝতে পেরেছি, আল্লাহ ও রাসূল আমাদের কাছে যে ওয়াদা করেছিলেন তা নিছক একটি ধোকা মাত্র।' (আহযাব)। কিছু লোক আবার নানারকম বাহানা তালাশ করে ফিরছিলো। তারা আপন ঘর-বাড়ির হেফাজতের বাহানায় ময়দান থেকে সরে পড়লো। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র যে সব বান্দাহ সাচ্চা ঈমানের অধিকারী ছিলো, তারা এ অবস্থায় স্বতন্ত্র ঃ ভূমিকা গ্রহণ করলো। তারা শত্রু সৈন্যদেরকে এগিয়ে আসতে দেখেই বলতে লাগলো ঃ 'ঠিক ঠিক এমনি অবস্থার কথাই আল্লাহ এবং রাসূল আমাদেরকে আগে জানিয়েছিলেন, আল্লাহ ও রাসূল তো এরই ওয়াদা করেছিলেন আমাদের কাছে। আল্লাহ ও রাসূল তো সত্য কথাই বলেছেন। এই অবস্থায় তাদের ভেতর ঈমানের শক্তি আরো বৃদ্ধি পেলো এবং তারা অধিকতর আনুগত্য ও ফর্মাবরদারির জন্যে প্রস্তুত হলো।' (আহযাব)

দুর্বলতার উৎস—২

জান ও মালের ক্ষতির আশঙ্কা হচ্ছে মানুষের সবচাইতে বড়ো দুর্বলতা; বরং বলা চলে, সমস্ত দুর্বলতার মূল উৎস। আল্লাহ্‌র সত্ত্বা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে ইসলাম যে ধরনের ঈমান আনার দাবি জানায়, তাতে মূলগতভাবে এই আকীদা শামিল রয়েছে যে, জীবন-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি সবকিছুই আল্লাহ্‌র হাতে নিবদ্ধ। অপর কোনো শক্তি

www.icsbook.info

মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে পারে না। এমনি প্রত্যয় এবং এমনি ঈমানই হচ্ছে শক্তির মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি যতোটা দুর্বল হবে, মুসলমানের প্রতিটি কাজে ততোটা দুর্বলতাই প্রকাশ পাবে। তাই এই দুর্বলতাকে দূর করার জন্যে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হলো ঃ 'হে নবী! তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা যদি মৃত্যু বা হত্যার ভয়ে পালাতে চাও তো পালিয়ে দেখ; এরূপ পলায়নে তোমাদের কোনোই ফায়দা হবে না। তাদেরকে আরো বলে দিন যে, (তারা চিন্তা করে দেখুক) আল্লাহ যদি তাদের কোনো ক্ষতি করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে তাদেরকে আর কে বাঁচাতে পারে? আর যদি আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেন তাদের কোনো উপকার করার, তাহলে তাঁকে আর কে প্রতিরোধ করতে পারে? (তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে,) আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে না পাবে পৃষ্ঠপোষক আর না পাবে মদদ্‌গার।' (আহযাব ঃ আয়াত ১৭)।

রাসূলের অনুকরণীয় আদর্শ

এই যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যেই মুসলমানদেরকে এ কথা জানিয়ে দেয়া হলো যে, রাসূল (স)-এর জীবন হচ্ছে তোমাদের জন্যে অনুকরণীয় আদর্শ। তবে যারা আল্লাহ তা'আলার দীদার এবং আখিরাতের প্রাপ্য পুরস্কারের প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহ্‌কে খুব বেশি পরিমাণ স্মরণ করে, এ আদর্শ থেকে কেবল তারাই ফায়দা হাসিল করতে পারে। এ প্রসঙ্গে ইসলামপন্থীদের মনোবল বজায় রাখা এবং চরম সংকটকালে তাদের অন্তরকে সুদৃঢ় রাখার জন্যে পূর্ণ ধৈর্য-স্থৈর্য, কঠোর সংকল্প ও খোদা-নির্ভরতার কিছু নমুনা পেশ করা হলো। যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে বাস্তবে কায়েম করতে ইচ্ছুক এবং এ উদ্দেশ্যেই এ পথের অগ্রপথিক, খোদার সেইসব বান্দার জন্যে এ নমুনা কিয়ামত পর্যন্ত অনুকরণযোগ্য হয়ে থাকবে। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ নমুনা তাদের সামনে রাখা উচিত। কারণ এ-ই হচ্ছে তাদের জন্যে প্রকৃত আলোকবর্তিকা।

বনু কুরায়জার ধ্বংস

ইতঃপূর্বে বিবৃত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (স) মদীনায় আসার পর ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেন। প্রথম দিকে কিছুদিন ইহুদীরা সে সব চুক্তির ওপর অটল থাকলেও অত্যল্প দিনের মধ্যেই তারা বেপরোয়াভাবে চুক্তি ভঙ্গ করতে লাগলো। এর ফলে তাদের বনু নযীর গোত্রকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়েছিলো; কিন্তু বনু কুরায়জা আবার চুক্তি সম্পাদন করলো এবং হযরত মুহাম্মদ (স) তাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে আপন কিল্লায় থাকার অনুমতি দিলেন।

কিন্তু খন্দক যুদ্ধের সময় ইহুদী গোত্রসমূহ বনু কুরায়জাকে মুসলমানদেরকে বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিলো এবং তারাও এ যুদ্ধে শত্রু পক্ষে যোগদান করলো। তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির কোনোই মর্যাদা রাখলো না। তাই খন্দকের ঘনঘটা

www.icsbook.info

কেটে যাবার পরই হযরত মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম বনু কুরায়জার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং তাদেরকে এ বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে যথোচিত শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের অপরাধ ছিলো বনু নযীরের অপরাধের চেয়েও মারাত্মক। কেননা তারা এরূপ এক সংকটাবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতা করলো, যখন গোটা আরব জনগোষ্ঠী মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো এবং দৃশ্যত তাদের টিকে থাকবার আর কোনো উপায় ছিলো না। তারা মুসলমানদের সাথে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করে তাদেরকে নিশ্চিন্ত করেছিলো। আবার দুঃসময় আসামাত্রই সে চুক্তি নির্মমভাবে লংঘন করে তারা মুসলমানদের নাস্তানাবুদ করার উদ্দেশ্যে শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলালো। এভাবে নিজেদের আচরণ দ্বারাই বনু কুরায়জা এটা প্রমাণ করে দিয়েছিলো যে, তারা মুসলমানদের পক্ষে প্রকাশ্য শত্রুর চেয়েও বেশি মারাত্মক।

তাই যুদ্ধের পর হযরত মুহাম্মদ (স) তাদের কিল্লা অবরোধ করলেন। অবরোধ প্রায় এক মাসকাল অব্যাহত থাকলো। অবশেষে বাধ্য হয়ে তারা আত্মসমর্পণ করলো। অতঃপর তাদের ধর্মগ্রন্থ তওরাতের বিধি মুতাবেক এই মর্মে ফয়াসলা করা হলো যে, তাদের সমস্ত যুদ্ধোপযোগী লোককে হত্যা করা হবে এবং বাকী লোকদের বন্দী করে রাখা হবে। এছাড়া তাদের সমস্ত মালপত্র বাজেয়াপ্ত করা হবে। এই ফয়সালা অনুসারে প্রায় চারশ লোককে হত্যা করা হলো। এর মধ্যে একজন মহিলাও ছিলো। তার অপরাধ ছিলো এই যে, সে কিল্লার প্রাচীরের ওপর থেকে পাথর ফেলে একজন মুসলমানকে হত্যা করেছিলো।

www.icsbook.info

১২
হুদাইবিয়া সন্ধির পটভূমি

কা'বা ছিলো ইসলামের মূল কেন্দ্র। এটি আল্লাহর নির্দেশানুক্রমে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) নির্মাণ করেছিলেন। মুসলমানরা ইসলামের এই কেন্দ্রস্থল থেকে বেরোবার পর ছয়টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিলো। পরন্তু হজ্জ ইসলামের অন্যতম মৌল স্তম্ভ হওয়া সত্ত্বেও তারা এটি পালন করতে পারছিলো না। তাই কা'বা শরীফ জিয়ারত ও হজ্জ উদযাপন করার জন্যে মুসলমানদের মনে তীব্র বাসনা জাগলো।

কা'বা জিয়ারতের জন্যে সফর

আরবরা সাধারণত তামাম বছরব্যাপী যুদ্ধে মেতে থাকতো। কিন্তু হজ্জ উপলক্ষে লোকেরা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে কা'বা পর্যন্ত যাতায়াত করতে এবং নিশ্চিন্তে আল্লাহ্‌র ঘরের জিয়ারত সম্পন্ন করতে পারে, এজন্যে চার মাসকাল তারা যুদ্ধ বন্ধ রাখতো। ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হযরত মুহাম্মদ (স) কা'বা জিয়ারতের সিদ্ধান্ত নিলেন। এহেন সৌভাগ্য লাভের জন্যে বহু আনসার ও মুহাজির প্রতীক্ষা করছিলো। তাই চৌদ্দ শ' মুসলমান হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সহগামী হলেন। যুল হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে তাঁরা কুরবানীর প্রাথমিক রীতিসমূহ পালন করলেন। এভাবে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হলো যে, মুসলমানদের উদ্দেশ্য শুধু কা'বা শরীফ জিয়ারত করা, কোনোরূপ যুদ্ধ বা আক্রমণের অভিসন্ধি নেই। তবুও কুরাইশদের অভিপ্রায় জেনে আসবার জন্যে হযরত মুহাম্মদ (স) এক ব্যক্তিকে মক্কায় প্রেরণ করলেন। সে এই মর্মে খবর নিয়ে এলো যে, কুরাইশরা সমস্ত গোত্রকে একত্রিত করে মুহাম্মদ (স)-এর মক্কায় প্রবেশকে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন কি, তারা মক্কার বাইরে এক জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করতেও শুরু করেছে এবং মুকাবিলার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে আছে।

কুরাইশদের সঙ্গে আলোচনা

এই সংবাদ জানার পরও হযরত মুহাম্মদ (স) সামনে অগ্রসর হলেন এবং হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করলেন। এ জায়গাটি মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে অবস্থিত।[৪৫] এখানকার খোজায়া গোত্রের প্রধান হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বললো ঃ 'কুরাইশরা লড়াইর জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছে। তারা আপনাকে মক্কায়

৪৫. কথিত আছে যে, এখানে হুদাইবিয়া নামে একটি কুয়া ছিলো। সেই কুয়ার নামানুসারেই উক্ত গ্রামের নামকরণ করা হয়েছিলো হুদাইবিয়া।

www.icsbook.info

প্রবেশ করতে দেবে না।' হযরত মুহাম্মদ (স) বললেন ঃ 'তাদেরকে গিয়ে বলো যে, আমরা শুধু হজ্জের নিয়্যাতে এসেছি, লড়াই করার জন্যে নয়। কাজেই আমাদেরকে কা'বা শরীফ তওয়াফ ও জিয়ারত করার সুযোগ দেয়া উচিত।' কুরাইশদের কাছে যখন এই পয়গাম গিয়ে পৌছলো, তখন কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক বলে উঠলো ঃ 'মুহাম্মদের পয়গাম শোনার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই।' কিন্তু চিন্তাশীল লোকদের ভেতর থেকে ওরওয়া নামক এক ব্যক্তি বললো ঃ 'না, তোমরা আমার ওপর নির্ভর করো; আমি গিয়ে মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গে কথা বলছি।'

ওরওয়া হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খেদমতে হাযির হলো বটে, কিন্তু কোনো বিষয়েরই মীমাংসা হলো না। ইতোমধ্যে কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর হামলা করার জন্যে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলো এবং তারা মুসলমানদের হাতে বন্দীও হলো; কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর স্বভাবসুলভ করুণার বলে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাদেরকে মুক্তি দেয়া হলো। এরপর সন্ধির আলোচনা চালানোর জন্যে হযরত উসমান (রা)-কে মক্কায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত করা হলো। হযরত উসমান (রা) মক্কায় চলে গেলেন; কিন্তু কুরাইশরা মুসলমানদেরকে কা'বা জিয়ারত করার সুযোগ দিতে কিছুতেই রাযী হলো না; বরঞ্চ তারা হযরত উসমান (রা)-কে আটক করে রাখলো।

রিযওয়ানের শপথ

এই পর্যায়ে মুসলমানদের কাছে এই মর্মে সংবাদ পৌছলো যে, হযরত উসমান (রা) নিহত হয়েছেন। এই খবর মুসলমানদেরকে সাংঘাতিকভাবে অস্থির করে তুললো। হযরত মুহাম্মদ (স) খবরটি শুনে বললেন ঃ 'আমাদেরকে অবশ্যই উসমান (রা)-এর রক্তের বদলা নিতে হবে।' একথা বলেই তিনি একটি বাবলা গাছের নীচে বসে পড়লেন। তিনি সাহাবীদের কাছ থেকে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করলেন ঃ 'আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো, তবু লড়াই থেকে পিছু হটবো না। কুরাইশদের কাছ থেকে আমরা হযরত উসমান (রা)-এর রক্তের বদলা নেবোই।' এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মুসলমানদের মধ্যে এক আশ্চর্য উদ্দীপনার সৃষ্টি করলো। তারা শাহাদাতের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে কাফিরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হলেন। এরই নাম হচ্ছে 'রিযওয়ানের শপথ'। কুরআন পাকেও এই শপথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে সব ভাগ্যবান ব্যক্তি এ সময় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পবিত্র হাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে পুরস্কৃত করার কথা বলেছেন।

হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তাবলী

মুসলমানদের এই উৎসাহ-উদ্দীপনার কথা কুরাইশদের কাছেও গিয়ে পৌছলো। সেই সঙ্গে এ-ও জানা গেলো যে, হযরত উসমান (রা)-এর হত্যার খবর সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এই

www.icsbook.info

পরিস্থিতিতে কুরাইশরা সন্ধি করতে প্রস্তুত হলো এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে সুহাইল বিন্ আমরকে দূত বানিয়ে পাঠালো। তার সঙ্গে দীর্ঘ সময়ব্যাপী আলোচনা হলো এবং শেষ পর্যন্ত সন্ধির শর্তাবলী স্থিরিকৃত হলো। সন্ধিপত্র লেখার জন্যে হযরত আলী (রা)-কে ডাকা হলো। সন্ধিপত্রে যখন লেখা হলো 'এই সন্ধি আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর তরফ থেকে তখন কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল প্রতিবাদ জানিয়ে বললো ঃ 'আল্লাহ্‌র রাসূল' কথাটি লেখা যাবে না; এ ব্যাপারে আমাদের আপত্তি আছে।' একথায় সাহাবীদের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। সন্ধিপত্র লেখক হযরত আলী (রা) কিছুতেই এটা মানতে রাযী হলেন না। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) নানাদিক বিবেচনা করে সুহাইলের দাবি মেনে নিলেন এবং নিজের পবিত্র হাতে 'আল্লাহর রাসূল' কথাটি কেটে দিয়ে বললেন ঃ 'তোমরা না মানো, তাতে কি? কিন্তু খোদার কসম, আমি তাঁর রাসূল।' এরপর নিম্নোক্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতে সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো ঃ

১. মুসলমানরা এ বছর হজ্জ না করেই ফিরে যাবে।

২. তারা আগামী বছর আসবে এবং মাত্র তিন দিন থেকে চলে যাবে।

৩. কেউ অস্ত্রপাতি নিয়ে আসবে না। শুধু তলোয়ার সঙ্গে রাখতে পারবে: কিন্তু তাও কোষবদ্ধ থাকবে, বাইরে বের করা যাবে না।

৪. মক্কায় যে সব মুসলমান অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। আর কোনো মুসলমান মক্কায় ফিরে আসতে চাইলে তাকেও বাধা দেয়া যাবে না।

৫. কাফির বা মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ মদীনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু কোনো মুসলমান মক্কায় গেলে তাকে ফেরত দেয়া হবে না।

৬. আরবের গোত্রগুলো মুসলমান বা কাফির যে কোনো পক্ষের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করতে পারবে।

৭. এ সন্ধি-চুক্তি দশ বছরকাল বহাল থাকবে।

দৃশ্যত এই শর্তাবলী ছিলো মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী আর মুসলমানরা যে চাপে পড়েই এ সন্ধি করেছিলো, তাও বেশ বোঝা যাচ্ছিলো।

হযরত আবু জান্দালের ঘটনা

সন্ধিপত্র যখন লিখিত হচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটনাচক্রে সুহাইলের পুত্র হযরত আবু জান্দাল (রা) মক্কা থেকে পালিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি শৃংখলিত অবস্থায় মুসলমানদের সামনে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এবং সবাইকে নিজের দুর্গতির কথা শোনালেন। তাঁকে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কি কি ধরনের শাস্তি দেয়া হয়েছে,

www.icsbook.info

তা-ও সবিস্তারে খুলে বললেন। অবশেষে তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে আবেদন জানালেন ঃ 'হুযুর আমাকে কাফিরদের কবল থেকে মুক্ত করে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।' একথা শুনে সুহাইল বলে উঠলো ঃ 'দেখুন, সন্ধির শর্ত পূরণের এই হচ্ছে প্রথম সুযোগ। সন্ধিপত্রের শর্তানুসারে আপনি আবু জান্দালকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন না।' এটা ছিলো বাস্তবিকই এক নাজুক সময়। কারণ, আবু জান্দাল ইসলাম গ্রহণ করে নির্যাতন ভোগ করছিলেন এবং বারবার ফরিয়াদ জানাচ্ছিলেন ঃ 'হে মুসলিম ভাইগণ! তোমরা কি আমাকে আবার কাফিরদের হাতে তুলে দিতে চাও?' সমস্ত মুসলমান এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলো। হযরত উমর (রা) তো রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ পর্যন্ত বললেন যে, 'আপনি যখন আল্লাহ্‌র সত্য নবী, তখন আর আমরা এ অপমান কেন সইব?' হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁকে বললেন ঃ 'আমি খোদার পয়গাম্বর, তাঁর হুকুমের নাফরমানী আমি করতে পারি না। খোদা-ই আমায় সাহায্য করবেন।'

মোটকথা, সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হলো। সন্ধির শর্ত মুতাবেক আবু জান্দালকে ফিরে যেতে হলো। এভাবে ইসলামের পথে জীবন উৎসর্গকারীরা রাসূলের আনুগত্যের এক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। একদিকে ছিলো দৃশ্যত ইসলামের অবমাননা ও হযরত আবু জান্দালের শোচনীয় দুর্গতি আর অন্যদিকে ছিলো রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিরংকুশ আনুগত্যের প্রশ্ন।

হযরত মুহাম্মদ (স) আবু জান্দালকে বললেন ঃ 'আবু জান্দাল! ধৈর্য ও সংযমের সাথে কাজ করো। খোদা তোমার এবং অন্যান্য মজলুমের জন্যে কোনো রাস্তা বের করে দিবেনই। সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছে। কাজেই আমরা তাদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারি না।' তাই আবু জান্দালকে সেই শৃংখলিত অবস্থায়ই ফিরে যেতে হলো।

হুদাইবিয়া সন্ধির প্রভাব

সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হবার পর হযরত মুহাম্মদ (স) সেখানেই কুরবানী করার জন্যে লোকদেরকে হুকুম দিলেন। সর্বপ্রথম তিনি নিজেই কুরবানী করলেন এবং আপন মাথার চুল মুড়িয়ে ফেললেন। এরপর সাহাবীগণ তাঁর অনুসরণ করলেন। সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের পর হযরত মুহাম্মদ (স) তিন দিন সেখানে অবস্থান করলেন। ফিরবার পথে সূরা ফাতাহ নাযিল হলো। তাতে এই সন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করে একে 'ফাতহুম মুবীন' বা সুস্পষ্ট বিজয় বলে অভিহিত করা হলো। যে সন্ধি-চুক্তি মুসলমানরা চাপে পড়ে সম্পাদন করলো, তাকে আবার 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে আখ্যা দেয়া দৃশ্যত একটি বেখাপ্পা ব্যাপার ছিলো। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ স্পষ্টত প্রমাণ করে দিলো যে, ইসলামের ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিলো একটি বিরাট বিজয়ের সূচনা মাত্র। এর বিস্তৃত বিবরণ হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

www.icsbook.info

এতদিন মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পুরোপুরি একটা যুদ্ধংদেহী অবস্থা বিরাজ করছিলো। উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশার কোনোই সুযোগ ছিলো না। এই সন্ধি-চুক্তি সেই চরম অবস্থার অবসান ঘটিয়ে রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলো। এরপর মুসলমান ও অমুসলমানরা নির্বাধে মদীনায় আসতে লাগলো এবং মাসের পর মাস সেখানে থেকে মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলো। এভাবে তারা এই নতুন ইসলামী সংগঠনের লোকদেরকে অতি নিকট থেকে দেখার ও জানার সুযোগ পেলো। এর পরিণতিতে তারা বিস্ময়কর রকমে প্রভাবিত হতে লাগলো। যে সব লোকের বিরুদ্ধে তাদের মনে ক্রোধ ও বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়েছিলো, তাদেরকে তারা নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে আপন লোকদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত মানের দেখতে পেলো। তারা আরো প্রত্যক্ষ করলো, আল্লাহ্‌র যে সব বান্দাহ্‌র বিরুদ্ধে তারা এদ্দিন যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করে আসছে, তাদের মনে কোনো ঘৃণা বা শত্রুতা নেই; বরং তাদের যা কিছুই ঘৃণা, তা শুধু ভ্রান্ত বিশ্বাস ও গলদ আচার-পদ্ধতির বিরুদ্ধে। তারা (মুসলমানরা) যা কিছুই বলে, তার প্রতিটি কথা সহানুভূতি ও মানবিক ভাবধারায় পরিপূর্ণ। এতো যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও তারা বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সহানুভূতি ও সদাচরণের বেলায় কোনো ত্রুটি করে না।

পরন্তু এরূপ মেলামেশার ফলে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের সন্দেহ ও আপত্তিগুলো সম্পর্কে সরাসরি আলোচনা করারও প্রচুর সুযোগ হলো। এতে করে ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমরা কতোখানি ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত ছিলো, তা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলো। মোটকথা, এই পরিস্থিতি এমনি এক আবহাওয়ার সৃষ্টি করলো যে, অমুসলিমদের হৃদয় স্বভাবতঃই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। তাদের নেতৃবৃন্দ তাদের মনের ওপর পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের যে আবরণ চাপিয়ে দিয়েছিলো, ক্রমে ক্রমে তাও অপসারিত হতে লাগলো। এর ফলে সন্ধি-চুক্তির মাত্র দেড়-দুই বছরের মধ্যে এতো লোক ইসলাম গ্রহণ করলো যে, ইতঃপূর্বে কখনো তা ঘটেনি। এরই মধ্যে কুরাইশদের কতিপয় নামজাদা সর্দার ও যোদ্ধা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে মুসলমানদের সঙ্গে হাত মিলালো। হযরত খালিদ বিন্ অলীদ (রা) এবং হযরত আমর বিন্ আস (রা) এ সময়ই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এর ফলে ইসলামের প্রভাব-বলয় এতোটা বিস্তৃত হলো এবং তার শক্তিও এতোটা প্রচণ্ড রূপ পরিগ্রহ করলো যে, পুরনো জাহিলিয়াত স্পষ্টত মৃত্যু-লক্ষণ দেখতে লাগলো। কাফির নেতৃবৃন্দ এই পরিস্থিতি অনুধাবন করে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলো। তারা স্পষ্টত বুঝতে পারলো, ইসলামের মুকাবিলায় তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই অনতিবিলম্বে সন্ধি-চুক্তি ভেঙে দেয়ার এবং এর ক্রমবর্ধমান সয়লাবকে প্রতিরোধ করার জন্যে আর একবার ইসলামী আন্দোলনের সাথে ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ তারা খুঁজে পেলো না। এই চুক্তি ভঙ্গের কথা পরে মক্কা বিজয় প্রসঙ্গে আলোচিত হবে।

www.icsbook.info

১৩
সম্রাটদের নামে পত্রাবলী

হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে হযরত মুহাম্মদ (স) ইসলামের দাওয়াত প্রচারের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। একদিন তিনি সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন ঃ 'হে জনমণ্ডলী! আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে তামাম দুনিয়ার জন্যে রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন (আমার বাণী সারা দুনিয়ার জন্যে প্রযোজ্য এবং এটা সবার জন্যে রহমত স্বরূপ)। দেখো, ঈসার হাওয়ারীদের (সঙ্গী-সাথী) ন্যায় তোমরা মতানৈক্য করো না। যাও, আমার পক্ষ থেকে সবার কাছে সত্যের আহ্বান পৌছিয়ে দাও।'

এ সময়, অর্থাৎ ষষ্ঠ হিজরীর শেষ কিংবা সপ্তম হিজরীর শুরুতে তিনি বড়ো বড়ো রাজা-বাদশার নামে আমন্ত্রণ-পত্র লেখেন।[৪৬] এসব পত্র নিয়ে বিভিন্ন সাহাবীকে বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। ইতিহাসে যে সব আমন্ত্রণ-পত্রের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১. রোম সম্রাট (কাইসার) হিরাক্লিয়াসের নামে পত্র—ওহিয়া কালবী (রা) নিয়ে যান।

২. পারস্য সম্রাট (কিসরা) খসরু পারভেজের নামে পত্র—হযরত আবদুল্লাহ বিন্‌ খাজাফা সাহমী (রা) নিয়ে যান।

৩. মিশরের শাসক আজীজের নামে পত্র—হযরত হাতিব বিন্‌ আবী বালতায়া (রা) নিয়ে যান।

৪. আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নামে পত্র—হযরত উমর বিন্‌ উমাইয়া (রা) নিয়ে যান।[৪৭]

রোম সম্রাটের নামে

রোম সম্রাটের কাছে যে পত্র প্রেরিত হয়, তা নিম্নরূপ ঃ

'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র বান্দাহ এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের প্রধান শাসক হিরাক্লিয়াসের নামে।

৪৬. হযরত মুহাম্মদ (স) মোট ক'জন রাজা-বাদশার নামে পত্র লেখেন, তার সঠিক হিসাব পাওয়া দুষ্কর। —সম্পাদক

৪৭. এছাড়া বসরার শাসক, দামেশকের আমীর, বাহরাইনের রাজা, আম্মানের রাজা ও ইয়ামামার রাজার কাছেও হযরত মুহাম্মদ (স) পত্র লিখেন বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। —সম্পাদক

www.icsbook.info

'যে ব্যক্তি সত্যপথ (হেদায়েত) অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি তোমাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাচ্ছি।'

'আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ফর্মাবর্দারী কবুল করো, তুমি শান্তিতে থাকবে। আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিফল দান করবেন। কিন্তু তুমি যদি আল্লাহ্‌র ফর্মাবর্দারী থেকে বিমুখ হও তাহলে তোমার দেশবাসীর (অপরাধের) জন্যে তুমি দায়ী হবে। (কারণ তোমার অস্বীকৃতির কারণেই তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছতে পারবে না)।'

'হে আহলি কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান; তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবো না, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবো না এবং আমাদের মধ্যেও কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজের প্রভু বানাবো না। কিন্তু তোমরা যদি এ কথা মানতে অস্বীকৃত হও, তাহলে (আমরা স্পষ্টত বলে দিচ্ছি যে,) তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম (অর্থাৎ আমরা শুধু খোদারই আনুগত্য ও বন্দেগী করে যাবো।'

আবু সুফিয়ানের সাথে কথাবার্তা

হযরত ওহিয়া কালবী (রা) এই পত্রখানি বসরায় অবস্থানরত কাইসারের প্রতিনিধি হারিস গাস্‌সালীর নিকট পৌছিয়ে দিলেন। গাস্‌সালী তখন কাইসারের অধীনে সিরিয়া শাসন করতো। সে পত্রখানি কাইসারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। কাইসার পত্রটি পেয়েই আরবের কোনো অধিবাসীকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। ঐ সময় বাণিজ্য উপলক্ষে আবু সুফিয়ান উক্ত এলাকায় অবস্থান করছিলো। কাইসারের কর্মচারীরা তাকেই দরবারে উপস্থিত করলো। তার সঙ্গে কাইসারের নিম্নরূপ কথাবার্তা হলো ঃ

কাইসার ঃ নবুয়্যাতের দাবিদার লোকটির খান্দান কিরূপ?

আবু সুফি ঃ সে শরীফ খান্দানের লোক।

কাইসার ঃ এ খান্দানের আর কেউ নবুয়্যাতের দাবি করেছিলো?

আবু সুফি ঃ কক্ষনো নয়।

কাইসার ঃ এই খান্দানে কেউ কখনো বাদশাহ ছিলো কি?

আবু সুফি ঃ না।

কাইসার ঃ যারা এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে, তারা কি গরীব না ধনবান?

আবু সুফি ঃ গরীব শ্রেণীর লোক।

www.icsbook.info

কাইসার ঃ তার অনুগামীদের সংখ্যা বাড়ছে, না হ্রাস পাচ্ছে?

আবু সুফি ঃ ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

কাইসার ঃ তোমরা কি তাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখেছো?

আবু সুফি ঃ কক্ষনো নয়।

কাইসার ঃ সে কি চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে থাকে?

আবু সুফি ঃ এ পর্যন্ত সে কোনো চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেনি। তবে তার সাথে একটি নতুন চুক্তি (হুদাইবিয়া সন্ধি) সম্পাদিত হয়েছে। এখন সে চুক্তির ওপর অটল থাকে কিনা, দেখা যাবে।

কাইসার ঃ তোমরা তার সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করেছো?

আবু সুফি ঃ হ্যাঁ, করেছি।

কাইসার ঃ যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছে?

আবু সুফি ঃ কখনো আমরা জিতেছি, কখনো তার জয় হয়েছে।

কাইসার ঃ সে লোকদের কি শিক্ষা দিয়ে থাকে?

আবু সুফি ঃ সে বলে, কেবল এক খোদার বন্দেগী করো। অপর কাউকে তার সঙ্গে শরীক করো না। নামায পড়ো। পুত-পবিত্র থাকো। সত্য কথা বলো। একে অপরের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করো ইত্যাদি।

এই কথাবার্তার পর কাইসার বললো ঃ 'পয়গাম্বর হামেশাই ভালো খান্দানে জন্মগ্রহণ করেন। যদি এ লোকটির খান্দানে অন্য কেউ নবুয়্যাতের দাবি করতো, তবে তার দাবিকে হয়তো খান্দানের প্রভাব বলে বিবেচনা করা যেতো—বলা যেতো, রাজত্বের লিপ্সায়ই হয়তো সে এই কৌশল অবলম্বন করেছে। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। আর যখন প্রমাণিত হয়েছে যে, লোকদের ব্যাপারে সে কখনো মিথ্যা কথা বলেনি, তখন সে খোদার ব্যাপারে এতো বড়ো মিথ্যা খাড়া করেছে (যে খোদা তাঁকে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন), এটা কি করে বলা যায়? তাছাড়া পয়গাম্বরদের প্রথম দিককার অনুসারীরা স্বভাবতঃই গরীব শ্রেণীর লোক হয়ে থাকে। সত্য ধর্মও হামেশা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরন্তু এ-ও সত্য যে, পয়গাম্বররা কখনো কাউকে ধোঁকা দেন না, কারো সঙ্গে ফেরেববাজীও করেন না। সর্বোপরি, তোমরা এও বলছো যে, সে নামায-রোযা, পাক-পবিত্রতা, খোদা-নির্ভরতা ইত্যাদির উপদেশ দিয়ে থাকে। এ সব যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁর আধিপত্য একদিন নিশ্চিত রূপে আমার রাজত্ব পর্যন্ত পৌছবেই। আমি জানতাম যে, একজন পয়গাম্বর আসবেন; কিন্তু তিনি যে আরবেই জন্ম নেবেন, এটা

www.icsbook.info

আমার ধারণা ছিলো না। আমি যদি সেখানে যেতে পারতাম তো নিজেই তাঁর পা ধুয়ে দিতাম।'

কাইসারের এসব অভিমত শুনে তাঁর দরবারের পাদ্রী ও আলেমরা ভীষণ খাপ্পা হলো। এমন কি তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আশংকা পর্যন্ত দেখা দিলো। এই আশংকার ফলেই কাইসারের হৃদয়ে যে সত্যের আলো জ্বলে উঠেছিলো, তা আবার নিভে গেলো। বাস্তবিকই সত্যকে গ্রহণ করার পথে ধন-মাল ও ক্ষমতার মোহই সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

পারস্য সম্রাটের নামে

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নামে নিম্নোক্ত পত্র লেখা হলো ঃ

'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদের তরফ থেকে পারস্যের প্রধান শাসক কিস্‌রা সমীপে।

'যে ব্যক্তি সত্যপথ (হেদায়াত) অনুসরণ করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করে এবং এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সমস্ত মানুষের জন্যে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে প্রেরিত পয়গাম্বর, যেনো প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিকে (আল্লাহ্‌র নাফরমানীর) মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে পারি। তুমিও আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ফর্মাবর্দারী কবুল করো। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হবে। নচেত অগ্নিপূজকদের পাপের জন্যে তুমি দায়ী হবে।'

খসরু পারভেজ ছিলো প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট। তার কাছে প্রথম খোদার নাম, তারপর পত্র-প্রেরকের নাম এবং তারপর সম্রাটের নাম লেখা, তাও আবার নিতান্ত সাদাসিধাভাবে, তদুপরি দরবারে প্রচলিত কায়দা-কানুন, লিখন-পদ্ধতি ও সম্বোধন রীতির ছাপ পর্যন্ত নেই—পত্র লেখার এ ধরণটাই ছিলো অসহ্য। খসরু পারভেজ এই পত্র দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং বললো ঃ 'আমার গোলাম হয়ে আমায় এমনিভাবে পত্র লেখার স্পর্ধা! একথা বলেই সে পত্রখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো এবং এই নবুয়্যাতের দাবিদারকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে তার সামনে হাযির করার জন্যে তার ইয়েমেনস্থ গভর্নরকে নির্দেশ পাঠালো।[৪৮]

ইয়েমেনের গভর্ণর হযরত মুহাম্মদ (স)-কে ডেকে নেবার জন্যে তাঁর খেদমতে দু'জন কর্মচারী পাঠিয়ে দিলো। এরই মধ্যে খসরু পারভেজের পুত্র তাকে হত্যা করে

৪৮. ইতিহাস থেকে জানা যায়, নবী করীম (স) খসরু পারভেজের এই আচরণের কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখ পান। তিনি মন্তব্য করেন ঃ 'খসরু আমার চিঠি যেভাবে ছিঁড়ে ফেলেছে, তার রাজত্ব অচিরেই তেমনি ভেঙে খানখান হয়ে যাবে।' নবী করীম (স)-এর ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো। এও ছিলো নবী করীম (স) এর একটি মু'জিযা।—সম্পাদক

www.icsbook.info

নিজেই সিংহাসন দখল করে বসলো। গভর্নর কর্তৃক প্রেরিত কর্মচারীদ্বয় যখন হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খেদমতে পৌছলো, তখন এ সম্পর্কে তারা কিছুই অবহিত ছিলো না। হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে এ কথা জানতে পারলেন। তিনি কর্মচারীদ্বয়কে এ ঘটনা অবহিত করে বললেন ঃ 'তোমরা ফিরে যাও এবং গভর্নরকে গিয়ে বলো, ইসলামের কর্তৃত্ব শীগ্‌গীরই খসরু পারভেজের রাজধানী পর্যন্ত পৌছবে।' কর্মচারীদ্বয় ইয়েমেনে ফিরে গিয়ে জানতে পারলো, খসরু পারভেজ সত্যসত্যই নিহত হয়েছে।

আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী ও মিসরের আজীজের নামে

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছেও প্রায় অনুরূপ বিষয়-সম্বলিত পত্র প্রেরণ করা হলো। তার জবাবে তিনি লিখলেন ঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি খোদার সাচ্চা পয়গাম্বর।' নাজ্জাশী হযরত জাফরের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, একথা ইতঃপূর্বে 'আবিসিনিয়ায় হিজরত' প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

মিশরের আজীজ যদিও চিঠি পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি, কিন্তু তিনি পত্র-বাহককে খুব সম্মান করেন এবং উপঢৌকন দিয়ে ফেরত পাঠান।

www.icsbook.info

১৪
ইসলামী রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা

মদীনা থেকে বনু নযীর গোত্রের লোকদেরকে বহিষ্কৃত করার পর তারা খায়বরে এসে বসতি স্থাপন করলো। খায়বর মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় দু'শ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ইহুদীরা কয়েকটি বড়ো বড়ো সুদৃঢ় কিল্লা নির্মাণ করেছিলো।

খায়বর তখন ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধতার সবচাইতে বড়ো কেন্দ্র এবং ইসলামের পক্ষে একটি স্থায়ী বিপদে পরিণত হয়েছিলো। খন্দক যুদ্ধের সময় মদীনার ওপর যে প্রচন্ড হামলা চালান হয়েছিলো, তার মূল কারণ ছিলো এই খায়বরের ইহুদীরাই। সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হবার পর ভিন্নতর পন্থায় ইসলামী আন্দোলনের মূলোৎপাটনের জন্যে তারা ক্রমাগত ষড়যন্ত্র পাকাতে লাগলো। এই উদ্দেশ্যে তারা আরবের বিভিন্ন গোত্র, বিশেষত কুরাইশদের সঙ্গে আঁতাত স্থাপন তো করলোই, সেই সঙ্গে মদীনার মুনাফিকদেরও উস্কাতে শুরু করলো। তাদেরকে এই মর্মে বুঝানো হলো যে, তারা যদি মুসলমানদের ভেতরে থেকে এদের শিকড় কাটতে থাকে, তাহলে বাইরের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেয়া সহজতর হবে। ইহুদীদের এই সব চক্রান্তের খবর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছেও যথারীতি পৌঁছতে লাগলো। তিনি ইহুদীদেরকে এ জঘন্য তৎপরতা থেকে বিরত রাখার জন্যে তাদের সঙ্গে একটি যুক্তিসঙ্গত চুক্তি সম্পাদনের চেষ্টা করলেন এবং এজন্যে তিনি নিজেই উদ্যোগী হলেন। কিন্তু ইহুদীরা তাদের চক্রান্ত থেকে বিরত হলো না। এমন কি তারা বিভিন্ন গোত্রের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পাঠালো যে, 'আমাদের সঙ্গে মিলে যদি তোমরা মদীনার ওপর হামলা করো, তাহলে তোমাদেরকে স্থায়ীভাবে আপন খেজুর বাগানের অর্ধেক ফসল দিতে থাকবো।' মোটকথা, ইহুদীদের চক্রান্তের ফলে বহু গোত্রের মন-মানস পরিবর্তিত হলো এবং তারা একযোগে মদীনার ওপর হামলা করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছলো।

আক্রমণাত্মক যুদ্ধ

এ যাবত মুসলমানরা যুদ্ধ করে আসছে শুধু আত্মরক্ষার খাতিরে। দুশমনরা তাদেরকে খতম করার জন্যে হামলা চালিয়েছে আর তাঁরা আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র হাতে নিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং দুশমনরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পলায়ন করেছে। কিন্তু এই স্তরে এসে অবস্থার গতি অন্যদিকে মোড় নিলো। কুফরী শক্তির সুসংহত রূপ নেবার আগেই আক্রমণাত্মক হামলা চালিয়ে তাকে খতম করে দেবার প্রয়োজন দেখা দিলো। কারণ ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তার

www.icsbook.info

জন্যে যেমন প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি প্রয়োজন মতো আক্রমণাত্মক হামলা করারও দরকার আছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-পদ্ধতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই জীবন-পদ্ধতি ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কায়েম ও তাকে নিরাপদ করতে হলে কেবল অন-ইসলামী জিন্দেগী ও জীবন বিধানের অনুবর্তীদের হামলা থেকে আত্মরক্ষা করাই যথেষ্ট নয়; বরং এই জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে কখনো কখনো অন্যান্য বাতিল জীবন পদ্ধতিকে উৎখাত করার জন্যে আক্রমণাত্মক আঘাত হানারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

খন্দক যুদ্ধের পর ইসলামী আন্দোলন এই স্তরেই প্রবেশ করলো। এবার শুধু প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধই যথেষ্ট নয়; বরং এখন আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে বিপদাশংকা চিরতরে মুছে ফেলারই প্রয়োজন দেখা দিলো। তাই খন্দক যুদ্ধের সমাপ্তির পর হযরত মুহাম্মদ (স) ঘোষণা করলেন ঃ 'দুশমনরা কেবল আমাদের ওপরই আক্রমণ চালাতে আসবে আর আমরা শুধু তার মুকাবিলা করবো, এখন আর এটা চলবে না; বরং এখন আমরা নিজেরাই গিয়ে দুশমনদের ওপর হামলা করবো। [৪৯]

খায়বর আক্রমণ

এবার খায়বরের ইহুদীদের ক্রমবর্ধমান ফিত্‌নাকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার সময় এসে পড়লো। হযরত মুহাম্মদ (স) খায়বরের ওপর হামলা চালানোর প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন এবং ইহুদীদের তরফ থেকে সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা করলেন। এটা সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসের ঘটনা। এই হামলার জন্যে তিনি ষোলশ' সৈন্য সঙ্গে নিলেন। এর ভেতরে মাত্র দু'শ ছিলো অশ্ব ও উষ্ট্রারোহী, বাকী সব পদাতিক।

খায়বরে ছয়টি দুর্গ এবং তাতে বিশ হাজার ইহুদী সৈন্য মোতায়েন ছিলো। সেখানে পৌঁছে হযরত মুহাম্মদ (স) নিশ্চিতরূপে জানতে পারলেন যে, ইহুদীরা সত্য সত্যই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত; তারা কোনো অবস্থায়ই কোনো সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন করতে রাযী নয়। তিনি সাহাবীদের সামনে জিহাদ সম্পর্কে একটি উদ্দীপনাময় ভাষণ প্রদান করলেন এবং আল্লাহ্‌র দ্বীনের খাতিরে তাদেরকে জীবন পণ করার উপদেশ দিলেন। পর দিন তিনি ইহুদীদের দুর্গগুলো অবরোধ করলেন। অবরোধকালে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধ সংঘটিত হলো। প্রায় বিশ দিন অবরোধের পর আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন। এই যুদ্ধে ৯৩ জন ইহুদী নিহত এবং ১৫ জন মুসলমান শহীদ হলেন। হযরত আলী (রা)-এর হাতে মারহাব নামক ইহুদীদের এক বিরাট পাহ্‌লোয়ান নিহত হলো। ইহুদীরা তার বীর্যবত্তার জন্যে গর্ব করতো। তার মৃত্যু তাই এ যুদ্ধের এক বিরাট উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিলো।

---

৪৯. মাওজেহুল কুরআন, সূরা আহযাব ঃ শাহ আবদুল কাদির

www.icsbook.info

বিজয়ের পর ইহুদীগণ আবেদন জানালো, তাদের কাছে যে সব জমি-জমা রয়েছে, তা তাদেরকেই ছেড়ে দেয়া হলে মুসলমানদেরকে তারা অর্ধেক ফসল দিতে থাকবে। তাদের এই আবেদন হযরত মুহাম্মদ (স) মঞ্জুর করলেন। পরবর্তী বছরগুলোতে এই ফসল আদায়ের ব্যাপারে মুসলিম কর্মচারীগণ ইহুদীদের সঙ্গে অত্যন্ত ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করেন। তাঁরা ফসলকে দু'ভাগে বিভক্ত করতেন এবং কৃষকদের যে ভাগ ইচ্ছা পসন্দ করে নেবার অধিকার দিতেন। এভাবে ফসল আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীদের অন্তরও তাঁরা জয় করে নিলেন।

মুসলিম সমাজের প্রশিক্ষণ

ওহুদ যুদ্ধের পর ইসলামী আন্দোলনের জন্যে বাইরের বিপদাশংকা কি পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিলো, খন্দক যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে তা সহজেই আন্দাজ করা চলে। এটি ছিলো অত্যন্ত সংঘাতের সময়; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের আহ্বায়ক একজন জেনারেল হিসেবে যেমন দৃঢ়তার সাথে এসব ঘটনাবলী মুকাবিলা করছিলেন, তেমনি একজন সুদক্ষ নৈতিক শিক্ষক হিসেবেও তিনি আন্দোলনের অগ্রসেনাদের জন্যে যথোচিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছিলেন। তিনি এই নয়া ইসলামী সমাজের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন ও নিয়ম-বিধি সম্পর্কেও লোকদেরকে ক্রমাগত শিক্ষা দান করছিলেন। এ পর্যায়ে ইসলামী চরিত্র এবং মুসলিম সমাজ গঠনের জন্যে কি কি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ আইন-কানুন ও নিয়ম-বিধি শিক্ষা দেয়া হতো, তা এ সময়ে অবতীর্ণ দুটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা অর্থাৎ সূরা নিসা ও সূরা মায়েদা অধ্যয়ন করলেই স্পষ্টত অনুমান করা যায়।

সূরা নিসা চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরীর বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়। এ সময় নবী করীম (স) এই নতুন ইসলামী সমাজকে পুরনো জাহিলী রীতিনীতি ও বিধি-ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করে কিভাবে নৈতিকতা, কৃষ্টি-সভ্যতা, সামাজিকতা ও অর্থনীতির নবতর ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছিলেন, এ থেকে তা সহজেই আন্দাজ করা চলে। এ সময় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক জীবনকেও ইসলামী ধারায় শুধরে নেবার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় পথ নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে পারিবারিক ব্যবস্থাপনার নীতি বাতলানো হলো; বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে সুস্পষ্ট নিয়ম-নীতি জানিয়ে দেয়া হলো; নারী-পুরষের অধিকার-সীমা নির্দিষ্ট করে সমাজের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করা হলো; ইয়াতিম, মিসকীন ও দরিদ্র লোকদের অধিকারের নিরাপত্তা বিধানের জন্যে তাগিদ করা হলো; সম্পদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নীতিভঙ্গি নির্ধারণ করা হলো; পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি বাতলে দেয়া হলো, শরাব পানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলো এবং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার নিয়ম-কানুন বলে দেয়া হলো। এভাবে খোদা ও তাঁর বান্দাদের সাথে একজন সৎলোকের সম্পর্ক

www.icsbook.info

সম্বন্ধে মুসলমানদেরকে অবহিত করা হলো। সেই সঙ্গে আহলি কিতাবদের ভ্রান্ত আচরণ ও অসঙ্গত জীবন যাপন পদ্ধতির সমালোচনা করে তাদের দোষ-ত্রুটিগুলো সুস্পষ্ট রূপে তুলে ধরা হলো এবং মুসলমানদেরকে এ ধরনের ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকার জন্যে সতর্ক করে দেয়া হলো।

বস্তুত ইসলামী আন্দোলনের এ দিকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সংশোধন ছাড়া বাতিলের মুকাবিলায় তার সাফল্য অর্জন কখনোই সম্ভব নয়। অন্যকথায়, ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসেনাদের শুধু ব্যক্তিগত নৈতিকতার দিক থেকেই বাতিলপন্থীদের চেয়ে উন্নত হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং অন-ইসলামী সমাজের তুলনায় সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ একটি আদর্শ সমাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করাও তাদের কর্তব্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কোনো বিশেষ ধরনের উদ্যোগ-আয়োজনের প্রয়োজন নেই; বরং আন্দোলনের অগ্রসেনাদের মধ্যে খোদানির্ভরতা ও খোদাপ্রেমের গুণাবলী সৃষ্টি হতে থাকলে স্বভাবতই এরূপ ফলাফল প্রকাশ পেতে থাকে। এ কারণেই একজন নবীর সংস্কারক ও বিপ্লবাত্মক আন্দোলন অন্যান্য সমস্ত আন্দোলনের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে থাকে। নবী সাধারণ লোকদের মধ্যে আদর্শ প্রচার করার জন্যে যতোটা অস্থির হয়ে থাকেন, তাঁর অনুবর্তীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংশোধনের প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগী হয়ে থাকেন। ইসলামী আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব সূরা নিসার বক্তব্যেও প্রতিভাত হয়েছে। এই সূরায় নৈতিকতা, কৃষ্টি-সভ্যতা, সামাজিকতা ইত্যাদি বিষয়ে আইন-কানুন বর্ণনার পাশাপাশি দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং মুশরিক ও আহলি কিতাবদেরকে যথারীতি সত্য দ্বীনের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সূরা মায়েদা হুদাইবিয়া সন্ধির পর প্রায় সপ্তম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা ঐ বছর 'উমরা' করতে পারেনি। তখন স্থির করা হয়েছিলো যে, হযরত মুহাম্মদ (স) পরবর্তী বছর কা'বা জিয়ারত করতে আসবেন। তাই ঐ সময়ের পূর্বে কা'বা জিয়ারত সম্পর্কে বহু নিয়ম-কানুন বাতলে দেবার প্রয়োজন হলো। এ ছাড়া কাফিরদের বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও মুসলমানরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কখনো যাতে সীমালংঘন না করে, সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো।

এ সূরাটি (সূরা মায়েদা) যখন অবতীর্ণ হয়, তখন পর্যন্ত মুসলমানদের অবস্থা অনেক বদলে গিয়েছিলো। ওহুদ যুদ্ধের পরবর্তীকালে মুসলমানরা যেরূপ চারদিক দিয়ে বিপদ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলো, এ সময়টা ঠিক সে রকম ছিলো না। এ সময় ইসলাম নিজেই একটি প্রচণ্ড শক্তির রূপ পরিগ্রহ করেছিলো এবং ইসলামী রাষ্ট্রও যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছিলো। মদীনার চারদিকে দেড়-দুশ' মাইলের মধ্যকার সমস্ত বিরোধী গোত্রের শক্তি এ সময় ভেঙে পড়েছিলো এবং খোদ মদীনা থেকে বিপজ্জনক ইহুদীগণ সমূলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। কোথাও কিছু অবশিষ্ট থাকলে তারাও মদীনা সরকারের

www.icsbook.info

অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলো। মোটকথা, এ সময় এ সত্য স্পষ্টত প্রতিভাত হয়ে উঠলো যে, ইসলাম শুধু কতিপয় আকীদা-বিশ্বাসেরই সমষ্টি নয়, যাকে প্রচলিত ভাষায় 'ধর্ম' বলা যায় এবং যার সম্পর্ক কেবল মানুষের মন-মগজের সঙ্গে; বরং ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন-পদ্ধতি, যার সম্পর্ক মানুষের মন-মগজ ছাড়াও তার পূর্ণ জীবনের সঙ্গে; সমাজ, রাষ্ট্র, যুদ্ধ, সন্ধি সব কিছুই তার অন্তর্ভুক্ত। পরন্তু এ সময় মুসলমানরা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। তারা যে জীবন পদ্ধতিকে (দ্বীন) বুঝে-শুনে গ্রহণ করেছিলো, তার ভিত্তিতে তারা নিজেরা নির্বাধে জীবন যাপন করতে পারছিলো। বাইরের অন্য কোনো জীবন পদ্ধতি বা আইন-কানুন তাদের গতিরোধ করতে পারছিলো না; বরং তারা এই দ্বীনের দিকে অন্যান্য লোকদেরকেও আহ্বান জানাতে সমর্থ হচ্ছিলো।

এ সময় মুসলমানদের নিজস্ব একটি কৃষ্টি-সভ্যতা গড়ে উঠেছিলো এবং অন্যান্য কৃষ্টি-সভ্যতা থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হতে লাগলো। মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র, তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি, তাদের আচার-ব্যবহার—এক কথায় তাদের জীবনের সমগ্র কাঠামোই ইসলামী নীতির ছাঁচে ঢালাই হতে লাগলো। অন্যান্য জাতির মুকাবিলায় তারা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়ে উঠলো। তাদের নিজস্ব দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রচলিত হলো; নিজস্ব আদালত ও কোর্ট-কাচারী বসলো; লেনদেন ও বেচা-কেনার নিজস্ব পদ্ধতি চালু হলো; উত্তরাধিকার সম্পর্কে একটি স্থায়ী বিধান জারি হলো। এ ছাড়া বিবাহ, তালাক, পর্দা এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয়েও তাদের নিজস্ব আইন-কানুন চালু হলো। এমন কি তাদের উঠা-বসা, খানা-পিনা ও মেলামেশার নিয়ম-কানুন সম্পর্কেও সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশ দেয়া হলো।

সূরা মায়েদায় হজ্জ সংক্রান্ত নিয়মাবলী, খাদ্য-দ্রব্যে হারাম-হালালের বাছ-বিচার, অযু-গোসল ও তায়াম্মুমের নিয়মাবলী, শরাব ও জুয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা, সাক্ষ্য আইন সম্পর্কিত নির্দেশাবলী, বিচার ও ইনসাফের ওপর কায়েম থাকার তাগিদ ইত্যাদি সহ ইসলামী সমাজ গঠনের জন্যে অপরিহার্য বিষয়াদি বিবৃত হলো। তাই এর প্রতিটি বিষয়ের প্রতিই অতীব গুরুত্ব আরোপ করা হলো।

উমরা উদযাপন

হুদাইবিয়া সন্ধির একটি শর্ত ছিলো এই যে, মুসলমানরা পর বছর এসে উমরা উদযাপন করবে। তাই পর বছর অর্থাৎ সপ্তম হিজরী সালে হযরত মুহাম্মদ (স) মুসলমানদের এক বিরাট কাফেলা নিয়ে কা'বা জিয়ারতের মনস্থ করলেন। এ উপলক্ষে সাহাবীদের মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের আনন্দ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হলো। এ দৃশ্য কাফির কুরাইশদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষের চাপা আগুন আবার জ্বালিয়ে দিলো। এমন কি তাদের ইচ্ছা মাফিক সম্পাদিত সন্ধি-চুক্তিকে এখন নিজেদের কাছেই অর্থহীন বলে মনে হতে লাগলো।

www.icsbook.info

১৫
মক্কা বিজয়

হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ

হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তিতে আরব গোত্রগুলোকে এই অধিকার দেয়া হয়েছিলো যে, তারা মুসলমান এবং কাফিরদের মধ্যে যে কোনো পক্ষের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে। এই শর্তানুযায়ী বনু খোজা'আ গোত্র মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলো আর বনু বকর গোত্র মৈত্রী স্থাপন করলো কুরাইশদের সঙ্গে। এভাবে প্রায় দেড় বছর এই সন্ধি-চুক্তি পূর্ণভাবে পালিত হলো। কিন্তু তারপরই এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। ইতঃপূর্বে খোজা'আ ও বকর গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বেশ কিছুকাল যাবত লড়াই চলে আসছিলো; এদের মধ্যে হঠাৎ একদিন বনু বকর গোত্র খোজা আদেরকে আক্রমণ করে বসলো এবং এ ব্যাপারে কুরাইশগণ বনু বকরকে সাহায্য প্রদান করলো। কারণ খোজা'আ গোত্র তাদের মর্জীর বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় কুরাইশরা আগেই থেকেই তাদের ওপর খাপ্পা ছিলো। এভাবে উভয় পক্ষ মিলে খোজা'আ গোত্রের লোকদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করতে শুরু করলো। এমন কি তারা কা'বা শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করেও রেহাই পেলো না; বরং সেখানেও তাদের রক্তপাত করা হলো।

খোজা'আগণ বাধ্য হয়ে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে তাদের দুরবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলো এবং তাঁর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী তারা সাহায্য প্রার্থনা করলো। হযরত মুহাম্মদ (স) খোজা'আদের এই মজলুমী অবস্থার কথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তিনি এই নিষ্ঠুর আচরণ থেকে বিরত থাকার এবং নিম্নোক্ত তিনটি শর্তের মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে কুরাইশদের কাছে একজন দূত প্রেরণ করলেন ঃ

১. খোজা'আদের যে সব লোক নিহত হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অথবা

২. বনু বকরের সাথে কুরাইশদের সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে কিংবা

৩. হুদাইবিয়ার সন্ধি-চুক্তি বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

দূত মারফত এই পয়গাম শুনে কোরতা বিন্ উমর নামক জনৈক কুরাইশ বললো ঃ 'আমরা তৃতীয় শর্তটাই সমর্থন করি।' কিন্তু দূত চলে যাবার পর তাদের খুব আফসোস হলো এবং হুদাইবিয়ার সন্ধি পুনর্বহাল করার জন্যে নিজেদের পক্ষ থেকে আবু সুফিয়ানকে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করলো। কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতি, বিশেষত কুরাইশদের এতদিনকার আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (স) তাদের এই নয়া প্রস্তাব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। তিনি আবু সুফিয়ানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

www.icsbook.info

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি

কা'বাগৃহ ছিলো খালেস তওহীদের কেন্দ্রস্থল। নির্ভেজাল খোদার বন্দেগীর জন্যে এটি হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এ যাবতকাল তা মুশরিকদের অধিকারে থেকে শিরকের সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র-স্থলে পরিণত হয়েছিলো। হযরত মুহাম্মদ (স) প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রচারিত দ্বীনের আহ্বায়ক এবং খালেস তওহীদের অনুবর্তী ছিলেন। এ কারণে তওহীদের এই পবিত্র কেন্দ্রস্থলকে শিরকের সমস্ত নাপাকী ও নোংরামি থেকে অবিলম্বে মুক্ত করার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু এতদিন অবস্থা তার অনুকূলে ছিলো না। হযরত মুহাম্মদ (স) এবার অনুমান করতে পারলেন যে, আল্লাহ্‌র এই পবিত্র ঘরকে শুধু তাঁরই ইবাদতের জন্যে নির্ধারিত করা এবং মূর্তিপূজার সমস্ত অপবিত্রতা থেকে একে মুক্ত করার উপযুক্ত সময় এসেছে। তাই তিনি চুক্তিবদ্ধ সমস্ত গোত্রের কাছে এ সম্পর্কে পয়গাম পাঠালেন। অন্য দিকে এই প্রস্তুতির কথা যাতে মক্কাবাসীরা জানতে না পারে, সেজন্যে তিনি কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করলেন। প্রস্তুতি কার্য সম্পন্ন হলে অষ্টম হিজরীর ১০ রমযান প্রায় দশ হাজার আত্মোৎসর্গী সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে অন্যান্য আরব গোত্রও এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলো।

আবু সুফিয়ানের গ্রেফতারী

মুসলিম সৈন্যবাহিনী মক্কার সন্নিকটে পৌঁছলে কুরাইশ-প্রধান আবু সুফিয়ান গোপনে তাদের সংখ্যা-শক্তি আন্দাজ করতে এলো। এমনি অবস্থায় হঠাৎ তাকে গ্রেফতার করে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খেদমতে হাযির করা হলো। এ সেই আবু সুফিয়ান, ইসলামের দুশমনি ও বিরুদ্ধতায় যার ভূমিকা ছিলো অনন্যসাধারণ। এই ব্যক্তিই বারবার মদীনা আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিলো এবং একাধিকবার হযরত মুহাম্মদ (স)-কে হত্যা করার গোপন চক্রান্ত পর্যন্ত ফেঁদেছিলো। এই সব গুরুতর অপরাধের কারণে আবু সুফিয়ানকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করাই উচিত ছিলো। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) তার প্রতি করুণার দৃষ্টি প্রসারিত করে বললেন ঃ 'যাও, আজ আর তোমাকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিন। তিনি সমস্ত ক্ষমা প্রদর্শনকারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ক্ষমা প্রদর্শনকারী।'

আবু সুফিয়ানের সঙ্গে এই আচরণ ছিলো সম্পূর্ণ অভিনব। রাহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীনের এই অপূর্ব ঔদার্য আবু সুফিয়ানের হৃদয়-নেত্রকে উন্মীলিত করে দিলো। সে বুঝতে পারলো, মক্কায় সৈন্য নিয়ে আসার পেছনে এই মহানুভব ব্যক্তির হৃদয়ে না প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতা আছে আর না আছে দুনিয়াবী রাজা-বাদশাদের ন্যায় কোনো স্পর্ধা-অহংকার। এ কারণেই তাকে মুক্তিদান করা সত্ত্বেও সে মক্কায় ফিরে গেলো না; বরং ইসলাম গ্রহণ করে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আত্মোৎসর্গী দলেরই অন্তর্ভুক্ত হলো।

www.icsbook.info

মক্কায় প্রবেশ

এবার হযরত মুহাম্মদ (স) খালিদ বিন্ অলীদ (রা)-কে আদেশ দিলেন ঃ 'তুমি পিছন দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করো, কিন্তু কাউকে হত্যা করো না। অবশ্য কেউ যদি তোমার ওপর অস্ত্র উত্তোলন করে, তাহলে আত্মরক্ষার জন্যে তুমিও অস্ত্র ধারন করো।' এই বলে হযরত মুহাম্মদ (স) নিজে সামনের দিক থেকে শহরে প্রবেশ করলেন। হযরত খালিদ-এর সৈন্যদের ওপর কতিপয় কুরাইশ গোত্র তীর বর্ষণ করলো এবং তার ফলে তিনজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করলেন। এই কারণে খালিদ (রা)-কেও তার প্রত্যুত্তর দিতে হলো। ফলে ১৩জন হামলাকারী নিহত হলো এবং বাকী সবাই পালিয়ে গেলো। হযরত মুহাম্মদ (স) এই পাল্টা হামলার কথা জানতে পেরে হযরত খালিদ-এর কাছে কৈফিয়ত তলব করলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতে পেরে বললেন ঃ 'খোদার ফয়সালা এ রকমই ছিলো।' পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ (স) কোনোরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করলেন। তাঁর সৈন্যদের হাতে একটি লোকও নিহত হলো না।

মক্কায় সাধারণ ক্ষমা

হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কায় প্রবেশ করে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বললেন না, বরং তিনি এই মর্মে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন ঃ

১. যারা আপন ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে থাকবে, তারা নিরাপদ

২. যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, তারাও নিরাপদ এবং

৩. যারা কা'বাগৃহে আশ্রয় নেবে, তারাও নিরাপদ।

কিন্তু এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা থেকে এমন ছয়-সাত ব্যক্তি ব্যতিক্রম ছিলো, ইসলামের বিরুদ্ধতায় ও মানবতা বিরোধী অপরাধে যাদের ভূমিকা ছিলো অসাধারণ এবং যাদের হত্যা করার প্রয়োজন ছিলো অপরিহার্য।

নবী করীম (স) কি অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করলেন, তাও এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁর পতাকা ছিলো সাদা ও কালো রঙের। মাথায় ছিলো লৌহ শিরস্ত্রাণ এবং তার ওপর ছিলো কালো পাগাড়ী বাঁধা। তিনি উচ্চৈঃস্বরে সূরা ফাতাহ (ইন্না ফাতাহ্‌না) তিলাওয়াত করছিলেন। সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলা সমীপে তাঁর এমনি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পাচ্ছিলো যে, সওয়ারী উটের পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ার দরুন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল যেনো উটের কুঁজ স্পর্শ করছিলো।৫০

---

৫০. মক্কা বিজয়ের এই ঘটনার সাথে আধুনিক কালের কোনো রাজ্য জয়ের ঘটনাকে তুলনা করলেই ইসলাম ও জাহিলিয়াতের পার্থক্যটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। জাহিলিয়াতের ঝাণ্ডাবাহীরা বিজয়কে মনে করে নিজেদেরই কৃতিত্বের ফসল। তাই বিজয় উৎসবের নামে তারা প্রকাশ করে দানবীয় উল্লাস। আর সে উল্লাসের নির্মম শিকার হয় অসহায় ও নিরস্ত্র মানুষ।—সম্পাদক

www.icsbook.info

কা'বা গৃহে প্রবেশ

হযরত মুহাম্মদ (স) কা'বা মসজিদে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম মূর্তিগুলোকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তখন কা'বাগৃহে ৩৬০টি মূর্তি বর্তমান ছিলো। তার দেয়ালে ছিলো নানারূপ চিত্র অংকিত। এর সবই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হলো। এভাবে আল্লাহ্‌র পবিত্র ঘরকে শিরকের নোংরামি ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত করা হলো। এরপর হযরত মুহাম্মদ (স) তকবির ধ্বনি উচ্চারণ করলেন, কা'বাগৃহ তওয়াফ করলেন এবং 'মাকামে ইবরাহীম'-এ গিয়ে নামায আদায় করলেন। এই ছিলো তাঁর বিজয় উৎসব। এ উৎসব দেখে মক্কাবাসীদের হৃদয়-চক্ষু খুলে গেলো। তারা দেখতে পেলো, এতোবড়ো একটি বিজয় উৎসবে বিজয়ীরা না প্রকাশ করলো কোনো শান-শওকত আর না কোনো গর্ব-অহংকার, বরং অত্যন্ত বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সাথে তারা খোদার সামনে অবনমিত হচ্ছে এবং তাঁর প্রশংসা ও জয়ধ্বনি উচ্চারণ করছে। এই দৃশ্য দেখে কে না বলে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাদশাহী কিংবা রাজত্ব জয় নয়, এ অন্য কিছু।

বিজয়ের পর ভাষণ

মক্কা বিজয় সম্পন্ন হবার পর হযরত মুহাম্মদ (স) এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এর কিছু অংশ হাদীস শরীফে বিধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন ঃ

'এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ (ইলাহ) নেই; কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং সমস্ত শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। জেনে রেখো; সমস্ত গর্ব-অংহকার, সমস্ত পুরনো হত্যা ও রক্তের বদলা এবং তামাম রক্তমূল্য আমার পায়ের নীচে। কেবল কা'বার তত্ত্বাবধান এবং হাজীদের পানি সরবরাহ এর থেকে ব্যতিক্রম। হে কুরাইশগণ! জাহিলী আভিজাত্য ও বংশ-মর্যাদার ওপর গর্ব প্রকাশকে আল্লাহ্‌ নাকচ করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ এক আদমের সন্তান আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে।

অতঃপর তিনি কুরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

লোকসকল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে পয়দা করেছি এবং তোমাদেরকে নানা গোত্র ও খান্দানে বিভক্ত করে দিয়েছি, যেনো তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। কিন্তু খোদার কাছে সম্মানিত হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে অধিকতর পরহেজগার। আল্লাহ মহাবিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ।

(সূরা হুজরাত ঃ ১৩)।

www.icsbook.info

এর সাথে অন্য কতিপয় জরুরী মসলাও তিনি শিক্ষা দেন।

ইসলামের শ্রেষ্ঠতম বিজয়ী তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ের পর যে ভাষণ দান করেন, এই হচ্ছে তার নমুনা। এতে না আছে তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে কোনো জিঘাংসা, না আছে কোনো বিদ্বেষ। এতে না আছে তাঁর আপন কৃতিত্বের কোনো উল্লেখ আর না তাঁর আত্মোৎসর্গী সহকর্মীদের কোনো প্রশংসা, বরং প্রশংসা যা কিছু, তা শুধু আল্লাহ্‌রই জন্যে আর যা কিছু ঘটেছে তা শুধু তাঁরই করুণার ফলমাত্র।[৫১]

আরব দেশে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হতো। বংশের কোনো ব্যক্তি কারো হাতে নিহত হলে ঐ বংশের স্মরণীয় ঘটনাবলীর মধ্যে তা শামিল করা হতো। এমনকি ভবিষ্যত বংশধররা পর্যন্ত হত্যাকারীর বংশ থেকে নিহত ব্যক্তিদের রক্তের বদলা না নিয়ে স্বস্তি লাভ করতো না। তাই এ উপলক্ষে হযরত মুহাম্মদ (স) এ ধরনের যাবতীয় রক্তের বদলাকে বাতিল করে দিলেন এবং বলা যায়, তিনি আরববাসীদেরকে সত্যিকার অর্থে এক অনাবিল শান্তি ও স্বস্তিময় জীবন প্রদান করলেন। আরবে বংশ ও গোত্র নিয়ে গৌরব করার এক বহু পুরনো ব্যাধি বর্তমান ছিলো। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে এ ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি সম্পূর্ণ অবৈধ। ইসলামে পার্থক্য সৃষ্টির একমাত্র বৈধ মাপকাঠি হচ্ছে খোদায়ী বিধানের আনুগত্যের প্রশ্ন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধানের যতো অনুগত হবে, তাঁর সন্তোষ-অসন্তোষকে ভয় করবে, সে ততোই সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত বলে গণ্য হবে। ইসলামে বংশগত শরাফতের কোনো স্থান নেই। বংশ বা খান্দানের সৃষ্টি কেবল পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে। আল্লাহ্‌র রাসূল তাই এই ব্যাধিটিরও মূলোৎপাটন করে দিলেন এবং মানুষের জন্যে এমন এক সাম্যের বাণী ঘোষণা করলেন, আজ পর্যন্ত যা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মই মানুষকে দিতে পারেনি।

শত্রুর হৃদয় জয়

হযরত মুহাম্মদ (স) যে জনসমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেখানো বড়ো বড়ো কুরাইশ নেতা, উপস্থিত ছিলো। যে সব ব্যক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে জীবন পণ করেছিলো, সেখানে তারাও হাযির ছিলো। যাদের অকথ্য উৎপীড়নে মুসলমানরা একদিন নিজেদের ঘর-বাড়ি পর্যন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলো, তারাও সেখানে ছিলো। যারা মুসলমানদের ধন-সম্পত্তি অন্যায়ভাবে দখল করে বসেছিলো, তারাও সেখানে ছিলো। যারা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে গালি-গালাজ করতো, তাঁর পথে কাঁটা

৫১. বিজিত মক্কায় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উপরিউক্ত ভাষণ এবং পরাজিত শত্রুদের সাথে তাঁর এই আচরণ ছিলো মানব ইতিহাসের এক অভিনব ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাকে বিজয়ী ও বিজিতদের পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ মুছে ফেলে এক মানবিক মহাসমাজ গঠনের পথ সুগম করে—রচনা করে ভ্রাতৃত্বের এক অনুপম দৃষ্টান্ত।—সম্পাদক

www.icsbook.info

বিছিয়ে রাখতো, তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করতো, প্রতি মুহূর্ত তাঁকে হত্যা করার চিন্তা করতো, তারাও সেখানে উপস্থিত ছিলো। যে পাষন্ড হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আপন চাচার কলিজা বের করে চিবিয়েছিলো, সেও সেখানে হাযির ছিলো। যারা এক খোদার বন্দেগী করার অপরাধে বেশুমার মুসলমানকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলো, তারাও সেখানে ছিলো। হযরত মুহাম্মদ (স) এদের সবার দিকে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'বলো তো, আজ তোমাদের সঙ্গে আমি কিরূপ আচরণ করবো?' হযরত মুহাম্মদ (স) কিভাবে মক্কায় পদার্পণ করেছেন এবং এ পর্যন্ত কিরূপ ব্যবহার করেছেন, লোকেরা তা গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলো। তাই তারা সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলো ঃ

'আপনি আমাদের সম্ভ্রান্ত ভ্রাতা ও সম্ভ্রান্ত ভ্রাতুষ্পুত্র।'

একথা শুনেই হযরত মুহাম্মদ (স) ঘোষণা করলেন ঃ

'যাও, আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই; তোমরা সবাই মুক্ত।'

যারা মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর দখল করে নিয়েছিলো, হযরত মুহাম্মদ (স) তাও তাদেরকে প্রত্যর্পণ করার ব্যবস্থা করলেন না; বরং তিনি মুহাজিরদেরকে নিজেদের দাবি পরিত্যাগ করার উপদেশ দিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর এই বিস্ময়কর আচরণে মুগ্ধ হয়ে বড়ো বড়ো কুরাইশ নেতা তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লো। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করলো ঃ 'আপনি সত্যি আল্লাহ্‌র নবী, কোনো দেশজয়ী বাদশাহ নন। আপনি যে দাওয়াত পেশ করেন, তা ই সত্য।'

এই ছিল মক্কা বিজয়ের দৃশ্য। এ বিজয় কোনো দেশ, সম্পদ বা ধন-রত্ন দখল নয়, এ ছিলো মানুষের হৃদয়-রাজ্য অধিকার আর এটাই ছিলো সরচেয়ে বড়ো জয়।

www.icsbook.info

১৬
হুনাইনের যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের প্রভাব

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দয়াসুলভ আচরণ এবং মুসলমানদের সাথে মেলামেশার ফলে একদিকে মক্কায় দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো, অন্যদিকে তামাম আরব গোত্রের ওপর বিজয়ের এক বিরাট প্রভাব পড়লো। তারা বুঝতে পারলো, ইসলামের প্রতি আহ্বানকারী বাস্তবিকই ধন-দৌলত বা রাজত্বের কোনো কাঙাল নন; বরং তিনি আল্লাহ্‌রই পয়গাম্বর। পরন্তু এ সময়ে ইসলাম ও তার বৈশিষ্ট্য কোনো চোরা-গুপ্তা জিনিস ছিলো না; বরং ইসলামী আদর্শের স্বরূপটা প্রায় গোটা আরব দেশই জেনে ফেলেছিলো। যাদের হৃদয়ে বুঝবার শক্তি ছিলো, তারা বুঝে নিয়েছিলো যে, এই হচ্ছে আসল সত্য। তাই মক্কা বিজিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আরবের দূর-দূরাঞ্চল থেকে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এসে ইসলাম কবুল করতে লাগলো। এতৎসত্ত্বেও যে সব লোকের অন্তরে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্তমান ছিলো, তারা এ দৃশ্য দেখে যারপরনাই অস্থির হয়ে উঠলো। তাদের ভেতরে বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। এদিক দিয়ে হুনাইনের অধিবাসী হাওয়াজেন ও সাকীফ নামক দুটি গোত্র অত্যন্ত অগ্রবর্তী ছিলো। তারা এমনিতেও খুব যুদ্ধবাজ লোক ছিলো; তদুপরি ইসলামের অগ্রগতি দেখে তারা আরো অস্থির হয়ে পড়লো। তারা স্পষ্টত বুঝতে পারলো, মক্কার পর এবার তাদের পালা। তাই উভয় গোত্রের প্রধানদ্বয় একত্র হয়ে পরামর্শ করলো এবং এই সিদ্ধান্ত নিলো যে, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, দৃঢ়তার সাথে মুসলমানদের মুকাবিলা করতে হবে। কারণ ক্রমবর্ধমান বিপদকে প্রতিরোধ করতে না পারলে তাদের কল্যাণ নেই। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা মালিক ইবনে আওফ নাযারী নামক তাদের জনৈক সর্দারকে বাদশাহ মনোনীত করলো এবং মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করে দিলো। এ ব্যাপারে তারা আরো বহু গোত্রকে নিজেদের সঙ্গী বানিয়ে নিলো।

হুনাইনের যুদ্ধ

এ প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে নবী করীম (স)-ও সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এই ক্রমবর্ধমান ফিত্‌নাকে সময় থাকতেই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অষ্টম হিজরীর ১০ শওয়াল প্রায় বারো হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে হযরত মুহাম্মদ (স) দুশমনের মুকাবিলার জন্যে রওয়ানা হলেন। ঐ

www.icsbook.info

সময় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো বিপুল আর তাদের যুদ্ধ-সরঞ্জামও ছিলো অত্যন্ত প্রচুর। এটা দেখেই তাদের মনে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মালো যে, দুশমনরা তাদের মুকাবিলা করতে কিছুতেই সমর্থ হবে না; বরং অচিরেই তারা ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এমন কি, কোনো কোনো মুসলমানের মুখ থেকে এ উক্তি পর্যন্ত বেরিয়ে পড়লো ঃ 'আজ আর আমাদের ওপর কে জয়লাভ করতে পারে?' কিন্তু এরূপ ধারণা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কিছুমাত্র সামঞ্জস্যশীল ছিলো না। কারণ তাদের কখনো আপন শক্তি-সামর্থ্যের ওপর ভরসা করা উচিত নয়। তাদের শক্তি হওয়া উচিত শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার দয়া ও করুণা। কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ - ثُمَّ أَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَأَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ -

হুনাইনের দিনকে স্মরণ করো, যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যতে তুষ্ট ছিলে; কিন্তু তাতে তোমাদের কোনো কাজ হয়নি; বরং জমিন প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো এবং তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের ওপর নিজের তরফ থেকে সান্ত্বনা ও প্রশান্তির ভাবধারা নাযিল করলেন এবং তোমরা দেখতে পাওনি এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে কাফিরদের শাস্তি দিলেন। কাফিরদের জন্যে এমনি শাস্তিই নির্ধারিত। (সূরা তওবা ঃ আয়াত ঃ ২৫-২৬)

হুনাইন হচ্ছে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা। এখানেই এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানরা সামনে আসামাত্র দুশমনরা আশ-পাশের পাহাড় থেকে এলোপাথাড়ি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। এ পরিস্থিতির জন্যে মুসলমানরা মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। এর ফলে তাদের সৈন্যদলে বিশৃংখলা দেখা দিলো এবং কিছুক্ষণের জন্যে তারা ময়দান ত্যাগ করলো। অনেক বেদুইন গোত্র ময়দান থেকে পালিয়ে গেলো। এদের মধ্যে সবেমাত্র ঈমান এনেছে এবং পূর্ণ প্রশিক্ষণ পায়নি এমন অনেক নও-মুসলিমও ছিলো। এই বিশৃংখল পরিস্থিতিতে হযরত মুহাম্মদ (স) অত্যন্ত দৃঢ়তা ও প্রশান্ত চিত্তে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং দুশমনদের মুকাবিলা করা ও ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করার জন্যে মুসলমানদের প্রতি ক্রমাগত আহ্বান জানাতে লাগলেন। তাঁর এই অপূর্ব ধৈর্য-স্থৈর্য এবং তাঁর চারপাশে বহু সাহাবীর অকৃত্রিম দৃঢ়তা দেখে মুসলিম সৈন্যরা পুনরায় ময়দানে আসতে শুরু করলো এবং নবতর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নবী করীম

www.icsbook.info

(স) এবং তাঁর সাহাবীদের এই ধৈর্য ও দৃঢ়তাকেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর তরফ থেকে অবতীর্ণ সান্ত্বনা ও প্রশান্তির লক্ষণ বলে উল্লেখ করেছেন। এর ফলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো এবং মুসলমানরা পুরোপুরি জয়লাভ করলো। কাফিরদের প্রায় ৭০ ব্যক্তি নিহত এবং সহস্রাধিক লোক বন্দী হলো।

দুশমনদের পশ্চাদ্ধাবন ও কল্যাণ কামনা

কাফিরদের বাকী সৈন্যরা পালিয়ে গিয়ে তায়েফে আশ্রয় গ্রহণ করলো। কারণ তায়েফকে একটি নিরাপদ স্থান মনে করা হতো। হযরত মুহাম্মদ (স) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন এবং তায়েফ অবরোধ করলেন। তায়েফে একটি মশহুর ও মজবুত দুর্গ ছিলো। এর ভেতরেই কাফিরগণ আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। অবরোধ প্রায় বিশ দিন অব্যাহত রইলো। হযরত মুহাম্মদ (স) যখন ভালোমতো বুঝতে পারলেন যে, দুশমনদের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েছে এবং এখন আর তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার কোনো আশংকা নেই, তখন তিনি অবরোধ তুলে নিলেন এবং তাদের জন্যে দো'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! সাকীফ গোত্রকে সুপথ প্রদর্শন করো এবং তাদেরকে আমার কাছে হাযির হবার তওফিক দাও।' কেবল দ্বীন-ইসলামের জন্যে সংগ্রামকারী খোদার নবী ছাড়া কে এমনি পরিস্থিতিতে এতখানি দয়ার্দ্রহৃদয় ও স্নেহশীল হতে পারে এবং বিরুদ্ধবাদীদের জন্যে কল্যাণ কামনা করত পারে?

www.icsbook.info

১৭
তাবুক যুদ্ধ

রোম সাম্রাজ্যের সাথে সংঘর্ষ

তখন আরবদেশের উত্তরে ছিলো বিশাল রোম সাম্রাজ্য। মক্কা বিজয়ের আগে থেকেই এই সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। নবী করীম (স) সিরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে বসবাসকারী গোত্রসমূহের নিকট ইসলামের দাওয়াত নিয়ে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছিলেন। এই গোত্রগুলোর অধিকাংশই ছিলো খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী এবং রোম সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন। তারা মুসলিম প্রতিনিধি দলের পনেরো ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেললো। শুধু প্রতিনিধি দলের নেতা কা'ব বিন উমর গিফারী প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেন। ঐ সময় হযরত মুহাম্মদ (স) বসরার গভর্নর শেরজিলের নামেও ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে এক পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত গভর্নরও রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বলে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতিনিধি হযরত হারিস বিন আমীরকে হত্যা করলো। এই সব কারণে সিরিয়ার সীমান্ত এলাকাবর্তী মুসলমানদেরকে একেবারে দুর্বল ভেবে কেউ যাতে উত্যক্ত করতে সাহসী না হয়, সে জন্যে হযরত মুহাম্মদ (স) অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে তিন হাজার মুসলমানের এক বাহিনী প্রেরণ করলেন। এই বাহিনীর আগমন সংবাদ পেয়েই শেরজিল প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে মুকাবিলার জন্যে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু মুসলমানরা এ সংবাদ জানতে পেরেও সামনে এগুতে লাগলো। রোম সম্রাট তখন হাম্‌স নাক স্থানে অবস্থান করছিলো। কিন্তু মুসলমানরা তা সত্ত্বেও যথারীতি অগ্রসর হতে লাগলো। অবশেষে মুতা' নামক স্থানে এই তিন হাজার আত্মোৎসর্গীর সঙ্গে বিশাল রোমক বাহিনীর সংঘর্ষ হলো। দৃশ্যত এই পদক্ষেপের ফলে বিপুল সংখ্যক রোমক সৈন্যের মুকাবিলায় এই নগণ্য সংখ্যক মুসলিম সৈন্যের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযলে রোমকদের এতোবড়ো বাহিনীও মুসলমানদের কোনো ক্ষতি করতে পারলো না; ববং তারাই শোচনীয়রূপে পরাজিত হলো। এই ঘটনায় আশপাশের সমগ্র গোত্রের ওপর মুসলমানদের মোটামুটি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। এর ফলে দূর-দূরান্ত এলাকার গোত্রসমূহ পর্যন্ত ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলো এবং হাজার হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করলো।

এর মধ্যে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হলো এই যে, ফারওয়া বিন আমর আল-জাজামী নামক রোমক বাহিনীর একজন অধিনায়ক ইসলামের শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। এই ব্যক্তি তাঁর ঈমানদারীর কি বিরাট প্রমাণ দিয়েছিলেন, তাও লক্ষ্য করবার মতো। তাঁকে বন্দী করে দরবারে এনে রোম সম্রাট কাইসার বললো ঃ

www.icsbook.info

'ইসলাম ত্যাগ করে আপন পদে পুনর্বহাল হও, নতুবা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও।' জবাবে তিনি পদমর্যাদার ওপর পদাঘাত হেনে বললেন ঃ 'আখিরাতের সাফল্যের বিনিময়ে দুনিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত নই।' অবশেষে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো। এই ঘটনার ফলে হাজার হাজার লোক ইসলামের নৈতিক শক্তি এবং তার যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারলো। তারা বুঝতে পারলো যে, প্রবল সয়লাবের ন্যায় অগ্রসরমান এই আন্দোলনের মুকাবিলা করা কোনো চাট্টিখানি কথা নয়।

কাইসারের পক্ষ থেকে হামলার প্রস্তুতি

পর বছরই রোম সম্রাট কাইসার মুসলমানদের কাছ থেকে মুতা' যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সিরীয় সীমান্তে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দিলো এবং তার অধীনস্থ আরব গোত্রসমূহের নিকট থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলো। এ প্রস্তুতির কথা নবী করীম (স) যথাসময়ে জানতে পারলেন। এ মুহূর্তটি ছিলো মুসলমানদের পক্ষে অত্যন্ত সংকটজনক। এ সময়ে সামান্য মাত্র গাফলতি দেখালেও সমস্ত কাজ বানচাল হয়ে যাবার সম্ভবানা ছিলো। একদিকে মক্কা অভিযান ও হুনাইন যুদ্ধে পরাজিত আরব গোত্রগুলো মাথা তুলে দাঁড়াতো, অন্যদিকে শত্রু পক্ষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী মদীনার মুনাফিকরাও ঠিক মাহেন্দ্রক্ষণে ইসলামী সমাজের মধ্যে ভয়ঙ্কর ফাসাদ সৃষ্টি করে দিতো। তার ফলে যুগপৎ আন্দোলন ও সংগঠনকে সামলানোই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়তো। এমনি সময়ে রোমক শক্তির সর্বাত্মক হামলার মুকাবিলা করা মোটেই সহজ ব্যাপার ছিলো না। এমন কি, এই বিরাট হামলা মুকাবিলা করতে না পেরে কুফরের কাছে ইসলামী আন্দোলনের পরাজিত হবার আশংকা পর্যন্ত ছিলো। এ সমস্ত কারণেই হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর খোদা-প্রদত্ত অতুলনীয় দূরদৃষ্টির বলে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে, এ সময় কাইসার বাহিনীর মুকাবিলা করাই সমীচীন। কারণ এ সময় আমাদের সামান্য মাত্র দুর্বলতা প্রকাশ পেলেও এতদিনের গড়া সমস্ত কাজ বানচাল হয়ে যেতে পারে।

মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত

কিন্তু এ সময় মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা ছিলো এক কঠিন পরীক্ষার শামিল। দেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা, তদুপরি প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল। ক্ষেতের ফসল পাকতে প্রায় শুরু করেছিলো। যুদ্ধের সামান-পত্রও পুরো ছিলো না। সফর ছিলো দীর্ঘ পথের। সর্বোপরি মুকাবিলা ছিলো এক বিশাল বাহিনীর সঙ্গে। এতৎসত্ত্বেও নবী করীম (স) পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে যুদ্ধের কথা ঘোষণা করলেন এবং কোথায় কি উদ্দেশ্যে যেতে হবে, তাও সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, এতদিন ইসলামী আন্দোলন শুধু খোলাখুলিভাবে বহিঃশত্রুর সঙ্গেই মুকাবিলা করে আসছিলো। আর মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধের পর

www.icsbook.info

বিরুদ্ধবাদীদের মেরুদণ্ডও ভেঙে পড়েছিলো। কিন্তু এ যাবত ঘরোয়া শত্রু অর্থাৎ মুনাফিকদের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষমাসুলভ আচরণই করা হচ্ছিলো। এর একটি কারণ ছিলো এই যে, একই সঙ্গে ঘরের ও বাইরের শত্রুদের সাথে সমানে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্যে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ও স্থিতিশীলতা এতদিন ইসলামী আন্দোলন হাসিল করতে পারেনি। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মুনাফিকদের মধ্যে সবাই একই ধরনের লোক ছিলো না। তাদের মধ্যে কিছু লোকের হৃদয়ে হয় ঈমানের দুর্বলতা ছিলো, নতুবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা শোবাহ-সন্দেহ পোষণ করতো। এই ধরনের লোকদের আপন দুর্বলতা ও শোবা-সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যে একটা যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত সুযোগ দেবার প্রয়োজন ছিলো। অন্যদিকে ইসলামের মূলোচ্ছেদ করার জন্যে মুসলমানদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এমন সব দুশমনদেরকেও ভালমতো চিহ্নিত করে নেয়া একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছিলো। তাই এতদিন পর্যন্ত এই সব লোককে নরম-গরম সকল প্রকারেই বুঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে যাদের ভেতর সামান্যমাত্রও যোগ্যতা ছিলো, তারা সোজা পথে চলে এলো। কিন্তু এক্ষণে সে সুযোগটিও শেষ হয়ে গেলো। মুসলমানরা দেশের ভেতরকার বিরুদ্ধবাদীদের বহুলাংশে প্রভাবাধীন করে নিয়েছেন। এবার বিদেশী শক্তির সঙ্গে তাদের মুকাবিলা শুরু হতে যাচ্ছে। এমনি নাজুক অবস্থার কারণেই ঘরোয়া শত্রুদের মাথা গুড়িয়ে দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো। নচেত এরা বাইরের শত্রুদের সঙ্গে যোগসাজশে কখন কি ক্ষতি করে বসে, কে জানে!

মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন

মুনাফিকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে কয়েকটি জিনিসের একান্ত প্রয়োজন ছিলো। যেমন ঃ তাদের খোলাখুলিভাবে সামনে আসা, তাদের চেহারা থেকে ঈমান ও ইসলামের মুখোশ অপসারিত হওয়া,তাদের আসল পরিচয়টা গোটা ইসলামী সমাজের জেনে নেয়া, সর্বোপরি মুসলমানদের ব্যাপারে মুসলমান হিসেবে তাদের নাক গলানো এবং ইসলামী সমাজ সংগঠনে সাচ্চা মুসলমানদের ন্যায় মর্যাদা লাভের সুযোগ না থাকা। তাই তাবুক যুদ্ধের এই ঘোষণা মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচনে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হলো। যারা ঈমানের দাবিতে সত্যবাদী ছিলো, এ সময়ে তারা মনে-প্রাণে জিহাদের জন্যে তৈরি হয়ে গেলো। তারা অর্থ-কড়ির প্রয়োজন হওয়ামাত্র যার কাছে যা কিছু ছিলো, সবই এনে হাযির করলো। এমন কি সওয়ারীর অভাবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সহযাত্রী হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কিছু লোক কেঁদে ফেললো। এভাবে ইসলামী সমাজ-সংগঠনে কে কে নিষ্ঠাবান ছিলো, তা সুস্পষ্টভাবে জানা গেলো।

পক্ষান্তরে যাদের হৃদয়ে ঈমানের নাম-নিশানা ছিলো না, যুদ্ধের ঘোষণা শুনেই যেনো তাদের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার উপক্রম হলো। তারা নানারূপ বাহানা ও অজুহাত তালাশ করতে লাগলো এবং যুদ্ধে না যাবার জন্যে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে

www.icsbook.info

প্রার্থনা করতে লাগলো। এ সময়ও হযরত মুহাম্মদ (স) তাদের সঙ্গে নম্র ব্যবহারই করলেন এবং এদের সবাইকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু এই মুনাফিকদের দল শুধু নিজেরাই যুদ্ধ হতে বিরত থেকে ক্ষান্ত হলো না; বরং এরা অন্যান্য লোকদেরও বিরত রাখার এবং নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করতে লাগলো।

এরা কখনো বলতে লাগলো, 'এতো প্রচণ্ড গরমে যুদ্ধে গিয়ে কি তোমরা প্রাণ হারাবে?' আবার কখনো বললো ঃ 'এতো বড়ো রোমক শক্তির মুকাবিলায় এ নগণ্য সংখ্যক মুসলমান কি করতে পারবে? এতো হচ্ছে জেনে-শুনে নিজেকে ধ্বংসর মুখে নিক্ষেপ করা।' মোটকথা যুদ্ধের ঘোষণা এমন এক কষ্টিপাথরের কাজ করলো যে, সাচ্চা মুমিন আর মুনাফিকদের চেহারা স্পষ্টত পৃথক হয়ে গেলো। এর ফলে এই শ্রেণীর লোকদের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের মোক্ষম সুযোগ পাওয়া গেলো। এ ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (স) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

তাবুকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা

অবশেষে নবম হিজরীর রজব মাসে হযরত মুহাম্মদ (স) ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা হতে যাত্রা করলেন; এর মধ্যে মাত্র দশ হাজার ছিলো অশ্বারোহী। উটের সংখ্যা এতো কম ছিলো যে, একটি উটের পিঠে পালাক্রমে কয়েকজন করে সৈন্য সওয়ার হতে লাগলো। এরপর ছিলো গ্রীষ্মের প্রচন্ডতা এবং পানির অভাব। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সাচ্চা মুমিনগণ এ সময় তাদের ঈমানের পরাকাষ্ঠা, নবীর আনুগত্য এবং আল্লাহ্‌র পথে আত্মোৎসর্গের যে আগ্রহ প্রদর্শন করলো, আল্লাহ তা মঞ্জুর করলেন এবং এর বিনিময়ে তিনি এমন ব্যবস্থা করে দিলেন যে, মদীনা থেকে নবী করীম (স)-এর রওয়ানা করার উদ্দেশ্য বিনা যুদ্ধেই হাসিল হয়ে গেলো। নবী করীম (স) তাবুক পৌছেই জানতে পারলেন যে, রোম সম্রাট কাইসার সীমান্ত থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে; তাই যুদ্ধ করার মতো সেখানে আর কেউ বর্তমান নেই।

ব্যাপারটা ঘটেছিলো এই রকম ঃ রোম সম্রাট যখন জানতে পারলো যে, তার এতবড়ো জবরদস্ত প্রস্তুতির খবর পেয়েও মুসলমানরা নিঃশংক চিত্তে তাদের মুকাবিলার জন্যে মদীনা থেকে যাত্রা করেছে এবং ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে আসছে, তখন সে নিজের সৈন্য সরিয়ে নেয়াই সমীচীন মনে করলো। কারণ এর আগে মুতা' যুদ্ধের সময় এক লাখ সৈন্যের মুকাবিলায় মাত্র তিন হাজার মুসলমান কিরূপ শৌর্য-বীর্য দেখিয়েছিলো, সে অভিজ্ঞতা সম্রাটের মন থেকে মুছে যায়নি। না জানি এবারও পরাজিত হয়ে তার মান-ইজ্জতটুকু একেবারে খতম হয়ে যায়! তাই যখন সে জানতে পারলো, এবার তিন হাজার নয়, ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে নবী করীম (স) আসছেন, তখন সে এ সয়লাবের মুকাবিলা না করারই সিদ্ধান্ত করলো।

www.icsbook.info

তাবুকে অবস্থান

কাইসারের এভাবে ময়দান থেকে পশ্চাদপসরণ করাকেই নবী করীম (স) যথেষ্ট মনে করলেন। এরপর তার পশ্চাদ্ধাবনে কালক্ষেপণ করার চেয়ে তিনি ঐ এলাকায় নিজের প্রভাবকে মজবুত করাকে সমীচীন মনে করলেন। তিনি বিশ দিন সেখানে অবস্থান করলেন। এ সময়ে রোম সাম্রাজ্য ও ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং রোমকদের প্রভাবাধীন কতকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যকে তিনি নবীন ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্থ করে নিলেন। এভাবে যে সব আরব গোত্র এতদিন রোম সম্রাটের সমর্থক ছিলো, তারা ইসলামী রাষ্ট্রের সমর্থক ও সাহায্যকারী বনে গেলো।

মুনাফিকদের চালবাজি

হযরত মুহাম্মদ (স) যখন তাবুক অভিযানে রওয়ানা করলেন, তখন ইসলামী সমাজ-সংগঠনে অনুপ্রবেশকারী কপট মুসলমানরা মদীনায় পড়ে রইলো। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো, মুসলমানরা এ অভিযান থেকে আর নিরাপদে ফিরে আসবে না। তাদের কিছু অংশ গ্রীষ্মের প্রচন্ডতা ও সফরকালীন মুসিবতে নিক্ষিপ্ত হবে। আর তা না হলেও কাইসারের বিপুল সৈন্যেরা মুকাবিলায় তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই মুনাফিকের দল মদীনায় একটি চক্রান্তের মসজিদও[৫২] বানিয়ে নিয়েছিলো। সেখানে তারা নামাযের বাহানায় সাধারণ মুসলমানদের থেকে আলাদাভাবে জমায়েত হতো এবং গোপন সলা-পরামর্শ করতো। তারা এই সংকটকালে ইসলামী আন্দোলনের ওপর চরম আঘাত হানবার জন্যে নানারূপ ষড়যন্ত্র উদ্ভাবন করতে লাগলো। এমন কি, তারা এই সিদ্ধান্ত পর্যন্ত করে বসলো যে, তাবুক যুদ্ধের ফলাফল জানবার পরই (যদিও এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত ছিলো যে, মুসলমানদের পরাজয়ই হবে যুদ্ধের একমাত্র ফলাফল) আবদুল্লাহ বিন্ উবাইকে মদীনার বাদশাহ নিযুক্ত করা হবে।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় ছিলো অন্য রকম। এবার ইসলামের পরাজয় সম্পর্কে মুনাফিক ও কাফিরদের সমস্ত আশা-ভরসাই চূড়ান্তভাবে বিলীন হওয়ার সেই প্রতীক্ষিত সময়টি ঘনিয়ে এলো। তাই তাবুকের এই বিনা-যুদ্ধে বিজয়ের কথা জানতে পেরে দুশমনদের মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে পড়লো। তাদের মনে হতে লাগলো, এবার তাদের আশা-ভরসার শেষ সম্বলটুকুও হাতছাড়া হয়ে গেলো।

তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সামনে তিনিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলো ঃ

১. মুনাফিকদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ এবং তাদের গোপন চক্রান্ত থেকে ইসলামী আন্দোলনকে সুরক্ষিত করার পুরোপুরি ব্যবস্থা করা;

৫২. এ সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা আসছে।

www.icsbook.info

২. মুমিন ও সত্যসন্ধ লোকদের প্রশিক্ষণ দান এবং তাদের চরিত্র গঠন করে নবী করীম (স)-এর তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠা সৎ লোকদের এই দলটিকে সর্বতোভাবে নিখুঁত করে তোলা এবং 'সত্যের সাক্ষ্য' (শাহাদাতে হক) দানের যে দায়িত্ব শীগ্‌গীরই তাদের ওপর ন্যস্ত হতে যাচ্ছে, তা যথাযথভাবে পালনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রস্তুত করে রাখা;

৩. যে সব মৌল নীতির ভিত্তিতে এই নয়া ইসলামী রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে, দারুল ইসলামের সেই সব নীতি সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করা।

মুনাফিকদের সাথে আচরণ

তাবুক থেকে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যেই সূরা তওবা নাযিল হলো। এতে মদীনায় ফিরেই হযরত মুহাম্মদ (স)-কে কার্যকর করতে হবে, আল্লাহ তাঁকে এমনতরো কতিপয় নির্দেশ প্রদান করলেন। এ যাবত মুনাফিকদের ব্যাপারে যে নমনীয় নীতি গ্রহণ করা হয়েছিলো এবং যার ফলে তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে তাদের জান বাঁচানোর জন্যে পেশকৃত অক্ষমতাকে মেনে নেয়া হয়েছিলো, তা সম্পূর্ণ বদলে ফেলার নির্দেশ দেয়া হলো। তারপর সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হলো ঃ 'তাদের সঙ্গে এখন আর নমনীয় নয়,কঠোর ব্যবহার করতে হবে; তারা তাদের ঈমানের দাবিকে সত্য প্রমাণের জন্যে আর্থিক সাহায্য দিতে চাইলে তা গ্রহণ করা যাবে না; তাদের ভেতরকার কেউ মারা গেলে নবী করীম (স) তার জানাযা পড়াতে পারবেন না; সর্বোপরি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কের কারণেও মুসলমানরা তাদের সঙ্গে আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে পারবে না।'

আবু আমেরের ষড়যন্ত্র

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদীনা আগমনের পূর্বে আবু আমের নামক জনৈক খ্রিষ্টান পাদ্রীর দরবেশী ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে মদীনায় খুব খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। একজন খোদাভক্ত জ্ঞানী হিসেবে লোকেরা তাকে খুব শ্রদ্ধা করতো। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মদীনায় আসার পর এই দরবেশী ও খোদাভক্তির তাগিদেই তার উচিত ছিলো সত্যের আলো থেকে ফায়দা হাসিল করা এবং সবার আগে খোদা-ভক্তির নির্ভুল ধারণাকে গ্রহণ করা। কিন্তু ইলম, কালাম ও তাকওয়ার অহমিকা এবং রেওয়াজী ও গতানুগতিক ধার্মিকতার মোহ যেমন মানুষকে সত্যের আলো গ্রহণ থেকে বিরত রাখে, তেমনি আবু আমেরের ওপরও ইসলামী দাওয়াতের প্রতিকূল প্রভাব পড়লো। ধার্মিকতার ব্যবসায়ে তার বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলো। সে বুঝতে পারলো, তার ভণ্ড দরবেশী ও পীরবাদী ব্যবসা এই নয়া আন্দোলনের মুকাবিলায় টিকতে পারে না। এ কারণে সে ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে বড়ো দুশমন হয়ে দাঁড়ালো।

www.icsbook.info

প্রথমত সে আশা করেছিলো যে, এ-তো কেবল দুদিনের চমক মাত্র। এরূপ কঠোর খোদাভক্তি ও দ্বীনদারী কি করে টিকে থাকে? কিন্তু বদর যুদ্ধে কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় দেখেই তার টনক নড়ে উঠলো। তারপর থেকে সে কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্যে আদা-পানি খেয়ে লাগলো। ওহুদের যুদ্ধ ও খন্দকের (আহযাবের) হামলার সময় মুসলমানদের সামনে এরই কিছু নমুনা প্রকাশ পেয়েছিলো। এমন কি, এই ঈসায়ী আহলি কিতাব মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাথে গোপন আঁতাত স্থাপন করতে এবং তওহীদের আলোকবর্তিকাকে নিভানোর জন্যে শিরকের প্রচার করতে এতটুকু লজ্জাবোধ করেনি। কিন্তু আল্লাহ্‌র এই ঘোষণা যখন প্রকাশ পেলো যে, এ আলোকবর্তিকাকে ফুৎকার দ্বারা নিভানো যাবে না এবং ইসলামই তামাম আরব উপদ্বীপে বিজয়ী দ্বীন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তখন এই খোদাভক্ত দরবেশের (?) অস্থিরতা চরমে গিয়ে পৌছলো। এরপর অল্প দিনের মধ্যেই সে বিদেশে গিয়ে বিপদ-সংকেত বাজানো এবং এই ক্রমবর্ধমান সয়লাবকে প্রতিরোধ করার নিমিত্ত কাইসারকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে রোম সফরে গেলো।

চক্রান্তের মসজিদ

আবু আমেরের এই সব চক্রান্তে মদীনার মুনাফিকরা তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলো। এরা আমেরের সাথে মিলে গোপনে পরামর্শ করে ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করার পন্থা উদ্ভাবন করতো। তাই আবু আমেরের পরামর্শক্রমে মুনাফিকের দল নিজেদের জন্যে একটি পৃথক মসজিদ বানানোর সিদ্ধান্ত করলো।৫৩ ঐ মসজিদে তারা নামায পড়ার অজুহাতে জমায়েত হতো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতো।

তখন মদীনায় দু'টি মসজিদ ছিলো। এর একটি ছিলো শহরের উপকণ্ঠে—কুবা নামক স্থানে আর অপরটি ছিলো শহরের মাঝখানে—মসজিদে নববী নামে যা পরিচিত। এ দুয়ের উপস্থিতিতে কোনো তৃতীয় মসজিদের আদতেই প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু কতিপয় বৃদ্ধ ও অক্ষম লোকের ঐ দুই মসজিদে যেতে কষ্ট হয়, এই অজুহাত তুলে মুনাফিকরা একটি তৃতীয় 'মসজিদ' নির্মাণ করলো। তারা কল্যাণ ও বরকতের সাথে এর উদ্বোধন করার নিমিত্ত একবার নামায পড়ানোর জন্যে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে আবেদন জানালো। সে আবেদনের জবাবে হযরত মুহাম্মদ (স) বললেন ঃ 'বর্তমানে আমি তাবুক অভিযানের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত; ফিরে আসার পর দেখা যাবে।' কিন্তু ফিরবার সময় পথিমধ্যেই এই চক্রান্তের মসজিদে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নামায পড়ানো নিষিদ্ধ করে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করলেন। এতে স্পষ্টত বলে দেয়া হলো যে, প্রকৃতপক্ষে এ জায়গাটি হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার একটি গোপন আড্ডা; এ আপনার নামায পড়ানোর উপযোগী স্থান নয়। তাই হযরত মুহাম্মদ (স) কতিপয় লোককে তাঁর মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই উক্ত মসজিদ ধ্বংস করে ফেলার আদেশ দিলেন। এভাবে উক্ত চক্রান্তের মসজিদ ধ্বংস করে মুনাফিকদের

www.icsbook.info

বিরুদ্ধে মুসলমানদের ভবিষ্যত কর্মনীতিই ঘোষণা করা হলো। এরপর থেকে হযরত মুহাম্মদ (স) এই কর্মনীতিই সর্বত্র অনুসরণ করলেন।

মুমিনদের প্রশিক্ষণ ও তার পূর্ণতা

এখান থেকে ইসলামী আন্দোলন একটি ব্যাপকতর সংগ্রামের পর্যায়ে প্রবেশ করলো। এবার আরবের এই মুষ্টিমেয় মুসলমানদের গোটা অমুসলিম দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র দ্বীনের পয়গাম ছড়িয়ে দেয়ার অভিযানে বহির্গত হবার সময় ঘনিয়ে এলো। এহেন অবস্থায় মুসলিমদের ভেতরকার কোনো মামুলি দুর্বলতাও বিরাট অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই, এ সময় মুমিনদের প্রশিক্ষনেণর পূর্ণতা বিধানের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগ দেয়া হলো। তাদের ঈমানী দুর্বলতার প্রতিটি আলামতকে বেছে বেছে চিহ্নিত করা হলো এবং অবিলম্বে তা দূর করার তাগিদ দেয়া হলো।

তাবুক অভিযান কালে ঈমান ও ইসলামের মিথ্যা দাবিদার কিছু লোক যেমন পেছনে পড়েছিলো, তেমনি কিছু দুর্বল-চেতা মুমিনও মদীনায় থেকে গিয়েছিলো। এরা সাচ্চা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কোনো সাময়িক দুর্বলতা বা শৈথিল্যের কারণে এমনি গাফলতি করতে বাধ্য হয়েছিলো। এরূপ দুর্বলতা যাতে আর কখনো প্রকাশ না পায়, সেজন্যে এই শ্রেণীর লোকদের সংশোধন করার নিমিত্ত এ সময় অত্যন্ত কঠোর নীতি গ্রহণ করা হলো। এ প্রসঙ্গে হযরত কা'ব বিন্ মালিক, হিলাল বিন্ উমাইয়া এবং মুরারা বিন্ রাবী' (রা) এই তিনজন সাহাবীর কাহিনী অত্যন্ত শিক্ষামূলক। তখন মুসলিমদেরকে কি ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছিলো, এই কাহিনীর আলোকে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে আন্দাজ করা যায়। এই সাহাবীত্রয় নিঃসন্দেহে সাচ্চা মুমিন ছিলেন এবং এর আগে তাঁদের ঈমানের আন্তরিকতাও প্রমাণিত হয়েছিলো; তবু নিছক শৈথিল্যের দরুন তাঁরা তাবুক অভিযানের সময় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সহযাত্রী হতে পারেননি। এজন্যে তাঁদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবেও পাকড়াও করা হলো। নবী করীম (স) তাবুক থেকে ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে কোনোরূপ সালাম-কালাম না করার জন্যে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন। চল্লিশ দিন পর তাঁদের স্ত্রীদেরকেও আলাদা থাকবার নির্দেশ দেয়া হলো। অতঃপর পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের তওবা কবুল করলেন এবং তাঁদেরকে ক্ষমা করবার হুকুম দিলেন। এর ভিতর হযরত কা'ব বিন্ মালিকের কাহিনীটি সর্বাধিক শিক্ষামূলক বিধায় তাঁর জবানীতেই এখানে তা উদ্ধৃত করা হলো।

হযরত কা'বের কাহিনী

'হযরত মুহাম্মদ (স) যখন তাবুক অভিযানের উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে তৈরি করছিলেন, তখন আমিও তাঁর সঙ্গে চলার জন্যে প্রস্তুতি নেয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তারপর গাফলতি করতে লাগলাম ঃ 'এতো তাড়াহুড়া কেন, সময় যখন আসবে তখন

www.icsbook.info

তৈরি হতে বিলম্ব হবে না।' এইভাবে ব্যাপারটা পিছিয়ে যেতে লাগলো। এমন কি যখন রওয়ানা করার সময় এলো, তখন আমি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলাম। মনে মনে বললাম ঃ সৈন্যরা চলে যাক, আমি দু একদিন পর রওয়ানা করেও কাফেলার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে পারবো। মোটকথা, এমনি গাফলতির মধ্যেই সময় চলে গেলো; আমিও আর যেতে পারলাম না।

অবশেষে যখন দেখতে পেলাম যে, যাদের সঙ্গে আমি পিছনে পড়ে রয়েছি, তারা হয় মুনাফিক নতুবা এমন দুর্বল যে, আল্লাহ্‌ই তাদের অক্ষম করে রেখেছেন, তখন আমার হৃদয়ে অপরিসীম চাঞ্চল্য উথলে উঠলো। নিজের সম্পর্কে আমার অত্যন্ত আফসোস হলো।

নবী করীম (স) অভিযান থেকে ফিরে এসেই অভ্যাসমতো মসজিদে গিয়ে দু রাক'আত নামায পড়লেন। অতঃপর লোকদের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্যে বসলেন। এবার মুনাফিকরা এসে তাদের ওজর পেশ করতে লাগলো। তারা কসম করে তাদের অক্ষমতা সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে নিশ্চয়তা প্রদান করতে লাগলো। এরূপ লোকের সংখ্যা আশির চেয়ে কিছু বেশি ছিলো। হযরত মুহাম্মদ (স) তাদের সমস্ত মনগড়া কথা শুনলেন এবং তাদের প্রকাশ্য ওজর কবুল করে তার গোপন রহস্য খোদার ওপর ছেড়ে দিলেন। এভাবে তাদেরকে মাফ করে দেয়া হলো।

এরপর এলো আমার পালা। আমি সামনে গিয়ে সালাম নিবেদন করলাম। হযরত মুহাম্মদ (স) আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'বলো কি জিনিস তোমায় বিরত রেখেছিলো?' আমি বললাম ঃ 'খোদার কসম, আমি যদি কোনো দুনিয়াদারের সামনে হাযির হতাম তো অবশ্যই কোনো-না-কোন মনগড়া কথা বলে তাকে রাযী করিয়ে নিতাম। কিন্তু আপনার সম্পর্কে তো এই ঈমানই পোষণ করি যে, এখন যদি কোনো বানোয়াট কথা বলে আপনাকে রাযী করিয়ে নিই, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই আমার প্রতি আপনাকে নারাজ করে দেবেন। কাজেই সত্য কথা বললে আপনি যদি অসন্তুষ্টও হন, তবুও আশা করবো, আল্লাহ আমার ক্ষমার জন্যে কোনো-না-কোন উপায় বের করে দেবেনই। সত্য কথা এই যে, আপনার কাছে উত্থাপন করার মতো কোনো ওজরই আমার নেই। আমি অভিযানে যেতে পুরোপুরি সমর্থ ছিলাম'।

এরপর হযরত মুহাম্মদ (স) বললেন ঃ 'এ লোকটি নিশ্চয়ই সত্য কথা বলেছে। আচ্ছা উঠে যাও এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।' আমি উঠে গিয়ে আপন গোত্রের লোকদের সঙ্গে বসলাম। অতঃপর আমার ন্যায় আরো দুই ব্যক্তি—মুরারা বিন রাবী' এবং হিলাল বিন্ উমাইয়াও একইরূপে সত্য কথা বললো।

www.icsbook.info

এরপর আমাদের সঙ্গে কারো কথাবার্তা না বলার জন্যে নবী করীম (স) নির্দেশ দিলেন। এর ফলে অপর দুই ব্যক্তি ঘরেই বসে রইলো। কিন্তু আমি বাইরে বের হতাম, জামা'আতের সঙ্গে নামায পড়তাম, বাজারে চলাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতো না। আমার মনে হতো, দুনিয়াটা যেন একেবারে বদলে গেছে, আমি একজন নবাগত, এখানে আমার কেউ পরিচিত নয়। মসজিদে নামায পড়তে গেলে নবী করীম (স)-কে সালাম করতাম এবং জবাবের জন্যে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নড়ে কি-না, তা দেখবার জন্যে শুধু ইন্তেজার করতাম। হযরত মুহাম্মদ (স) আমার প্রতি কিরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, নামাযের মধ্যে তা আড়চোখে দেখতাম। আমি যতক্ষণ নামায পড়তাম, হযরত মুহাম্মদ (স) আমার দিকে চেয়ে থাকতেন; যখনই আমি সালাম ফিরাতাম, তখন আমার দিক থেকে তিনি দৃষ্টি সরিয়ে নিতেন।

একদিন আমি ভয়ে ভয়ে আমার চাচাত ভাই এবং বাল্যবন্ধু আবু কাতাদার কাছে গেলাম। তার বাগানের প্রাচীরের ওপর উঠে তাকে সালাম করলাম; কিন্তু আল্লাহ্‌র এই বান্দাহ সালামের জবাবটি পর্যন্ত দিলো না। আমি বললাম ঃ 'আবু কাতাদাহ' আমি তোমায় খোদার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আমি কি খোদা এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসি না'? সে নিরুত্তর রইলো। আবার জিজ্ঞেস করলাম। এবারও সে নিরুত্তর রইলো। তৃতীয় বারে শুধু এটুকু বললো, 'আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' এতে আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে এলো। আমি প্রাচীর থেকে নেমে এলাম।

এ সময় একদিন আমি বাজারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমনি সময় সিরিয়ার একটি লোক আমায় শাহ গাসবানের একটি খামে-পোরা চিঠি দিলো। আমি খুলে পড়লাম। তাতে লেখা ছিলো ঃ আমরা শুনেছি, তোমাদের সাহেব তোমার ওপর ভীষণ উৎপীড়ন চালাচ্ছে। তুমি কোনো ইতর লোক নও অথবা নষ্ট করে ফেলার উপযোগী কোনো লোকও নও। তুমি আমাদের কাছে এসো, আমরা তোমায় কদর করবো।' আমি বললাম, এ আর এক বিপদ দেখছি! তক্ষুণি চিঠিখানি চুলায় নিক্ষেপ করলাম।

চল্লিশ দিন এমনিভাবে অতিক্রম করার পর নবী করীম (স)-এর আদেশ এলো, 'আপন স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যাও।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাকে কি তালাক দিয়ে দেবো? জবাব পেলাম, 'না শুধু আলাদা থাকো।' আমি আমার স্ত্রীকে তার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিলাম এবং বললাম, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোনো সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ইন্তেজার করো।

পঞ্চাশতম দিন সকালে নামাযের পর আমি আপন গৃহের ছাদের ওপর বসেছিলাম এবং নিজের জীবনকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি আমায় উপর্যুপরি ডেকে ডেকে বললো ঃ 'মুবারক হোক কা'ব বিন্‌ মালিক।' আমি এ কথা শুনেই সিজদায় গেলাম। তারপর জানতে পারলাম, আমার জন্যে ক্ষমার হুকুম এসেছে। এরপর দলে

www.icsbook.info

দলে লোক ছুটে আসতে লাগলো এবং একজন অন্যজনের আগে এসে আমায় এই বলে মুবারকবাদ দিতে লাগলো যে, তোমার তওবা কবুল হয়েছে। আমি উঠে সোজা মসজিদে নববীর দিকে গেলাম। দেখলাম, নবী করীম (স)-এর মুখমন্ডল খুশীতে ঝলমল করছে। আমি সালাম করতেই তিনি বললেন, 'তোমার মুবারক হোক, এই দিনটি তোমার জীবনের সবচেয়ে উত্তম দিন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ক্ষমা কি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর তরফ থেকে, না খোদার তরফ থেকে? তিনি বললেন, 'খোদার তরফ থেকে।' সেই সঙ্গে কুরআনের এই তওবা সংক্রান্ত আয়াতটিও তিনি পড়ে শুনালেন।

আমি বললাম ঃ 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার তওবার মধ্যে আমার সমস্ত ধন-সম্পদ খোদার পথে সদকা করে দেয়ার কথাও শামিল রয়েছে'। তিনি বললেন, 'কিছু রেখে দাও, এটা তোমার জন্যে উত্তম হবে।' আমি তাঁর নির্দেশ মতো খায়বরের অংশটি রেখে বাকীসব সদকা করে দিলাম। অতঃপর আমি আল্লাহ্‌র কাছে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করলাম ঃ যে সত্যের বদলে আল্লাহ আমায় ক্ষমা করে দিলেন, তার ওপর সারা জীবন আমি অবিচল থাকবো। তাই আজ পর্যন্ত আমি জেনে-শুনে কোনো অসত্য কথা বলিনি। আর আশা করি, ভবিষ্যতেও আল্লাহ এর থেকে আমায় রক্ষা করবেন।

ইসলামী সমাজের বৈশিষ্ট্য

এই কাহিনী থেকে সাহাবায়ে কিরামের সমাজ-জীবনের যে চিত্র ফুটে ওঠে, তার কতিপয় উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক মুমিনেরই সামনে রাখা উচিত। এ থেকে ইসলামী আন্দোলন স্বীয় অনুবর্তীদের ভেতর কিরূপ মেজাজ গড়ে তোলে, তা সহজে আন্দাজ করা যাবে।

প্রথম কথা এই যে, ইসলাম ও কুফরের মধ্যে যখন সংঘর্ষের প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন মুমিনদের জন্যে অত্যন্ত কঠোর পরীক্ষার সময় এসে উপস্থিত হয়। এ সময় সামান্য মাত্র গাফলতির কারণেও সারা জীবনের পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যেতে পারে। কারণ এমনি সময়ে কোনো মুমিন যদি ইসলামের সহায়তা না করে, তাহলে তার এই ত্রুটির পেছনে কোনে বদ্‌-নিয়্যাত না থাকলেও এবং এ রকম ত্রুটি সারা জীবনে একবার মাত্র সংঘটিত হলেও এরূপ ত্রুটির কারণে তার সারা জীবনের পুণ্য ও ইবাদত বরবাদ হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিতে পারে। বস্তুত মুমিনদের জন্যে কখনো ইসলামের বদলে কুফরের সহায়তা করা অথবা কোনো অন ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে উৎসাহব্যঞ্জক কর্মনীতি গ্রহণ করার আদৌ অবকাশ নেই। বিশেষত যখন অন-ইসলামী আন্দোলনের মুকাবিলায় কোনো ইসলামী আন্দোলন উপস্থিত থাকে,তখন মুমিনদের যোগ্যতা-প্রতিভা আল্লাহ্‌র দ্বীনকে সমুন্নত করার পরিবর্তে অন্য কাজে নিয়োজিত হলে অবস্থাটা আরো গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়।

www.icsbook.info

দ্বিতীয় কথা এই যে, ইসলামী আদর্শের পথে যখন কোনো কর্তব্য পালনের ডাক আসে, তখন মুমিনদের পক্ষে শৈথিল্য দেখানো মোটেই উচিত নয়। কারণ শৈথিল্য দেখাতে দেখাতেই কাজের সময় চলে যায়; অতঃপর এই ত্রুটির পেছনে কোনো বদ্‌নিয়্যাত ছিলো না, এ ওজরেও কোনো ফলাদয় হয় না।

সাহাবায়ে কিরামের সমাজ-কাঠামোর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য এই যে, মুনাফিকরা মনগড়া ওজর পেশ করছে এবং তারা মিথ্যা কথা বলছে, এটা সবারই জানা; তবু নবী করীম (স) শুধু তাদের মুখের কথা শুনেই তাদের সমস্ত অন্যায় মাফ করে দিলেন। কারণ, তারা কোনো পরীক্ষার সময় ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করবে, এ আশা কখনো ছিলো না। পক্ষান্তরে এদের মুকাবিলায় ঈমান ও ইখলাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কতিপয় সাচ্চা মুমিনের চরিত্র লক্ষ্যণীয়। মনগড়া ওজর তুলে পালানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এঁরা কেউ মিথ্যা কথা বলা পসন্দ করলেন না; বরং সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির কারণেই তাঁদেরকে রেহাই দেয়া হলো না, বরং তাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করা হলো। এটা তাঁদের ঈমান ও ইখলাস সম্পর্কে কোনো সন্দেহ সৃষ্টির কারণে নয়; বরং এজন্যে যে, মুনাফিকদের উপযোগী কাজ তারা কেন করতে গেলেন?

পরন্তু এই অপরাধের জন্যে নেতা যে শাস্তি দিলেন এবং অনুবর্তী তা যেভাবে ভোগ করলেন, সর্বোপরি গোটা সমাজ যেভাবে নেতার অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করলো, তার প্রতিটি দিকই অনুপম ও অতুলনীয়। নেতা খুব কঠোর শাস্তি দিলেন; কিন্তু ঘৃণা বা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নয়, প্রগাঢ় ভালোবাসা নিয়ে। কোনো স্নেহশীল পিতা যেমন অপরাধী পুত্রকে সাজা দেন এবং পুত্র সংশোধিত হলে আবার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরারও প্রত্যাশা করেন, এ শাস্তি ঠিক তেমনি। শাস্তির কঠোরতায় অনুবর্তী অত্যন্ত অস্থির। কিন্তু কি আশ্চর্য! প্রিয় নেতার আনুগত্যের বদলে তাঁর অন্তরে না কোনো বিদ্রোহের ভাব জাগলো, না তিনি কোনো অভিযোগ করলেন আর না তাঁর কৃতিত্বের কোনো প্রতিদান চাইলেন। তারপর গোটা সমাজের মধ্যে নেতার হুকুম পালন করার ভাবধারা কতো তীব্র, তাও লক্ষ্যণীয়। যখনই আদেশ হলো যে, অমুক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে, তখন মনে হলো যেনো গোটা সমাজে তাঁর কোনো পরিচিত লোকেরই অস্তিত্ব নেই। আবার যখন তাঁর ক্ষমার কথা ঘোষিত হলো, তখন সবার আগে গিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে সমাজের প্রতিটি লোকই অস্থির হয়ে উঠলো।

বস্তুত নবীর আনুগত্যের এই নমুনাই কুরআন তার অনুসারীদের মধ্যে সৃষ্টি করতে চায়। আর ইসলামী আন্দোলনের কর্মী-কর্মাধ্যক্ষ ও নেতার মধ্যে এমনি ভাবধারা থাকাই বাঞ্ছনীয়। সাহাবীদের মধ্যে এমনি ভাবধারা থাকার কারণেই যখন অপরাধী দেখলেন, তাঁর চেয়ে বড়ো বড়ো অপরাধীও নিছক মিথ্যা বলে বেঁচে যাচ্ছে এবং সত্য কথা বলার

www.icsbook.info

জন্যেই তাঁকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হচ্ছে, তখন তাঁর ভেতর এতোটুকু ক্ষোভ পর্যন্ত জাগলো না, কোনোরূপ অসন্তোষও প্রকাশ পেলো না; বরং শাস্তি পাবার পর দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত তিনি তা কঠোরভাবে ভোগ করলেন। তাঁর সঙ্গে যে নির্মমতা করা হয়েছে, এরূপ ধারণাও তাঁর মনে এক মুহূর্তের তরেও ঠাঁই পেলো না। তাঁর অতীতের সমস্ত কৃতিত্ব ম্লান হয়ে গেলো; তাঁর ঈমান ও ইখলাস সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হলো। অথচ তাঁর বদ্-নিয়্যাত ছিলো না, তাঁর হৃদয়ও আল্লাহ এবং রাসূলের ভালবাসা থেকে শূন্য ছিলো না। পরন্তু তিনি ইসলামী সমাজ-সংগঠনের মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র পাকালেন না, লোকদেরকে বীতশ্রদ্ধ করে তুললেন না, অন্যান্য লোকদেরকেও নিজের সমর্থক বানিয়ে সমাজ-সংগঠনের মধ্যে উপদল সৃষ্টির চেষ্টা করলেন না; বরং নিতান্ত ধৈর্য ও প্রশান্তির সঙ্গে তিনি শাস্তি ভোগ করলেন এবং কবে তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে, প্রতিটি মুহূর্ত সেই আশায় অতিবাহিত করলেন। এহেন আদর্শ কর্মনীতির ফলেই আল্লাহ তা'আলা নিতান্ত দরদপূর্ণ ভাষায় শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করলেন। বস্তুত মুসলিম হিসেবে এই হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। আর আল্লাহ যাকে দান করেন, কেবল সে-ই এতোবড়ো অনুগ্রহ লাভ করতে পারে।

একজন লোকের ওপর ঈমান ও ইসলামের দাবি কতোখানি দায়িত্ব অর্পণ করে, এ সময় তাও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হলো। বলা হলো ঃ প্রকৃতপক্ষে এ দাবির পর মুমিনদের নিজস্ব বলতে আর কিছুই থাকে না; কারণ পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী 'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন।' (সূরা তওবা ঃ ১১১)।

বস্তুত ঈমানের এই ব্যাখ্যা যতক্ষণ লোকের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল না হবে এবং প্রতি মুহূর্ত তা সামনে না থাকবে, ততক্ষণ দ্বীনের দাবি পূরণে সে অবশ্যই শৈথিল্য দেখাবে। আল্লাহ তা'আলা ঈমানকে মুমিন ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার একটা চুক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। এ চুক্তি হচ্ছে এই যে, বান্দাহ তার আপন সত্তা ও ধন-মালকে যেনো আল্লাহর কাছে বেচে দিলো এবং তার বিনিময়ে আল্লাহ মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনে তাকে জান্নাত দান করবেন—এই প্রতিশ্রুতিকে গ্রহণ করলো।

সত্য কথা বলতে গেলে মানুষের জান, মাল সব কিছু আল্লাহ্‌রই সম্পদ। তিনিই এসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন আর তিনিই এর প্রকৃত মালিক। এমতাবস্থায় বান্দাহ আল্লাহ্‌র কাছে বেচতে পারে তার এমন নিজস্ব কোন্ জিনিসটা রয়েছে? এভাবে বেচা-কেনার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ মানুষকে একটা স্বাধীন কর্মক্ষমতা (Freedom of work) দান করেছেন এবং তাকে আপন ইচ্ছানুযায়ী কাজে লাগাবার ইখতিয়ারও দিয়েছেন। ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতার এই স্বাধীনতাবলে মানুষ আল্লাহর দেয়া জান ও মালকে ইচ্ছা করলে আল্লাহরই সম্পত্তি বলে মানতে

www.icsbook.info

পারে—প্রকৃতপক্ষে যেরূপ হওয়া উচিত—আবার ইচ্ছা করলে সে নিজেকেই ঐ জিনিসগুলোর মালিক বলে দাবি করতে পারে—যদিও সে ঐগুলোর মালিক নয়। এই উভয় প্রকার স্বাধীনতাই তাকে দান করা হয়েছে। মানুষ ইচ্ছা করলে খোদার প্রতি বিমুখ হয়ে তার জান ও মালকে নিজের ইচ্ছা-প্রবৃত্তি কিংবা তারই মতো অন্য মানুষের ইচ্ছা-প্রবৃত্তি অনুযায়ী যদৃচ্ছ ব্যবহার করতে পারে অথবা ইচ্ছা করলে প্রকৃত মালিককে মেনে নিয়ে তাঁর দেয়া জান-মালকে তাঁরই মর্জী মাফিক কাজে লাগাতে পারে এবং এভাবে তার কাছে গচ্ছিত জিনিসগুলো যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই আমানত এবং এগুলোর ব্যবহারে সে স্বাধীন কিংবা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী নয়, এ সত্যকে সে স্বীকৃতি দিতে পারে। এই উভয়বিধ ক্ষমতাই তাকে দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়টিকে অনুগ্রহবশত বেচা-কেনা বলে আখ্যা দিয়েছেন, ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতার এই সামান্য স্বাধীনতাই হচ্ছে তার মূল ভিত্তি। আল্লাহ তা'আলা বান্দাহকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, ইচ্ছা ও ইখতিয়ারের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তুমি আমার গচ্ছিত আমানতকে যদি খেয়ানতের কাজে না লাগাও বরং আমারই মর্জি মাফিক তা কাজে ব্যবহার করো, তাহলে এই স্বল্পায়ু জীবনের পরবর্তী অনন্ত জীবনে আমি তোমায় বেহেশতের সুখ-সম্পদে সম্মানিত করবো। সুতরাং যে ব্যক্তি এক্ষণে আল্লাহ তা'আলার এই দাবি ও প্রতিশ্রুতিকে মেনে নিয়ে নিজের জান ও মালকে তাঁরই পসন্দনীয় কাজে ব্যবহার করার স্বীকৃতি দেয়, সে-ই হচ্ছে ঈমানদার এবং তার এ স্বীকৃতিকেই আল্লাহ তা'আলা বেচা-কেনা বলে অভিহিত করেছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ দাবি ও প্রতিশ্রুতিকে অগ্রাহ্য করে নিজের জান-মালকে আল্লাহ্‌র মর্জির বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ সঙ্গে এই বেচা-কেনার কারবার করতেই অস্বীকৃতি জানায়। তাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে হচ্ছে কাফির এবং তার এই অস্বীকৃতিই হচ্ছে কুফর।

তাবুক যুদ্ধের সময় নবী করীম (স) যে সব লোককে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা সবাই ছিলো ঈমানের দাবিদার। এরা সকলেই আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে উপরোল্লিখিত বেচা-কেনার চুক্তি করেছিলো। কিন্তু যখন তাদের দাবি প্রমাণের সময় এলো, তখন তাদের কিছু লোক পরীক্ষায় সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারলো না। তারা আপন জান ও মালকে আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করা থেকে বিরত রইলো। এদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলো মুনাফিক। তাদের ঈমানের দাবি ছিলো মিথ্যা। তারা শুধু অক্ষমতা বা চাপের ফলেই ইসলামী সংগঠনে অনুপ্রবেশ করেছিলো। কিন্তু তাদের সঙ্গে কতিপয় দুর্বলচেতা লোকও ছিলেন, যাঁরা শুধু গাফলতি ও শৈথিল্যের দরুণ এ ভুলটা করেছেন। তাই এ সময় তাঁদের খোলাখুলি সমালোচনা করার পর এ কথাও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হলো যে, কেবল খোদার অস্তিত্ব মেনে নেয়াকেই ঈমান বলা যায় না; বরং খোদাকেই আমাদের জান-মালের একমাত্র মালিক বলে স্বীকৃতি দেয়াই হচ্ছে প্রকৃত

www.icsbook.info

ঈমান। এভাবে আল্লাহ তা'আলাকে চূড়ান্ত মালিক মেনে নেবার পর কেউ যদি স্বীয় জান ও মালকে আল্লাহ্‌র পথে নিয়োজিত করতে কুণ্ঠিত হয় এবং তাকে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করে, তাহলে কার্যত তার স্বীকৃতিটা মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হবে। তাই ঈমানের প্রত্যেক দাবিদারেরই তার দাবির এই তাৎপর্য হামেশা স্মরণ করা উচিত এবং আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রাম করার কোনো সুযোগ গ্রহণেই তার কুণ্ঠিত হওয়া অনুচিত।

জনসাধারণের দ্বীনী প্রশিক্ষণ

ইসলামের সূচনাকালে যে সব লোকের হৃদয়ে ইসলামের সত্যতা আসন পেতে নিতো এবং যারা পুরোপুরি বুঝে-শুনে ইসলাম গ্রহণ করতো, কেবল তারাই এ আন্দোলনের সহায়তা করতে এগিয়ে আসতো। কিন্তু এ পর্যায়ে ইসলামের প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় দলে দলে লোকেরা ইসলামের মধ্যে দাখিল হতে লাগলো। দেশের পর দেশ, জনপদের পর জনপদ ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করে নিলো। এর ফলে খুব কম লোকই পুরোপুরি বুঝে-শুনে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পেলো; বরং বেশির ভাগ লোকই অল্প কিছু জেনে-শুনে ইসলামের সহায়তা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। এভাবে হাজার হাজার লোক ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে লাগলো। দৃশ্যত এই পরিস্থিতিটা ছিলো ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো জনসমষ্টি ইসলামের দাবিগুলোকে উত্তমরূপে বুঝতে না পারবে এবং ইসলাম কর্তৃক অর্পিত নৈতিক দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত না হবে, ততোক্ষণ সে ইসলামী সমাজের পক্ষে দুর্বলতারই কারণ হয়ে থাকবে। তাবুক অভিযানকালে এমনি পরিস্থিতিরই কিছুটা আভাস পাওয়া গিয়েছিলো। তাই এই সুযোগে ইসলামী আন্দোলনকে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা হলো। তাহলো এই যে, জনসাধারণের মধ্য থেকে কিছু লোককে ইসলামের কেন্দ্রসমূহ (যেমন মক্কা, মদীনা ইত্যাদি) আসতে হবে এবং এসব কেন্দ্র থেকে ইসলামের শিক্ষা-দীক্ষা ও তার বিস্তারিত নিয়ম-কানুন শিখে তাদেরকে সত্যিকার ইসলামী ভাবধারা আত্মস্থ করতে হবে। অতঃপর মুসলিম জন-মানসে সঠিক ইসলামী চেতনা জাগ্রত করার ও তাদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী সম্পর্কে অবহিত করানোর উদ্দেশ্যে এই শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদেরকে আপন আপন জনপদে ফিরে গিয়ে জনগণের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই সাধারণ ইসলামী শিক্ষার অর্থ কেবল লোকদেরকে কিছু লেখা-পড়া শেখানোই ছিলো না; বরং লোকদের মধ্যে দ্বীনী চেতনা সৃষ্টি এবং ইসলামী ও অন-ইসলামী জীবন পদ্ধতির পার্থক্যবোধ জাগিয়ে তোলাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কোনো গৎবাঁধা প্রক্রিয়া ছিলো না। এটা লেখাপড়া শিখিয়েই হোক আর না শিখিয়েই হোক, কোনো প্রকারে হাসিল করতে পারলেই হলো। কেননা, মুখ্য উদ্দেশ্য হলো দ্বীন

www.icsbook.info

সম্পর্কে সঠিক চেতনা সৃষ্টি করা। এজন্যে লেখাপড়া একটা মাধ্যম হতে পারে, উদ্দেশ্য নয়।[৫৪]

দারুল ইসলামের সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা

ইসলামী আন্দোলন একদিন না একদিন প্রচণ্ড রকমের একটা আঘাত খেয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে বলে মুনাফিকরা এদ্দিন মনে মনে আশা পোষণ করে আসছিলো। কিন্তু তাবুক অভিযানের পর তাদের সব আশা-ভরসাই ধুলিসাৎ হয়ে গেলো। এক্ষণে এই শ্রেণীর লোকদের সামনে ইসলামের চৌহদ্দীতে আশ্রয় গ্রহণ করা কিংবা তারা নিজেরা ইসলাম গ্রহণ না করলেও তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর রইলো না।

এ সময় সমগ্র আরব ভূমির শাসন ক্ষমতা মুসলিমদের হাতে নিবদ্ধ ছিলো। তাদের মুকাবিলা করার মতো উল্লেখযোগ্য কোনো শক্তি বর্তমান ছিলো না। তাই এবার ইসলামী হুকুমতের অভ্যন্তরীণ নীতি ঘোষণার সময় এলো। নিম্নোক্ত পন্থায় সেই নীতি ঘোষণা করা হলো ঃ

ক. আরব উপদ্বীপ থেকে শিরককে সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। পুরানো মুশরিকানা ব্যবস্থাকে খতম করে আরব ভূমিকে চিরকালের জন্যে ইসলামের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে মুশরিকদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে যতো চুক্তি রয়েছে, তা সব বাতিল ঘোষণা করতে হবে।

এই নীতি অনুসারে নবম হিজরীর হজ্জ উপলক্ষে নবী করীম (স) হযরত আলী (রা)-এর মারফত হাজীদের সাধারণ সামবেশে ঘোষণা করেন ঃ

১. যে ব্যক্তি দ্বীন-ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

২. এ বছরের পর কোনো মুশরিক কা'বা গৃহে হজ্জ করতে আসতে পারবে না।

৩. কাউকে নগ্ন হয়ে বায়তুল্লাহ্‌র চারদিকে তওয়াফ করার অনুমতি দেয়া হবে না।

৪. যাদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চুক্তি রয়েছে এবং যারা চুক্তির পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি, তাদের সঙ্গে চুক্তির শর্তানুযায়ীই ব্যবহার করা হবে এবং তার মেয়াদ পূর্ণ করা হবে। কিন্তু যারা চুক্তি থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের জন্যে আর মাত্র চার মাসের অবকাশ রয়েছে। এই অবকাশের

৫৪. যে লেখাপড়ার উদ্দেশ্য ইসলামী চেতনা সৃষ্টি নয়, বরং যার পরিণতিতে ইসলামী চেতনা থেকে বঞ্চিত হওয়াই অনিবার্য, প্রকৃতপক্ষে তা কোন জ্ঞানই নয়, বরং তা অজ্ঞতার শামিল।

www.icsbook.info

ভেতর হয় মুসলমানদের সঙ্গে লড়াই করে তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে হবে, নচেত দেশ ছেড়ে তাদেরকে চলে যেতে হবে অথবা বুঝে-শুনে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে গ্রহণ করে ইসলামী ব্যবস্থাপনায় শামিল হতে হবে।

খ. কা'বার তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা সম্পূর্ণত তওহীদবাদীদের হাতে থাকবে। এতে মুশরিকদের কোনো অধিকার থাকবে না। এবার থেকে কা'বার ভেতর কোনো মুশরিকানা প্রথা পালন করা যাবে না; এমন কি কোনো মুশরিক এই পবিত্র ঘরের নিকটে পর্যন্ত আসতে পারবে না।[৫৫]

৫৫. এই ঘোষণার আলোকে বায়তুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানকারীরা মুশরিক ও কাফিরদের সাথে কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বা দীর্ঘস্থায়ী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন না; কেননা এরূপ সম্পর্ক বা চুক্তি থাকলে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বায়তুল্লাহ্‌র ওপর পড়বেই এবং তাতে এই পবিত্র গৃহের মর্যাদা ক্ষুন্ন হবেই। ১৯৯০ সালে কুয়েত সঙ্কটের বাহানায় পবিত্র ভূমিতে ইহুদী-খ্রিষ্টান সৈন্যদের উপস্থিতিই এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।—সম্পাদক।

www.icsbook.info

১৮
বিদায় হজ্জ এবং ওফাত

হজ্জের জন্যে রওয়ানা

দশম হিজরীতে হযরত মুহাম্মদ (স) আবার হজ্জের ইরাদা করলেন। ঐ বছর জিলকদ মাসে তাঁর হজ্জে গমনের কথা ঘোষণা করে দেয়া হলো। এ সংবাদ তামাম আরব ভূমিতে ছড়িয়ে পড়লো। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সঙ্গে হজ্জ করার সৌভাগ্য অর্জনের নিমিত্ত সমগ্র আরববাসীর মধ্যে প্রবল আগ্রহ জাগলো। জিলকদের শেষ দিকে হযরত মুহাম্মদ (স) মদীনা থেকে যাত্রা করলেন এবং জিলহজ্জের চার তারিখে তিনি মক্কায় উপনীত হলেন। মক্কায় পদার্পণের পর প্রথমেই তিনি কা'বা শরীফ তওয়াফ করলেন। অতঃপর মাকামে ইবরাহীমে দু রাকাত নামায পড়লেন। তারপর পর্যায়ক্রমে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে আরোহণ করলেন এবং এবং সেখান থেকে কাজ সেরে আট তারিখ বৃহস্পতিবার সমস্ত সহযাত্রীকে নিয়ে মিনায় অবস্থান করলেন। পরদিন ৯ জিলহজ্জ সকালে ফজরের পর তিনি মিনা থেকে আরাফাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন। এখানে হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, যাতে ইসলামের পূর্ণ দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্যের প্রকাশ ঘটেছে। এই ভাষণে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করেন। নিম্নে এর কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

হজ্জের ভাষণ

'জনমণ্ডলী! শুনে রাখো, জাহিলী যুগের সমস্ত প্রথা ও বিধান আমার দু পায়ের নীচে।'

'অনারবদের ওপর আরবদের এবং আরবদের ওপর অনারবদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি সাদার ওপর কালোর কিংবা কালোর ওপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সবাই আদমের সন্তান আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মৃত্তিকা থেকে। মর্যাদার ভিত্তি হচ্ছে শুধু তাকওয়া।'

'মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। সাবধান! আমার পরে তোমরা একজন আরেক জনকে হত্যা করার মতো কুফরী কাজে লিপ্ত হয়ো না।'

'তোমাদের গোলাম! তোমাদের ভৃত্য! তোমরা নিজেরা যা খাবে, তা-ই তাদের খাওয়াবে; নিজেরা যা পরবে, তা-ই তাদের পরতে দিবে।'

'জাহিলী যুগের সমস্ত রক্তের বদলা বাতিল করে দেয়া হলো। (এখন আর কেউ

www.icsbook.info

কারো কাছ থেকে পুরানো রক্তের বদলা নিতে পারবে না। সর্বপ্রথম আমি নিজ খান্দানের রক্ত—রাবি'আ বিন্ হারিসের পুত্রের রক্ত বাতিল করে দিলাম।'

'জাহিলী যুগের সমস্ত সূদও বাতিল করে দেয়া হলো। (এখন আর কেউ কারো কাছে সূদ দাবি করতে পারবে না)। সর্বপ্রথম আমি নিজ খান্দানের সূদ—আব্বাস বিন্ আবদুল মুত্তালিবের সূদ—বাতিল করে দিলাম।[৫৬]

'মেয়েদের ব্যাপারে খোদাকে ভয় করো। জেনে রাখ, তাদের ওপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে তোমাদের ওপর তাদের অধিকার। তাদের কল্যাণের বিষয়ে আমার নসিহত গ্রহণ করো।'

'আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহরটি যেমন সম্মানার্হ, তেমনি তোমাদের রক্ত, তোমাদের ইজ্জত, তোমাদের ধন-দৌলত পরস্পরের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানার্হ।

'আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না; তার একটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র কিতাব, অপরটি আমার সুন্নাহ্।

এরপর তিনি শরীয়তের অনেক মৌলিক বিধান বিবৃত করেন। অতঃপর জনতার কাছে জিজ্ঞেস করেন ঃ

'খোদার দরবারে আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তোমরা কি বলবে?'

সাহাবীগণ বলেন, 'আমরা বলবো, আপনি আমাদের কাছে পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং আপন কর্তব্য পালন করেছেন।' তিনি আসমানের দিকে শাহাদাত অঙ্গুলি তুলে তিনবার বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।'

এ সময় কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হলো ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

আজকে আমি দ্বীন (ইসলাম)-কে তোমাদের জন্যে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম আর দ্বীন (জীবন পদ্ধতি) হিসাবে ইসলামকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করলাম।

৫৬. সূদ বলতে এখানে বিশেষ কোনো ধরনের সূদকে বুঝানো হয়নি। সূদের ভাবধারামূলক সমস্ত লেন-দেনের প্রতিই এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য।—সম্পাদক

www.icsbook.info

এই হজ্জ উপলক্ষে হযরত মুহাম্মদ (স) হজ্জ সংক্রান্ত তাবত নিয়ম-নীতি নিজে পালন করে দেখান। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন ঃ 'আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। জানে, হয়তো-বা এরপর আমার দ্বিতীয়বার হজ্জ করার সুযোগ হবে না।'

এরপর তিনি সমস্ত মুসলমানকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ -

উপস্থিত ব্যক্তিগণ (এইসব কথা) অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দিও।

অসুস্থতা

এগার হিজরীর সফর মাসের ১৮ কি ১৯ তারিখে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর শরীরে অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেলো। সে দিন ছিলো বুধবার। পরবর্তী সোমবার দিন অসুস্থতা অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠলো। যতোক্ষণ শক্তি ছিলো, ততোক্ষণ তিনি মসজিদে গিয়ে নামায পড়ালেন। তিনি সর্বশেষ যে নামায পড়ান, তা ছিলো মাগরিবের নামায। মাথায় তাঁর বেদনা ছিলো। তিনি রুমাল বেঁধে মসজিদে এলেন এবং নামাযে সূরা মুরসালাত পাঠ করলেন। এশার সময় তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাই মসজিদে আসতে না পেরে আবু বকর সিদ্দিক (রা)-কে নামায পড়াতে বললেন। এরপর কয়েকদিন যাবত আবু বকর সিদ্দীক (রা) নামায পড়ালেন।

শেষ ভাষণ এবং নির্দেশাবলী

মাঝখানে একদিন তিনি একটু ভালো বোধ করেন। তিনি গোসল করে মসজিদে এলেন এবং ভাষণ প্রদান করলেন। এটিই ছিলো তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ। তিনি বললেন ঃ

'খোদা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার নিয়ামত কবুল করার কিংবা খোদার কাছে (আখিরাতের) যা কিছু আছে, তা গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিয়েছেন। কিন্তু বান্দাহ আল্লাহ্‌র নিকটের জিনিসই কবুল করে নিয়েছে।'

একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা) এর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে কেঁদে উঠলেন। হযরত মুহাম্মদ (স) আরো বললেন ঃ

'আমি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ আবু বকরের দৌলত ও তাঁর বন্ধুত্বের কাছে। যদি দুনিয়ায় আমার উম্মতের ভেতর থেকে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারতাম তো আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। কিন্তু বন্ধুত্বের জন্যে ইসলামের বন্ধনই যথেষ্ট।'

'আরো শোন, তোমাদের আগেকার জাতিসমূহ তাদের পয়গাম্বর ও সম্মানিত লোকদের কবরকেই ইবাদতগাহ বানিয়ে নিয়েছে। দেখো, তোমরা এরূপ করো না। আমি তোমাদের নিষেধ করে যাচ্ছি।'

www.icsbook.info

পুনরায় বললেন ঃ 'হালাল ও হারামকে আমার প্রতি আরোপ করা যাবে না; কারণ খোদা যা হালাল করেছেন, তা-ই আমি হালাল করেছি আর তিনি যা হারাম করেছেন, তা-ই আমি হারাম করেছি।'

এই অসুস্থ অবস্থায় একদিন তিনি আপন খান্দানের লোকদের উদ্দেশ করে বলেন ঃ 'হে পয়গাম্বরের কন্যা ফাতিমা এবং হে পয়গাম্বরের ফুফু সাফিয়া! খোদার দরবারে কাজে লাগবে, এমন কিছু করে নাও। আমি তোমাদেরকে খোদার হাত থেকে বাঁচাতে পারি না।'

একদিন রোগ-যন্ত্রণা খুব বেড়ে গেলো। তিনি কখনো মুখের ওপর চাদর টেনে দিচ্ছিলেন আবার কখনো তা সরিয়ে ফেলছিলেন। এমনি অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা) তাঁর মুখ থেকে শুনতে পেলেন ঃ

'ইহুদী ও নাসারাদের প্রতি খোদার লা'নত! তারা আপন পয়গাম্বরদের কবরকে ইবাদতগাহ বানিয়ে নিয়েছে।'

একবার তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে কিছু আশরাফী জমা রেখেছিলেন। এই অস্থিরতার ভিতরেই তিনি বললেন ঃ 'আয়েশা! সেই আশরাফীগুলো কোথায়? মুহাম্মদ কি খোদার সঙ্গে খারাপ ধারণা নিয়ে মিলিত হবে? যাও, ঐগুলোকে খোদার পথে দান করে দাও।'

রোগ-যন্ত্রণা কখনো বাড়ছিলো, কখনো হ্রাস পাচ্ছিলো। ওফাতের দিন সোমবার দৃশ্যত তাঁর শরীর অনেকটা সুস্থ ছিলো। কিন্তু দিন যতো গড়াতে লাগলো, ততোই তিনি ঘন ঘন বেঁহুশ হতে লাগলেন। এই অবস্থায় প্রায়শ তাঁর মুখে উচ্চারিত হলো ঃ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ (আল্লাহ যাদের অনুগৃহীত করেছেন, তাদের সঙ্গে) কখনো বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى (হে খোদা! তুমি মহান বন্ধু)। আবার কখনো বলতেন بَلِ الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى (এখন আর কেউ নেই, তিনিই বড়ো বন্ধু)।

এই সব বলতে বলতে তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগলো। এক সময় তাঁর রূহে পাক আলমে কুদসে গিয়ে পৌছলো।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ -

মৃত্যুর সাল এগারো হিজরী। মাসটি ছিলো রবিউল আউয়াল এবং দিনটি সোমবার। সাধারণভাবে প্রচলিত যে, তারিখটি ছিলো ১২ রবিউল আউয়াল। কিন্তু এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। 'সীরাতুন্নবী' প্রণেতা মওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদবীর মতে তারিখটি ছিলো ১ রবিউল আউয়াল।

www.icsbook.info

পরদিন জানাযা ইত্যাদি সমাধা করা হলো এবং সন্ধ্যা নাগাদ যে ঘরে তিনি ইন্তেকাল করেন, সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হলো।

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

www.icsbook.info

পরিশিষ্ট

ইসলাম প্রচারে মহিলা সাহাবীদের ভূমিকা[৫৭]

দুনিয়ায় যে কোনো সংস্কার আন্দোলনের ন্যায় ইসলামেরও বিকাশ-বৃদ্ধিতে অসংখ্য মহিলা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এ ব্যাপারে নববী যুগে মহিলারা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

খাদীজা বিনতে খওলিদ ঃ এ ব্যাপারে প্রথমেই হযরত মুহাম্মদ (স)-এর স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর নাম উল্লেখ করতে হয়। এই মহিয়সী নারী নবুয়্যাতের পূর্বে নিজের বিপুল সম্পদরাজি সমাজের ইয়াতীম, মিসকীন ও বিধবাদের সাহায্যের জন্যে তাঁর সমাজসেবী স্বামীর হাতে তুলে দেন। তবে এ সম্পদ শুধু ইয়াতীম, মিসকীন ও বিধবাদের সাহায্যেই ব্যয়িত হয়নি, স্বামীর জন্যে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জনেও যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ইসলাম প্রচারে এ সম্মান ও শ্রদ্ধা অনেকটাই কাজে লেগেছে।

ইসলামের ঠিক সূচনা-পর্বে স্বামীকে নানাভাবে সাহস ও উৎসাহ প্রদানের কথা ইতঃপূর্বে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। স্বামীর প্রচারিত আদর্শের প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ন করে এবং ঘরের বাঁদী ও দাসীদের কাছে তা যথাযথ প্রচার করে তিনি ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের দিনগুলোতে স্বামীর সাথে দীর্ঘদিন শে'বে আবী তালিবে অবরুদ্ধ থেকে এবং আপন ভাতীজা হাকীম বিন্ হাজাম এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে কুরাইশদের শত্রুতা প্রশমনে সফল ভূমিকা রেখে তিনি ইতিহাসে অনন্য স্থান করে নিয়েছেন।

শুজাইয়া ঃ ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন হাবীব আল-বাগদাদী লিখেছেন ঃ এই মহিলা ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশ রমনীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু সংখ্যক কুরাইশ রমনী ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এতে কুরাইশরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। ঘটনাক্রমে এই মহিলা ছিলেন মরুচারী বেদুঈন পরিবারের সন্তান। এ কারণে কুরাইশরা তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিলো। অতঃপর তাঁর হাত-পা বেঁধে আপন পরিবারের কাছে পৌছানোর জন্যে একটি কাফেলার হাতে তুলে দেয়া হলো। কাফেলার লোকেরা তাঁকে একটি উটের পিঠে বসিয়ে রশি দিয়ে কঠোরভাবে বেধে দিলো। এর পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে মহিলা নিজেই বলেন ঃ 'ওরা

৫৭. এই অধ্যায়টি গ্রন্থে সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই অধ্যায়টি সংযোজন করা হলো।—সম্পাদক

www.icsbook.info

পথিমধ্যে আমায় কোনো খাবার বা পানি পান করতে দেয়নি; বরং কোনো মঞ্জিলে যাত্রা বিরতি করলে ওরা আমায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায়ই কড়া রোদের মধ্যে ফেলে দিতো। এভাবে তিন দিন তিন রাত অতিবাহিত হলো। আমার অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে দাঁড়ালো। কোনো বিষয়ে আমার হুঁশ-জ্ঞান পর্যন্ত থাকলো না।

এক রাতে আমি এই অবস্থায়ই পড়ে ছিলাম। হঠাৎ গায়েব থেকে একটা তরল পদার্থ এসে আমার মুখ স্পর্শ করলো। আমি কিছু পানীয় পান করতেই আমার হুঁশ ফিরে এলো। আমার দুর্বলতা কেটে গেলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে লোকেরা আমায় পরিবর্তিত ও উন্নত রূপে দেখতে পেলো। তারা ভাবলো, রাতের বেলা আমি হয়ত কোনোক্রমে হাত-পায়ের বন্ধন খুলে কাফেলার পানি চুরি করে পান করেছি। কিন্তু আমাকে বাধা রশি যেমন খোলা ছিলো না; তেমনি পানি-ভরা মশকগুলোর মুখও ছিলো বন্ধ। তারা যখন নিশ্চিত হলো যে, পানি কেউ চুরি করেনি, বরং খোদার অনুগ্রহ এবং গায়েবী সাহায্যেই আমার অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে, তখন ওরা দারুণভাবে প্রভাবিত ও অনুতপ্ত হলো এবং সকলেই একযোগে ইসলাম গ্রহণ করলো।' উল্লেখ্য, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি মহিলার এত প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিলো যে, তাঁর সম্পর্কে কুরআনের একটি আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়।

উম্মে শরীক দওসিয়া ঃ দারুল মুসান্নিফীন প্রকাশিত সিয়ারুস সাহাবিয়া গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে যে, এই মহিলা কুরাইশ রমনীদের মধ্যে খুব গোপনে ইসলাম প্রচার করতেন। তাঁর প্রচেষ্টায়ই কুরাইশ রমনীদের মধ্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করে। অবশ্য তাঁর জীবন কাহিনী সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ঃ এ মহিলা ছিলেন হযরত উমর (রা)-এর বোন। ইনি যেভাবে হযরত উমর (রা)-কে প্রভাবিত করেন, যার পরিণতিতে তিনি ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হন, সে ঘটনা সর্বজনবিদিত। জাহিল যুগে যে স্বল্প সংখ্যক কুরাইশ মহিলা লেখাপড়া জানতেন, ইনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

সা'দা বিনতে কুরাইজ ঃ ইবনে হাজারের উদ্ধৃতি গিয়ে সিয়ারুস সাহাবিয়ায় বলা হয়েছে, সা'দা বিন্‌তে কুরাইজের উপদেশেই হযরত উসমান (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইনি সম্ভবত হযরত উসমান (রা)-এর খালা ছিলেন। এঁর সম্পর্কে বিস্তৃত আর কিছু জানা যায়নি।

এছাড়া হিজরতের প্রাক্কালে সংঘটিত আকাবার তৃতীয় শপথে দুজন মহিলা অংশ গ্রহণ করেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তাদের নাম-পরিচিতি পাওয়া যায়নি।

www.icsbook.info

হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হলো। মক্কার কঠোর পরিবেশে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলাম প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা রেখে এঁরা শুধু সৎসাহসেরই পরিচয় দেননি, অনেক দুঃখ-কষ্টেরও ঝুঁকি গ্রহণ করেন।

হিজরতের পর মদীনায়ও ইসলাম গ্রহণ ও তার প্রচারে মহিলারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মক্কার চেয়ে মদীনার মহিলারা বেশি স্বাধীনচেতা ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। সে কারণে তাঁরাও অধিকতর উৎসাহের সাথে ইসলাম প্রচারে অংশ গ্রহণ করেন।

উম্মে সুলীম বিন্‌তে মালহান ঃ এই মহিলা খুবই দুঃসাহসী ছিলেন। ইনি এবং এঁর বোনের ইসলামের পক্ষে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা সর্বজনবিদিত। উম্মে সুলীম সম্পর্কে ইতিহাসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, হুনাইনের যুদ্ধে ইসলামী বাহিনীর মক্কী সৈন্যরা পলায়ন করলে যুদ্ধ জয়ের পর তিনি সমস্ত পলাতক মক্কী সৈন্যের শিরোচ্ছেদ করার জন্যে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন। (সহীহ মুসলিম থেকে সিয়ারুস সাহাবিয়ায় উদ্ধৃত)।

তাঁর স্বামী আবু তালহা মূর্তি-পূজারী ছিলেন। তিনি একটি বৃক্ষের পূজা করতেন। উম্মে সুলীম মুসলমান হবার পর স্বামীকে নানাভাবে বুঝাতে থাকেন যে, মাটির বুক চিরে যে গাছের জন্ম হয়, তা কিভাবে খোদা হতে পারে? স্ত্রীর কথায় ধীরে ধীরে স্বামীর মন প্রভাবিত হয় এবং এক পর্যায়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইবনে সা'দ থেকে সিয়ারুস সাহাবিয়ায় উদ্ধৃত)।

রাসূলে করীম (স)-এর জামানায় ইসলামের জন্যে অর্থ ব্যয়েও মহিলারা কিছুমাত্র পিছনে ছিলেন না। সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত হয়েছে যে, একবার হযরত বিলাল (রা) রাসূলে করীম (স)-এর আহবানক্রমে মসজিদে নববীতে সমবেত লোকদের কাছ থেকে ঘুরে ঘুরে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করছিলেন। মসজিদের এক পার্শ্বে সমবেত মহিলারা এটা টের পেয়ে নিজেদের কানের দুল, হাতের চুড়ি এবং অন্যান্য অলঙ্কারাদি খুলে খুলে রাসূলের খেদমতে জমা করতে লাগলেন।

মোটকথা, ইসলাম প্রচারে মহিলারা পূর্ণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে রাসূলে আকরাম (স)-এর সাথে সহযোগিতা করেন। তাঁরা নিজ নিজ স্বামী, ভৃত্য, দাসী, গোলাম, আত্মীয়-স্বজন, সাক্ষাত-প্রার্থী ও বন্ধু-বান্ধবদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ দেন। ইসলামের পথে তাঁরা নানারূপ দুঃখ-কষ্টও ভোগ করেন। তাঁরা আবিসিনিয়ায় হিজরতেও অংশ নেন। তাঁদের ঈমান কিরূপ সুদৃঢ় ছিলো দু'-একটি ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবিসিনিয়ার খৃষ্টান পরিবেশে গিয়ে বিবি উম্মে হাবীবার স্বামী উবাইদুল্লাহ বিন জাহাশ

www.icsbook.info

এবং বিবি সওদার স্বামী সুকরান ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে যায়। কিন্তু এই দুই মহিলা ইসলামের ওপর অবিচল থাকেন। এর বিনিময়ে উভয়ে রাসূলে আকরাম (স)-এর স্ত্রী তথা উম্মুল মুমিনীন হবার পরম সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হযরত উমর (রা)-এর দুই দাসী জুনাইরা ও লাবীবা মক্কায় অবস্থানকালে ইসলামে দীক্ষিত হন। ইসলাম গ্রহণের পূর্ব হযরত উমর (রা) তাদের ওপর কঠোর নির্যাতন চালাতেন। তাদেরকে প্রহার করতে করতে নিজেই পরিশ্রান্ত হয়ে বিরতি দিতেন। তিনি বলতেন ঃ কারো প্রতি দয়াপরবশ হয়ে নয়, নিজেই পরিশ্রান্ত হয়ে বিরতি দিচ্ছি; কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর আবার প্রহার শুরু করবো। কিন্তু এই নিষ্ঠুর প্রহারও তাঁরা মেনে নেন; তবু ইসলাম ত্যাগ করতে সম্মত হননি। জানা যায়, আবু লাহাবের বৃদ্ধা দাসী সাওবিয়াও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে মুক্তিদান করা হয়েছিলো বলে সম্ভবত আবু লাহাব এই বৃদ্ধার ওপর নির্যাতন চালাতে সাহস পায়নি।

হযরত উমর (রা)-এর আত্মীয়া শাফাআ বিনতে আবদুল্লাহ কবে ইসলাম গ্রহণ করেন জানা যায়নি। তিনি লেখাপড়া জানতেন। হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁর স্ত্রী হাফসা (রা)-কে লেখাপড়া শিখানোর জন্যে শাফাআকে নিযুক্ত করেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তিনিও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ইবনে সা'দ-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, বাহির থেকে অমুসলিম গোত্রগুলোর দূতেরা মদীনায় এলে মদীনার এক আনসারী মহিলা তাদের খুব মেহমানদারী করতেন। এই মেহমানদারীও ইসলাম প্রচারের জন্যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতো।

সমাপ্ত

www.icsbook.info

রসূলুল্লাহ্‌র বিপ্লবী জীবন

নাকিব
পাবলিকেশন্স